রাজরোষে আদালতের আঙিনায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

যে সব মহান বিপ্লবীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য শুধুই দিয়ে গিয়েছেন, পাননি কিছুই, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে উৎসর্গ করলাম বইটি।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মূল নথি থেকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা
স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী
স্মরণীয় পাকুড় হত্যা মামলা
রহস্যেভরা সোফাকাম বেড
দেবযানী হত্যা মামলা
শকুন্তলা হত্যা মামলা
অহিংস আন্দোলনে নিবেদিত নারী
স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস নারী
অন্দরের নজরুল বাহিরের নজরুল
আমাদের গর্ব বিনয় বাদল-দিনেশ
কানু ডাকাতের হত্যা রহস্য

শুভেচ্ছা

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আইনের লৌহ ছাঁচে, কবিতা কভু না বাঁচে, প্রাণ তাহা পায় শুধু প্রাণে।" আইনের ছাঁচে কবিতা না বাঁচলেও আইন ও আদালতকে কেন্দ্র করে এবং নানা ধরনের মামলা-মোকদ্দমা ও বিচারের নথিপত্র ঘেঁটে চমৎকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, বাংলা সাহিত্যে তার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। এই শ্রেণীর প্রথম উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩ সালে প্রকাশিত) যার সঙ্গে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ও হাওড়ার পাবলিক প্রোসিকিউটর শ্রীযুক্ত চিন্ময় চৌধুরী তাঁর "রাজরোষে আদালতের আঙিনায়" বইটিতে বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি আক্ষরিক অর্থেই আদালতের আঙিনায় বিচরণ করেছেন, বহু মামলা পরিচালনা করেছেন, আসামি-ফরিয়াদির অন্তরালে যে মানুষগুলি রয়েছে, তাদেরও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

আদালতের পাণ্ডুর নথির মধ্যে কত কাহিনী আজও বন্দী হয়ে আছে, কোনো কোনো সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক তাতে মেদমাংস সংযোজিত করে এক ধরনের আদালতি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে গল্পের প্রয়োজনে মূল মামলাকে কিছু কিছু অদলবদল করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত চিন্ময় চৌধুরী আদালতের মামলা ও তার সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনাকে কোথাও বিকৃত বা পরিবর্তিত না করে, অর্থাৎ তার আইনঘটিত সত্তা পুরোপুরি বজায় রেখে, অত্যন্ত সহজ ও পরিষ্কৃত ভাষায় অনেকগুলি বিখ্যাত স্বদেশী ও রাজনৈতিক মামলার বিবরণ নথিবন্ধন থেকে উদ্ধার করেছেন। দু-একটি ব্যক্তিগত মানহানি এবং অনেকগুলি রাজনৈতিক মামলার ফলাফল নিয়ে তিনি এই গ্রন্থকে পাঠকসমাজে উপস্থিত করেছেন। যে-সব মামলার কথা আমরা শুনে আসছি, কিন্তু তার কোনো আনুপূর্বিক বিবরণ জানি না, লেখক সেই সমস্ত ঘটনাকে অতীতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন, এবং তাকে সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রচেষ্টাটি অভিনব। স্বদেশী ও জাতীয় আন্দোলনের কিছু কিছু ইতিহাস লেখা হয়েছে, বিপ্লবী আন্দোলনের কিছু কিছু তথ্যও কলমবন্দী করা হয়েছে, কিন্তু তার পিছনে যে মামলা-মোকদ্দমার দীর্ঘ বিবরণ আছে, তা অনেকেরই জানা নেই। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান।

আইনজ্ঞ হিসেবে শ্রীযুক্ত চৌধুরী সুপরিচিত, কিন্তু আইনের লৌহ ছাঁচ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে তিনি যে সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আদালতের আঙিনায় বিচরণকারী মানুষগুলি তাঁর রচনায় মূকত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

ভূমিকা

'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আদালতের আঙিনায়' শীর্ষকে আমাকে বেশ কিছুদিন এক-একটি চমকপ্রদ মামলার কাহিনী লিখতে দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকেই একটা পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম এমন কিছু মামলার কাহিনী নিয়ে কিছু লেখা যায় কি না, ঐতিহাসিক দিক থেকে যার অন্তত কিছু মূল্য থাকবে। পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতের ব্রিটিশ সরকার সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, হত্যা, বে-আইনীভাবে বিস্ফোরক রাখা এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে একাধিক মামলা এনেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির বেশির ভাগের বিচার হয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুনালে।

মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীরা বেশির ভাগই ছিলেন নানা বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের কাছে এইসব অভিযুক্ত বিপ্লবীরা ছিলেন সন্ত্রাসবাদী নামে পরিচিত।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল বা বিভিন্ন আদালতের রায়ে একাধিক অভিযুক্তকে ফাঁসিকাঠে গলা দিতে হয়েছিল। তাছাড়া দেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত বহু বিপ্লবীকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা বিভিন্ন মেয়াদের জন্য সশ্রম দণ্ডাদেশ।

আলাদা আলাদা ভাবে বিশেষ কয়েকটি মামলার কাহিনী নিয়ে কিছু কিছু বই লেখা হলেও ভারতবর্ষের একটি সমগ্র বিপ্লবী ইতিহাস আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। যদিও বর্তমান বইটির ছোট পরিসরে ভারতবর্ষের পূর্ণ বিপ্লবী ইতিহাস লেখা হয়ে উঠল না। তা সম্ভবও নয় এই ছোট পরিসরে।

বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের করা বেশ কয়েকটি বিখ্যাত বিপ্লবী মামলাকে কেন্দ্র করে বর্তমান বইটিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা—এমন কি অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত জানেন না অনেক বিপ্লবীদের নাম যাঁরা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ। এইসব নিবেদিত প্রাণ পরাধীন দেশের মুক্তিমন্ত্রে নিজেদের সমর্পণ করে হাসিমুখে উঠেছিলেন ফাঁসির মঞ্চে। গুটিকয়েক বিপ্লবী নেতৃত্বকে বাদ দিলে আজ অনেকেই বলতে পারবেন না আদালতের বিচারে ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের নাম। যাঁরা একদিন দেশমাতৃকার পরাধীনতার লাঞ্ছনা ঘোচাতে শুধুই দিয়ে গেলেন, পেলেন না কিছুই তাঁদের কি ভোলা উচিত? বাস্তবে কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা তাঁদের বেশিরভাগকে ভুলে গিয়েছি।

আশা করি, বর্তমান বইটি থেকে জানা যাবে বহু না-জানা বিপ্লবীর নাম। জানা যাবে একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের কথা।

বইটি লিখতে ও প্রকাশ করতে আমাকে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে ও আমার অনুজপ্রতিম আইনজীবী শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র বেরা, লাইব্রেরিয়ান শ্রীমুরারীমোহন মাহান্তি এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীমঙ্গুলিচরণ বিশ্বাল, এছাড়াও আমাকে সাহায্য করেছেন দে'জ পাবলিশিং-এর কর্মী ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র শী ও চৈতন্য বিশাল। সবশেষে আমার ছোট মেয়ে ঝুমুর (মৌসুমী চৌধুরী) কথা বলছি। সেও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের জন্য সে আমার আশীর্বাদের অধিকারিণী।

পাঠক-পাঠিকাদের বইটি ভাল লাগলে আমার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে। যেসব মামলার নজির থেকে মামলাগুলি নিয়েছি তার একটি তালিকা বইটিতে সন্নিবেশিত করেছি পাঠক-পাঠিকার স্বার্থে। সম্ভাব্য বেশ কিছু বিপ্লবীদের একটি নামের তালিকাও যুক্ত করেছি বইটির সাথে।

বিষয়-সূচী

মামলার নজির

বিষয়-সূচী	মামলার নজির থেকে
হেরম্বচন্দ্র ও কালীপ্রসন্নের মধ্যে মানহানির মামলা—	Cal L. J. Reporter Rulings.
ডুমরাও মহারাজ বনাম দেওয়ান পুত্রের বিখ্যাত মামলা—	AIR 1 Journal Portion.
বিপ্লবী সূর্য সেনের ফাঁসির আদেশ—	1935 Cr. L. J.
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা—	1936 Cr. L. J.
অরবিন্দের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ—	1910 Cr. L. J. (vol II).
স্বাধীনোত্তর ভারতে এদের কথা সবাই ভুলে গেছে—	1936 Cr. L. J.
পুলিশের নির্দেশ না মানায় সুভাষচন্দ্রের জেল হয়েছিল—	AIR. 1931 Cal.
'দি হাওড়া গ্যাং কেস'—	15 C. W. N. 593 : 10 Ind. Case.
'মুক্তি কোন পথে' রাজদ্রোহিতার অভিযোগ—	14 C. W. N. 1114 11 Cr. L. J. 453.
কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীমানবেন্দ্র রায়—	35 Cr. L. J.
পত্রিকায় নিবন্ধ ছেপে রাজরোষে—	AIR 1931 Cal.
টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা—	Different Law Journals.
যুগান্তরের দায়ে 'সাধনা প্রেস' বাজেয়াপ্ত—	11 C. W. N. 1046.
সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে মুচলেকার আদেশ—	32 Cr. L. J. 1931.
উত্তেজক বক্তৃতার দায়ে মণিবেন লীলাধর—	1933 Cr. L. J. (Bombay) 231
বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ—	1931 Cr. L. J. (vol. 14).
মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজাফ্‌ফর আহমদ—	34 Cr. L. J. : 1933
জজসাহেবকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল—	পুরানো স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা।
ইংরেজ শাসনে হাইকোর্টে এক বাঙালী বিচারপতির দৃঢ়তা—	পুরানো প্যাটরিয়ট পত্রিকা।
দুজন ইংরেজকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল দুজন বাঙালীর কাছে—	পুরানো প্যাটরিয়ট পত্রিকা
'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা রাজদ্রোহের অভিযোগে—	1929 Cr. L. J. 117 Ind. Case.

বিষয়-সূচী	মামলার নজির থেকে
মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র—	Cal. Criminal Rulings, vol. No. XXXIX–147
'হিলি স্টেশন' মেল ব্যাগ ডাকাতি মামলা—	Cal. Criminal Rulings, vol. XXXIX–28.
রাইটার্স অভিযানে--বিনয়-বাদল দীনেশ--	একাধিক জার্নাল ও মামলার নজির।
বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা (কাঁক্‌রী ষড়যন্ত্র)—	29 Cr. L. Journal :
লাহোর-দিল্লী মামলায় বিপ্লবী ভগৎ সিং—	C. W. N. vol. XXXV P.C. LXXV : C.W.N. vol. XXXV P.C. 646.
অশ্লীলতার দায়ে সমরেশ বসুর প্রজাপতি—	

বিপ্লবী-স্মারণিকা

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিভিন্ন মামলায় রাজদ্রোহিতার এবং অন্যান্য অভিযোগে যেসব বিপ্লবীরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কেউ কেউ বা গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেছিলেন তাঁদের নাম, দণ্ডাদেশের পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট পরিচয়।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
সূর্য সেন (মাস্টারদা) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তারকেশ্বর দস্তিদার কল্পনা দত্ত	(সায়ানাইডে আত্মহত্যা করেছিলেন) এক সময় ছিলেন বেথুন কলেজের ছাত্রী।	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে ক্যাপ্টেন ক্যামরুন ও মিসেস সুলিভ্যান হত্যার অভিযুক্ত আসামী। সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের বিরুদ্ধে হয়েছিল ফাঁসির আদেশ আর কল্পনা দত্তকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।
নির্মল সেন অপূর্ব সেন	নির্মল এবং অপূর্ব এই দুজন ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন দলনেতা সূর্য সেন ও প্রীতিলতার সাথে ছিলেন ধলঘাটে। এই দুজনাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান ১৩ই জুন।	ঘটনাস্থলে মারা যাওয়ায় এঁদের দুজনকে অভিযুক্ত করা যায়নি।
দ্বারকানাথ গোস্বামী		সিলেটের দায়রা আদালতে জুরিদের রায়ে মুক্তি পেলেও কলকাতা হাইকোর্ট ১৯৩২ সালের ৪ঠা আগস্ট দ্বারকানাথ গোস্বামীকে ৩ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।
অরবিন্দ ঘোষ	আত্মগোপন করায় গ্রেপ্তারিত হননি 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় নিবন্ধ লেখার অভিযোগে।	মামলায় ভ্রাতা মনোমোহন ঘোষের বিচার হয়েছিল।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
মনোমোহন ঘোষ	অরবিন্দের ভ্রাতা এবং 'কর্মযোগিন' পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর।	কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল ১৯১০ সালের ১৮ই জুন। হাইকোর্টের আদেশে মনোমোহন ঘোষ মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯১০ সালের ৭ই নভেম্বর।
পরিমল চ্যাটার্জী শান্তিময় গাঙ্গুলী অমিয়ভূষণ সেন	ঢাকার ৩ কিশোর বিপ্লবী।	ঢাকার দায়রা আদালতে জুরিদের রায়ে নির্দোষ বলে ঘোষিত হলেও, জুরিদের সাথে একমত হতে না পারায় জজ সাহেব মামলাটিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্ট অবশ্য ৩ কিশোর বিপ্লবীকেই মুক্তি দিয়েছিলেন ১৯৩২ সালের ১২ই জুলাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়।
সুভাষচন্দ্র বোস	১৯৩১ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন।	কলকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষচন্দ্রকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ১৯৩২ সালে। অভিযোগ ছিল ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করে মিছিল পরিচালনা করার।
ননীগোপাল সেনগুপ্ত বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জী নরেন্দ্রনাথ বোস নিবারণচন্দ্র মজুমদার.	'হাওড়া গ্যাং কেসের' অভিযুক্ত আসামী। ৪৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।	(মামলাটির বিচার হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। স্পেশাল ট্রাইবুনাল ৬ জন

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
সুরেশচন্দ্র মজুমদার জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখার্জী পবিত্র দত্ত, শরৎচন্দ্র মিত্র সুরেশচন্দ্র মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র, শিবু হাজরা, হরিপদ অধিকারী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আনন্দপ্রসন্ন রায়, বিমলাচরণ দেব, কালীপদ চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী সরকার, হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূটান মুখার্জী, চারুচন্দ্র ঘোষ, চুনীলাল নন্দী, ভূষণচন্দ্র মিত্র, রামপদ মুখার্জী, অতুল পাল, যোগেশ মিত্র, গণেশ দাস, শৈলেন দাস, রানী ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য, তিনকড়ি কর, মন্মথ বিশ্বাস, শিরীষচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, বিধুভূষণ বিশ্বাস, বিনয় চক্রবর্তী, দাশরথি চ্যাটার্জী, ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী, কার্তিক দত্ত, তারানাথ রায়চৌধুরী, মন্মথ চৌধুরী, সুশীলকুমার বিশ্বাস, অতুল মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ দে		অভিযুক্তকে বাদে বাকি সবাইকে মুক্তি দিয়েছিলেন ১৯১১ সালের ১৯শে এপ্রিল। এই ৬ জন দণ্ডিত আসামী ছিলেন শৈলেন দাস, সুশীল বিশ্বাস, অতুল মুখার্জী, গণেশ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহের এবং ষড়যন্ত্রের। ষড়যন্ত্রের সময়-সীমা ছিল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১০ সাল।)
অবনীভূষণ চক্রবর্তী বিধুভূষণ দে অশ্বিনীকুমার বোস নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র কালীদাস ঘোষ শচীন্দ্রলাল মিত্র	১৫ নং জোড়াবাগান স্ট্রীট থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল অন্যান্য দলিল দস্তাবেজের সাথে 'মুক্তি কোন পথে' পুস্তিকাটি ১৯০৯ সালে। ১৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল রাজদ্রোহিতার অভিযোগে।	বিপ্লবী অবনীভূষণ চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বোস, নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, কালীদাস ঘোষ এবং শচীন্দ্র-লাল মিত্রকে দেওয়া হয়েছিল ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
নগেন্দ্রনাথ সরকার সুধীরকুমার দে কিনু পই ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী মোহিনী মিত্র মন্মথনাথ মিত্র		নগেন্দ্র সরকার, সুধীর কুমার দে, কিনু পইকে দেওয়া হয়েছিল ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত এবং সতীশ চ্যাটার্জীকে দেওয়া হয়েছিল ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। মোহিনী মিত্র এবং মন্মথ মিত্র ছাড়া পেয়েছিলেন হাইকোর্টের আদেশে। হাইকোর্টের রায় হয়েছিল ১৯১০ সালের ৩০শে আগস্ট।
মানবেন্দ্রনাথ রায় নলিনী গুপ্ত মহম্মদ সৌকত উসমানি মুজাফ্ফর আহমদ শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে	কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী	নলিনী গুপ্ত, মহম্মদ সৌকত উসমানি, মুজাফ্ফর আহমদ এবং শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেকে দেওয়া হয়েছিল ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ১৯২৪ সালের ২০শে মে। মানবেন্দ্রনাথ রায়কে ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন দায়রা আদালত ১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারী। হাইকোর্ট আপীলে দণ্ডাদেশ হ্রাস করে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক।	১৯৩৮ সালের ৯ই মার্চ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল একটি নিবন্ধ মেদিনীপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
		সত্যেন্দ্রনাথকে তখন দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা হাইকোর্ট আপিলে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের ১লা ডিসেম্বর।
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী হরেন্দ্রনাথ মুন্সী নিরঞ্জন ঘোষাল সীতানাথ দে অজিত মজুমদার জীবন ধূপি দীনেশ ভট্টাচার্য জগদীশচন্দ্র ঘটক শ্রীমতী পারুল মুখার্জী সন্তোষকুমার সেন বিজয় পাল	টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী স্বীকারোক্তি দিয়ে পরে অস্বীকার করেছিলেন। রাজসাক্ষী রাজসাক্ষী	মামলায় মোট অভিযুক্ত ছিলেন ২৯ জন। স্পেশাল ট্রাইবুনাল ১৯৩৭ সালের ২৭শে এপ্রিল ২৯ জনের মধ্যে ১৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন রাজদ্রোহের অভিযোগে। কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের আপিল খারিজ করে দিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়-ই বহাল রেখেছিলেন ১৯৩৮ সালের ৯ই মে। আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায়ও পূর্ণানন্দ সেনগুপ্ত, সীতানাথ দে এবং নিরঞ্জন ঘোষালের শাস্তি হয়েছিল।
প্রভাতকুমার চক্রবর্তী	প্রভাত চক্রবর্তী ছিলেন আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী।	দণ্ডিত হয়েছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনালের আদেশে।
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ওরফে ফুট্যাদা	পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করেছিলেন ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর চাঁদপুরে।	ফাঁসির আদেশ হওয়ায় তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল আলিপুর জেলে।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	১৯০৭ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উত্তেজক নিবন্ধ ছাপার জন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল ১৯০৭ সালের জুন মাসে।	কলকাতার চিফ্প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে ১ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ২৪শে জুলাই। 'সাধনা প্রেসটি'ও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই সময় যুগান্তর ছাপা হ'ত 'সাধনা প্রেস' থেকে। ১৯০৭ সালের ৬ই আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ ও প্রেস বাজেয়াপ্তর আদেশ বাতিল করে দিয়েছিলেন।
সতীন্দ্রনাথ সেন ওরফে সতীন সেন দীনেশচন্দ্র সেন ওরফে তারু হীরালাল দাশগুপ্ত শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য ফণীভূষণ ব্যানার্জী ওরফে নিতাই বটকৃষ্ণ মিশ্র	বরিশালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে।	কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শান্তি রক্ষার্থে মুচলেকা প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১১০ ধারা মতে। কলকাতা হাইকোর্ট ১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রেখেছিলেন সতীন্দ্রনাথ সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, ফণীভূষণ ব্যানার্জী, শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য, এবং বটকৃষ্ণ মিশ্রের ক্ষেত্রে। অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের আদেশ খারিজ করে দিয়েছিলেন।
মনিবেন লীলাধর কারা	বোম্বেতে মে-ডে উপলক্ষে উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে রাজরোষে পড়েছিলেন ১৯৩২ সালে।	বোম্বের চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে মনিবেনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
		এবং ১৫৩-এ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। বোম্বে হাইকোর্ট ১২৪-এ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মনিবেনকে ৩০০ টাকা জরিমানা করে আপিলের নিষ্পত্তি করেছিলেন।
মতিলাল ঘোষ তারিণীকান্ত বিশ্বাস	মতিলাল ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯১৩ সালে। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন অবস্থায় পত্রিকায় নিবন্ধ ছেপে মন্তব্য করায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তারিণী-কান্ত বিশ্বাস ছিলেন পত্রিকার মুদ্রাকর। তিনিও অভিযুক্ত হয়েছিলেন।	কলকাতা হাইকোর্ট রাজদ্রো-হিতার অভিযোগ থেকে উভয় অভিযুক্তকেই মুক্তি দিযে মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিলেন ১৯১৩ সালে।
মুজাফ্‌ফ্‌র আহমদ মিরাজকর মহম্মদ সৌকত উসমানি নিম্বকর শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে ঘাটে যোগলেকর সোহনসিং জস্ মাজিদ অযোধ্যা প্রসাদ অধিকারী শামসুল হুদা স্প্রাট্ ব্রাডলে গোস্বামী	মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী।	মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ২৭ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মিরাটের অতিরিক্ত দায়রা আদালত তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে মুজাফ্‌ফ্‌র আহমদকে দিয়েছিলেন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। প্রায় প্রত্যেক আসামীর দণ্ডাদেশ হ্রাস করে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন ১৯৩৩ সালের ৩রা আগস্ট। মামলাটির পাতায় পাতায় রয়েছে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
পি. সি. যোশী চক্রবর্তী, বসাক, হুটচিনসন, মিত্র সত্যরঞ্জন বক্সী	'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন ১৯২৬ সালে। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের' একজন নেতা।	আন্দোলনের গোড়ার কথা। পাবনার মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে ১৯২৬ সালের ৭ই জুলাই পাবনার আইন-শৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। নিবন্ধটি ছিল 'Anarchy in Pubna'। নিবন্ধটি প্রকাশ করায় সত্যরঞ্জন বক্সী এবং পুলিনবিহারীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন নিম্ন আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায়। কলকাতা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রাখলেও দণ্ডের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে রায় দান করেছিলেন ১৯২৭ সালের ৫ই জুলাই।
পুলিনবিহারী ধর	'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন।	
বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন	১৯০৮ সালে মারাঠী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কেশরি'র সম্পাদক ও প্রকাশক।	বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৮ সালের 'কেশরি' পত্রিকায় দুটি নিবন্ধ ছেপে রাজরোষে পড়েছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। জুরির বিচারে তিলককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায়। ১৯০৮ সালের ২২শে জুলাই তিলককে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও ১০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
পুলিনবিহারী দাস আশুতোষ দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় গুরুদয়াল দাস প্রফুল্ল সেনগুপ্ত রাধিকাভূষণ রায় ক্ষীরোধচন্দ্র গুহ শান্তিপদ মুখার্জী ভূপতিমোহন সেনগুপ্ত নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নিশীভূষণ মিত্র গোপীবল্লভ চক্রবর্তী প্রমোদবিহারী দাস শচীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী যোগেশচন্দ্র রাউৎ চারুচন্দ্র সেন মাণিক্য জ্যোতির্ময় সুরেশচন্দ্র সেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ রাধিকা ব্যানার্জী নিমাইচাঁদ বণিক নিশিকান্ত বসু চৌধুরী গোপালচন্দ্র ঘোষ অশ্বিনীকুমার ঘোষ অবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	পুলিনবিহারী সহ সবাই ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির 'সদস্য'। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ৪৪ জনের বিরুদ্ধে মামলার বিচার হয়েছিল ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা আদালতে ১৯১১ সালে।	৩৬ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে দায়রা আদালত রায় দান করেছিলেন ১৯১১ সালের ৭ই আগস্ট। আপিলে কলকাতা হাইকোর্ট ১৪ জন দণ্ডিত আসামী ছাড়া অন্যান্যদের মুক্তি দিয়েছিলেন। ১৪ জনের মধ্যে ছিলেন পুলিনবিহারী, আশুতোষ, জ্যোতির্ময়, বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদয়াল, প্রফুল্লচন্দ্র, রাধিকাভূষণ, ক্ষীরোদচন্দ্র, শান্তিপদ, ভূপতিমোহন, নৃপেন্দ্রমোহন, নিশিভূষণ, গোপীবল্লভ এবং প্রমোদবিহারী। হাইকোর্টের রায় হয়েছিল ১৯১২ সালের ২রা এপ্রিল। দণ্ডিত আসামীদের শাস্তির মেয়াদ ছিল ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড পর্যন্ত।
অবোধবিহারী আমীরচাঁদ বালমুকুন্দ বলরাজ হনয়ান্ত সহায় বসন্তকুমার বিশ্বাস রামলাল দাস চরণদাস	দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রের অভিযুক্ত আসামী	দিল্লীর দায়রা আদালত ১৯১৪ সালের ৫ই অক্টোবর মামলার রায় দিয়েছিলেন। দোষী সাব্যস্ত করে অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ এবং বালমুকুন্দকে দিয়েছিলেন ফাঁসির আদেশ। বলরাজ, হনয়ান্ত এবং

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
মন্নুলাল রঘুবীর শর্মা খুসীরাম		বসন্তকুমারকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। বাকি ৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আপিল আদালত হনয়ান্তের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে তাঁকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত চরণদাসকে আপিল আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আপিলে অন্যান্যদের ফাঁসির আদেশ বহাল থেকেছিল।
হরিরাম শেঠী দীননাথ সুলতানচাঁদ রাসবিহারী বোস হরদয়াল অর্জুনলাল শেঠী	দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রে এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহু জায়গায় রাসবিহারী বোস বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গ্রেপ্তার করতে না পারায় দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর বিচার হয়নি।	দীননাথ রাজসাক্ষী হওয়ায় তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছিল। সুলতানচাঁদও রাজসাক্ষী ছিলেন।
সন্তোষ দাস বরোদাপ্রসাদ দত্ত সারোদাপ্রসাদ দত্ত জ্যোতিন্দ্রমোহন ব্যানার্জী নিরাপদ মুখার্জী মধুসূদন দত্ত শ্যামলাল সাহা নিকুঞ্জ মাইতি সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী পিয়ারীমোহন দাস অবিনাশ মিত্র উপেন্দ্রনাথ মাইতি নারাজোলের রাজা	মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় শেষ পর্যন্ত বিচার হয়েছিল সন্তোষ, সুরেন্দ্রনাথ এবং যোগজীবনের মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালতে।	১৯০৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী রায় দান করে ৩ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন দায়রা আদালত। কলকাতা হাইকোর্ট আপীল মামলা শুনে ১৯০৯ সালের ১লা জুন ৩ জন দণ্ডিত আসামীকেই মুক্তি দিয়েছিলেন। পরে পিয়ারীমোহন ক্ষতিপূরণের মামলা করে ক্ষতিপূরণের ডিক্রি পেয়েছিলেন।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
ললিতচন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী জ্যোতীন্দ্র হরকুমার	মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলায় অভিযুক্ত আসামী। ঢাকার দায়রা আদালতে বিচার হয়েছিল ১৯১১ সালে।	ললিতচন্দ্রের ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। বাকিরা মুক্তি পেয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টও এই দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছিলেন। হাইকোর্টের রায় হয়েছিল ১৯১১ সালের ৮ই আগস্ট।
শশাঙ্কশেখর হাজরা ওরফে অমৃতলাল দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত চন্দ্রশেখর দে সারদাচরণ গুহ কালীপদ গুহ উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সুরেশচন্দ্র চৌধুরী হিরন্ময় ব্যানার্জী	রাজাবাজার বোমা মামলার অভিযুক্ত আসামী। বিচার হয়েছিল ২৪ পরগনার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে ১৯১৪ সালে।	শশাঙ্কশেখরকে দেওয়া হয়েছিল ১৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। দীনেশ, সারদাচরণ, চন্দ্রশেখরকে দেওয়া হয়েছিল ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। কালীপদকেও দেওয়া হয়েছিল ১০ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। দায়রা আদালতের রায় হয়েছিল ১৯১৪ সালে। খগেন্দ্রনাথকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টও দায়রা আদালতের আদেশ বহাল রেখেছিলেন। হাইকোর্টের রায় হয়েছিল ১৯১৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী।
ভবানন্দ ব্যানার্জী মনমোহন অধিকারী	হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী।	স্পেশাল ট্রাইবুনাল উভয় অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের আপিল খারিজ করে দিয়েছিলেন ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
অপূর্বকৃষ্ণ বোস	'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মুদ্রাকর ছিলেন অপূর্বকৃষ্ণ বোস। ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন একটি নিবন্ধ ছেপে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিল।	আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ১৯০৭ সালে চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। কলকাতা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের দেওয়া ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশই বহাল রেখেছিলেন।
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	১৯১৯ সালে ছিলেন 'ইয়ং ইন্ডিয়ার' সম্পাদক। অভিযোগ ছিল গান্ধীজী মিঃ কেনেডির লেখা 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' ছেপে আদালত অবমাননা করেছেন।	বোম্বে হাইকোর্ট ১৯২০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজীকে চিঠিটি 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' ছাপানোর জন্য ভর্ৎসনা এবং নিন্দা করে তাঁকে সতর্কিত করে দিয়েছিলেন।
কালীদাস বোস নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ভূজঙ্গভূষণ ধর হরিদাস দত্ত অনুকুলচন্দ্র মুখার্জী গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আশুতোষ রায়	'রডা কোম্পানী' থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চুরি মামলায় অভিযুক্ত আসামী।	১৯১৫ সালের ৩০শে মার্চ কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ৪ জনকে ২ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। এঁরা ৪ জন ছিলেন কালীদাস বোস, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূজঙ্গভূষণ ধর ও হরিদাস দত্ত। বাকি ৩ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি পেয়েছিলেন ৪ জন দণ্ডিত আসামীর মধ্যে একমাত্র হরিদাস দত্ত। হাইকোর্টের আদেশ হয়েছিল ১৯১৫ সালের ৩০শে আগস্ট।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
ধরণীকান্ত চক্রবর্তী শৈলজারঞ্জন ভট্টাচার্য নিখিলভূষণ চৌধুরী সুধীররঞ্জন ভট্টাচার্য জগবন্ধু বসু প্রফুল্লকুমার মজুমদার মণীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ	ময়মনসিং ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামী।	স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ধরণীকান্ত চক্রবর্তীকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। নিখিলভূষণকে দিয়েছিলেন ৪½ বছর, সুধীর ও জগবন্ধুকে ৬ বছর, প্রফুল্ল মজুমদারকে ৭ বছর এবং মণীন্দ্রচন্দ্রকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৪ই মার্চ। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মণীন্দ্রচন্দ্র ছাড়া বাকিদের দণ্ডাদেশ বহাল থেকেছিল।
সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী	লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী। হত্যা করা হয়েছিল বিনায়ক রাও কাপলেকে ১৯১৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী।	লক্ষ্ণৌ দায়রা আদালত ১৯১৮ সালের ১৩ই আগস্ট সুশীলচন্দ্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আপীল কোর্ট মৃত্যু দণ্ডাদেশের আদেশ অনুমোদন ও বহাল রেখেছিলেন।
মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ওরফে নরেশ চৌধুরী উজ্জ্বলা মজুমদার ওরফে 'অমিয়া', ওরফে মলয়া', ওরফে 'মলিনা', ওরফে 'লীলা' সুশীলকুমার চক্রবর্তী ওরফে অজিতকুমার ধর মধুসূদন ব্যানার্জী ওরফে অমিয় ব্যানার্জী সুকুমার ঘোষ ওরফে লণ্টু	অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী।	স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে ১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ভবানী, রবীন্দ্রনাথ এবং মনোরঞ্জনের। উজ্জ্বলাকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মধুসূদন এবং সুকুমারকে দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। সুশীল কুমারকে দেওয়া হয়েছিল ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী		হাইকোর্ট ১৯৩৪ সালের ৩রা ডিসেম্বরের রায়ে ভবানী ও রবীন্দ্রর ফাঁসির আদেশ বহাল ও অনুমোদন করেছিলেন। মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের বদলে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। উজ্জ্বলাকে যাবজ্জীবনের বদলে দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। বাকিদের দণ্ডাদেশ বহাল থেকে গিয়েছিল।
নির্মলজীবন ঘোষ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ রায় কামাখ্যাচরণ ঘোষ সনাতন রায় নন্দদুলাল সিংহ সুকুমার সেনগুপ্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ পূর্ণানন্দ সান্যাল মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী সরোজরঞ্জন দাস কানুনগো	মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামী।	স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে ১৯৩৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী নির্মলজীবন, ব্রজকিশোর এবং রামকৃষ্ণকে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। কামাখ্যাচরণ, সনাতন, নন্দদুলাল এবং সুকুমারকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। বাকিরা মুক্তি পেয়েছিলেন। হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন করেছিলেন ১৯৩৪ সালের ৩০শে আগস্ট।
বিনয় বসু বাদল গুপ্ত ওরফে সুধীর গুপ্ত দীনেশ গুপ্ত	সিম্পসন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত। অবশ্য বাদল গুপ্ত সায়ানাইডে ঘটনাস্থল রাইটার্স বিল্ডিংসসেই আত্মহত্যা করেছিলেন। বিনয় বসু মামলা শুরু হওয়ার আগেই মারা	দীনেশ গুপ্তের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
	গিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বিচার হয়েছিল কেবলমাত্র দীনেশ গুপ্তর। ঘটনা —১৯৩০ সাল।	
ভগৎ সিং	লাহোর ষড়যন্ত্র ও অ্যাসেমব্লি হলে বোমা বিস্ফোরণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।	ফাঁসির আদেশ হয়েছিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়। প্রিভি কাউন্সেল বহাল রেখেছিলেন ঐ ফাঁসির আদেশ। অ্যাসেমব্লি হলে বোমা বিস্ফোরণের জন্যও তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল।
প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী সত্যব্রত চক্রবর্তী হৃষিকেশ ভট্টাচার্য সরোজকুমার বসু হরিপদ বসু প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল কালীপদ সরকার অশোকরঞ্জন ঘোষ শশধর সরকার লালু পানডে	হিলি স্টেশন মেলব্যাগ ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত আসামী। ঘটনা ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস।	স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি হয়েছিল।
ক্ষুদিরাম বোস	১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মজাফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে বোমা বিস্ফোরণ করায় মারা গিয়েছিলেন কেনেডি পরিবারের দুই মহিলা।	ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল।
প্রফুল্ল চাকি	ক্ষুদিরামের সাথে মুজাফ্ফরপুরের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন।	গ্রেপ্তার এড়াতে প্রফুল্ল চাকি সায়নাইডে আত্মহত্যা করেছিলেন।
প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য	মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাশকে হত্যা করেছিলেন।	দোষী প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডিত হয়েছিলেন।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
যতীন দাস	লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের সাথে মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র দক্ষিণ কলকাতা ডিভিশনের প্রধান ছিলেন সুভাষচন্দ্র আর অন্যতম সংগঠক ছিলেন যতীন দাস।	লাহোর জেলে বন্দী অবস্থায় ৬৩ দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর।
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে কলকাতার মানিকতলার বাগানবাড়ী থেকে গ্রেপ্তারিত হয়েছিলেন ২রা মে।	তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালত ১৯০৯ সালের ৬ই মে। পরে আপিলে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাতিল করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
উল্লাসকর দত্ত	বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সাথে রাজদ্রোহের অভিযোগে উল্লাসকর দত্তকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে তাঁর মানিকতলার বাগানবাড়ী থেকে গ্রেপ্তারিত হয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ২রা মে।	তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ১৯০৯ সালের ৬ই মে। আপিলে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।
সত্যেন্দ্রনাথ বোস	আলিপুর ষড়যন্ত্রে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন।	১৯০৭ সালে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল রাজদ্রোহিতার অভিযোগে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়।
কানাইলাল দত্ত মদনলাল ধিংরা	দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দুই বিপ্লবী প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন।	বিপ্লবী আন্দোলনে এই সব বিপ্লবীরা ছিলেন পথিকৃৎ।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
হেমচন্দ্র ঘোষ	'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র সর্বাধিনায়ক ছিলেন।	বহুবার জেলে গিয়েছিলেন গ্রেপ্তার বরণ করে।
মেজর সত্য গুপ্ত	'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র কার্যকরী সভার সদস্য ছিলেন।	কারাবরণ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য।
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়	'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'ব কার্যকরী সভার সদস্য ছিলেন।	কারাবরণ করেছিলেন বিপ্লবী সংগঠনে কাজকর্ম করার অভিযোগে।
রসময় সূর	'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র কার্যকরী সভার সদস্য ছিলেন। বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযানে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন।	দলের অ্যাকশন স্কোয়াড পরিচালনা করতেন।
নিকুঞ্জ সেন	'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র নেতৃত্বে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযানে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন।	দলের অ্যাকশন স্কোয়াড পরিচালনা করতেন।
সুপতি রায়	'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র নেতৃত্ব, ঢাকা থেকে ছদ্মবেশে বিনয়কে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন।	দলের অ্যাকশন স্কোয়াডেব সদস্য ছিলেন।
সুরেশ মজুমদার	৭নং ওয়ালিউল্লা লেনের বাড়ির মালিক ছিলেন। বিপ্লবীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল বাড়িটি। উজ্জ্বলা মজুমদার ছিলেন সুরেশ মজুমদারের মেয়ে'	লোম্যান হত্যাকারী বিনয়কে রিভলভার পৌঁছে দিয়েছিলেন কলকাতা থেকে ঢাকায়। সঙ্গে নিয়েছিলেন কন্যা উজ্জ্বলাকে।
বিপিন গাঙ্গুলী	আইন অমান্য আন্দোলনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন। দীনেশ গুপ্ত সেই সময় একই জেলে একটি 'কনডেমড' সেলে ছিলেন। অপর একটি 'কনডেমড' সেলে ছিলেন ফাঁসির আসামী রামকৃষ্ণ।	জেল খাটতে হয়েছিল।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় হরিকুমার চক্রবর্তী পূর্ণ দাস	জীবনলাল, হরিকুমার ও পূর্ণদাস আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন। এই সময় সুভাষচন্দ্রও ছিলেন বন্দী অবস্থায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।	সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে রাজ-বন্দীরা জেলের মধ্যে নানা দাবীর আওয়াজ তুলেছিলেন ইংরেজ সরকারের অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে।
গণেশ ঘোষ অনন্তকুমার সিং লোকনাথ বল	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে দলনেতা সূর্য সেনের সাথে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'জালালাবাদে'র লড়াইয়ের ইতিহাসের পাতায় চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে এঁদের নাম।	প্রত্যেকের শাস্তি হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালের আদেশে।
উধম সিং	২১ বছর পর পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবী বিলেতে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারী নায়ক জেনারেল ও' ডায়ারকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের সেই রক্তাক্ত দিনটি ছিল ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল।	বাংলার পরেই বিপ্লবী কার্যকলাপে স্থান ছিল পাঞ্জাবের। পাঞ্জাবের এই যুবকটিকে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে অনেকেই ভুলে গিয়েছেন।
জ্যোতিষ জোয়ারদার মণি সেন, শৈলেশ রায়, তেজোময় ঘোষ, রমাপতি মিত্র, ভূপেন সরকার, নেপাল সেন, প্রভাত নাগ, জীবন দত্ত, জটু ভাই	সকলেই ছিলেন ঢাকার লোক। বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।	এঁদের মধ্যে অনেকেই কারাবরণ করেছিলেন।
ইন্দুভূষণ রায় উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী শিশিরকুমার ঘোষ পরেশচন্দ্র মল্লিক বিভূতিভূষণ সরকার	এই পাঁচ বিপ্লবী ১৯০৮ সালের ২রা মে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং অন্যান্যদের সাথে। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের কলকাতার মানিকতলার বাগানবাড়ী থেকে এঁদের সকলকে পাওয়া গিয়েছিল গ্রেপ্তার করার সময়।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে আলীপুরের দায়রা আদালতের রায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

বিপ্লবীদের নাম	কোন্ মামলায় জড়িত	মামলার পরিণাম
হেমচন্দ্র দাস	১৯০৮ সালে ৩৮/৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের সাথে ১৯০৮ সালে।
নিবাপদ রায়	গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯০৮ সালে ১৫নং গোপীমোহন লেন থেকে।	আলীপুরে বিচাব হয়েছিল।
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য শৈলেন্দ্রনাথ বোস	১৯০৮ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৪৮নং গ্রে স্ট্রীট থেকে।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার হয়েছিল আলীপুরে।
সুধীরকুমার সরকার	১৯০৮ সালের ১৫ই মে গ্রেপ্তার কবা হয়েছিল খুলনা থেকে।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে বিচার হয়েছিল।
হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল	১৯০৮ সালের ১০ই মে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিলেট থেকে।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।
কৃষ্ণজীবন সান্যাল	কনসাঁটে ধরা পড়েছিলেন ১৯০৮ সালের ১৬ই মে।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।
বরেন্দ্রনাথ সেন সুশীলকুমার সেন	১৯০৮ সালের ১৫ই মে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিলেট থেকে।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে
ইন্দ্রনাথ নন্দী	গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩৭নং কলেজ স্ট্রিট থেকে ২৩শে জুন, ১৯০৮।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।
কৃষ্ণহরি কেনি	৩০শে জুলাই ১৯০৮ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কানপুর থেকে।	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।
বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস অশ্বিনীকুমার ঘোষ গোপীমোহন দাঁ	বরানগর-আলমবাজার মামলায় অভিযুক্ত আসামী। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বরানগর ও আলমবাজারের বিপ্লবী ঘাঁটি থেকে।	অভিযোগ ছিল বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ রাখার।

সূর্য সেন

বিপ্লবী সূর্য সেনের ফাঁসির আদেশ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানটি হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। এই অভিযানের পর ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বিলি করা হয়েছিল শহরে-গাঁয়ে-গঞ্জে। ইস্তাহারটির ইংরেজি বয়ান ছিল—

"The INDIA REPUBLICAN ARMY further declares that any person will be able to produce any Englishman, woman or child of any age to its headquarters, dead or alive, will be amply rewarded.

INDIAN REPUBLICAN ARMY

"Chittagang Branch."

এই ইস্তাহারটির বয়ান থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজদের প্রতি ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবী সৈনিকদের মনোভাব কী ছিল। ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নেতৃত্বে ছিলেন মহান বিপ্লবী সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা।

১৯৩২ সাল। ১৩ই জুন ধলঘাটে হত্যা করা হল ক্যাপ্টেন ক্যামরুনকে। ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলিতে খুন হলেন মিসেস্ সুলিভ্যান নামে ৬০ বছরের একজন ইংরেজ মহিলা। এই দুটি হত্যাকাণ্ড বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করায় ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসন আরো সক্রিয় হয়ে উঠলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবী সৈনিকদের বিরুদ্ধে।

ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারত থেকে ইংরাজ শাসনের অবসান।

রাজদ্রোহী ও হত্যাকারী হিসেবে সূর্য সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল ব্রিটিশ প্রশাসন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের গৈরালা থেকে গ্রেপ্তার করা হল ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সর্বময় নেতা মহান বিপ্লবী সূর্য সেনকে। গ্রেপ্তারের পর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল একটি গুলি ভরা রিভলভার। এ ছাড়া তাঁর হেফাজত থেকে পুলিশ উদ্ধার করল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। এইসব নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছিল সূর্য সেনের সঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ঘনিষ্ঠতা। প্রীতিলতা ওই সময় ছিলেন ২০ বছরের যুবতী। এই বয়সেই তিনি রিপাব্লিকান আর্মির সভ্যা হিসেবে মাস্টারদার

আদেশে পাহাড়তলি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণ করা হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। এই অপারেশনের সময় মিসেস্ সুলিভ্যানের মৃত্যু ঘটল আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু লোকজনও আহত হ'ল। আজ ভাবতেও কষ্ট হয় রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অপারেশনের পর নেত্রী প্রীতিলতার মৃতদেহ পাওয়া যায় পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট সন্নিহিত অঞ্চলে। ওই অল্প বয়সেই মেয়েটির বিপ্লবী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রীতিলতার মৃতদেহের শবব্যবচ্ছেদের পর ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে জানা গেল পটাশিয়াম সায়ানাইডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রীতিলতা পাহাড়তলি অপারেশনের পর পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। শত্রুর হাতে ধরা দিতে চাননি বলেই বোধ হয় পটাশিয়াম সায়ানাইড পুরিয়া করে সঙ্গে রেখেছিলেন।

ক্যাপ্টেন ক্যামিরুন হত্যা ও অন্যান্য অভিযোগে একটি ফৌজদারী মামলা রুজু হয়েছিল সূর্য সেন (মাস্টারদা), তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও অন্যান্য আইনের বিভিন্ন ধারায়।

মামলার তদন্ত শুরু হল। ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে গ্রেপ্তার করা হ'ল তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে। তদন্তের সময় জানা গেল ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির কর্ণধার মাস্টারদার হেফাজত থেকে যে রিভলভারটি উদ্ধার করা হয়েছিল, সেটি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত রিভলভারগুলির মধ্যে একটি।

যাই হোক, তদন্ত শেষ করে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার মামলাটিতে চার্জসিট্ দাখিল করেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১/১২১(এ)/৩০২/১০৯ধারায়, ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯(এফ্) ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৪(বি) ধাবায় মামলাটিতে অভিযুক্ত করা হল সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তকে।

অভিযুক্ত আসামীদের বিচার শুরু হল বঙ্গীয় ফৌজদারী (সংশোধিত) আইনের বিধি ব্যবস্থা মোতাবেক নির্দিষ্ট কমিশনারস্‌দের আদালতে। না বললেও বুঝতে অসুবিধা নেই ১৯২৫ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনটি তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সোচ্চারিত বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য।

কমিশনারস আদালতে সূর্য সেনের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগটিতে বলা হ'ল—অভিযুক্ত সূর্যকুমার সেন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায় চার্জ গঠন করা হ'ল।

দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হ'ল—সূর্যকুমার সেন ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যে যুক্ত। এই অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় চার্জ গঠন করা হ'ল।

তৃতীয় অভিযোগ—সূর্যকুমার সেন ধলঘাটে ক্যাপ্টেন ক্যামিরুন হত্যার দায়ে দায়ী। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় চার্জ গঠন করা হ'ল।

চতুর্থ অভিযোগ—সূর্যকুমার সেন পাহাড়তলিতে মিসেস্ সুলিভ্যানকে হত্যার ব্যাপারে প্ররোচিত করেছিলেন অন্যান্য হত্যাকারীকে। এই অভিযোগে চার্জ গঠন করা হ'ল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারায়।

সূর্য সেনের বিরুদ্ধে পঞ্চম চার্জটি ছিল ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯(এফ্) ধারায়।

অভিযুক্ত অপর দুই আসামী তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধেও হত্যার অভিযোগে চার্জ গঠন করা হ'ল।

এ ছাড়া তারকেশ্বর দস্তিদারের বিরুদ্ধে অ্যাসিস্টান্ট সাব-ইন্সপেক্টার শশাঙ্ক ভট্টাচার্যকে ১৯৩১ সালের ৬ই মার্চ খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অপর একটি চার্জ গঠন করা হ'ল।

আসামীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য মামলাটিতে সাক্ষ্য নেওয়া শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ১৫ই জুন থেকে। ১৭০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল মামলাটিতে। ৩৪৬টি নথিপত্র এগজিবিটস্ হিসেবে আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ১৪ই আগস্ট বিচার শেষে মামলার রায় বের হয়।

সবকটি অভিযোগেই সূর্য সেনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তও তাদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগে দোষী বলে সাব্যস্ত হন। মামলায় সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম হল। কল্পনা দত্তকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

কমিশনারস্‌দের রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হয় দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকে। আপিলে দন্ডিত আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টে আইনজীবী নিযুক্ত হয়েছিলেন বি. সি. চ্যাটার্জী, রাধিকারঞ্জন গুহ, সন্তোষকুমার বসু, পরিমল মুখার্জী, জে. সি. গুপ্ত এবং এ. কে. দাস। ভারতের ব্রিটিশরাজের পক্ষে ছিলেন তদানীন্তন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন. এন. সরকার।

আপিলের শুনানি হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে। বেঞ্চটি গঠন করা হয়েছিল তিনজন মাননীয় বিচারপতিকে নিয়ে। বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন প্যাংরিজ্র সাহেব, আমীর আলী এবং এস. সি. ঘোষ।

কমিশনারস আদালতের রায়টিতে ছিল ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবী সৈনিকদের কার্যকলাপের প্রায় পুরোপুরি ইতিহাস। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত চট্টগ্রামের প্রায় সব ঘটনাবলীর বিশদ আলোচনা।

সূর্য সেনের সম্বন্ধে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা ছিলেন অস্ত্রাগার অপারেশনের মূল নেতা এবং মাস্টারদার নেতৃত্বেই অস্ত্রাগার লুন্ঠন অভিযানটি হয়েছিল। অপরদিকে সূর্য সেনের পক্ষে সওয়াল করা হয় সূর্য সেন ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে ছিলেন না। পুলিশ অফিসার রমণীমোহন মজুমদারের ব্যক্তিগত ডাইরিটি ছাড়া এই ব্যাপারে অন্য কোন সাক্ষ্য-সাবুদ নেই। আদালতের কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেন চট্টগ্রামে থেকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এই ব্যাপারে প্রমাণের জন্য সরকারপক্ষের থেকে বিপ্লবীদের একটি নামের তালিকা মামলায় এগজিবিট্ হিসেবে দাখিল করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল অর্থাৎ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঠিক পরের দিন গণেশ দাসের বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ বিপ্লবী দলের বিপ্লবীদের একটি তালিকা উদ্ধার করেছিল। সেই তালিকায় মাস্টারদার নাম ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন অভিযানের নেতা হিসেবে। মামলায় সূর্য সেনের নিজ হাতের লেখা একটি চিঠি দাখিল করা হয়েছিল। সূর্য সেন নিজেও স্বীকার করেছিলেন চিঠিটি তাঁর হাতে লেখা। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

"পুজোর ছুটির পর আমি এবং আমার সহকর্মীরা আক্রমণের ব্যবস্থাদি নিয়ে এমন ভাবে কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে আশ্চর্যজনকভাবে সবাই রানীর কথা ভুলেই বসেছিলাম।"

চিঠিটি থেকে আরো প্রকাশ পায়—দীর্ঘ ছয় মাসের অশেষ প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অপারেশন সম্ভব হয়েছিল। সব বিপ্লবী সৈনিকরাই এই ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন।

ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সদস্যদের ১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ হিলসে প্রায় ২/২½ ঘণ্টা লড়াই হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আর্মি পশ্চাদপদসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১২ জন বিপ্লবী সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিলেন এই সংঘর্ষে। পরে জালালাবাদ হিলস্ থেকে নেমে এসে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করেছিলেন।

এই চিঠিটি থেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযান, জালালাবাদ হিলসের লড়াইয়ের সব ঘটনার মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া যায়।

পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রীতিলতার একটি চিঠি মামলায় এগজিবিট্ করা হয়েছিল। সেই চিঠিটি থেকে দেখা যায়—

প্রীতিলতা মাস্টারদার ডাক পেয়েছিলেন পাহাড়তলি আক্রমণে যোগ দেওয়ার জন্যে। মাস্টারদার মত শ্রদ্ধেয় নেতা তাঁকে ওই অপারেশনের নেতৃত্ব নিতে বলায় একজন মহিলা হিসেবে প্রথমে তাঁর মনে দ্বিধা এসেছিল। কিন্তু মাস্টারদার অনুপ্রেরণায় ও আদেশে শেষপর্যন্ত তিনি নেতৃত্ব দিতে রাজি হন। মহান নেতার আদেশ তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। পুরুষ সৈনিকের বেশে তিনি পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে যান।

সূর্য সেনের একটি চিঠি থেকেও প্রীতিলতার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

মাস্টারদা ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি প্রীতিলতাকে একটি চিঠিতে লিখছেন—

"Today I remember more that emblem shed, pure and beautiful whom I immursed fifteen days ago, putting weapon in her one hand and nectar in the other. The remembrance of her is predominant even for a moment during these fifteen days, whom I sent to the field of battle dressing her up with my own hands in battle attire whom I permitted to jump into the sure jaws of death. When I told her pitensly after I had dressed her up that I hadd ressed her for the last time and her Dada would never in his life dress her again the idol smiled a little."

চিঠিটি সম্ভবত বিজয়া দশমীর দিন লেখা হয়েছিল। কারণ চিঠির মাথায় ' 'বিজয়া' শব্দটি লেখা ছিল। চিঠির বয়ান থেকে বোঝা যায় প্রীতিলতার কথা মনে করেই মহান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন নিজ হাতে চিঠিটি লিখেছিলেন। ইংরেজি চিঠিতে ব্যবহৃত 'nectar' কথাটির মানে ছিল 'বিষ'। 'Battle attire' কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যুদ্ধে 'সৈনিকের পোশাক'। সৈনিকের পোশাকেই প্রীতিলতার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়তলি অভিযানের পরে।

আসামীদের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল—পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আক্রমণ মোটেই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযান নয়। আদালত এই যুক্তি মেনে নেয়নি। কারণ হিসেবে রায়ে বলা হয়েছিল পাহাড়তলির রেলওয়ে ইনস্টিটিউটটি ব্যবহার করতেন ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা যাদের সম্বন্ধে বিপ্লবীদের ধারণা ছিল তারা সবাই ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক। এই চিন্তাধারা থেকেই ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নিধনের জন্যে পাহাড়তলির ক্লাব আক্রমণ করা হয়েছিল। প্রীতিলতা নিজেই একটি চিঠির মাধ্যমে স্বীকার করেছিলেন ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বিপ্লবী সৈনিকরা হাতে মারণাস্ত্র নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের প্রাণে শেষ করার জন্য।

সরকার পক্ষের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ছিলেন ধলঘাটে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো দুজন বিপ্লবী—নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। এই দুজনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান ১৩ই জুন তারিখে।

স্নেহলতা নামে একটি বছর চোদ্দ বয়সের মেয়ে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিল। স্নেহলতা ধলঘাটে মাস্টারদার উপস্থিতির কথা স্বীকার করেছিল। মেয়েটি ধলঘাটের ঘটনারও বিশদ বিবরণ দিয়েছিল।

এবার আসা যাক তারকেশ্বর দস্তিদারের কথায়। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়—অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদার ১৯৩২ সালে কলকাতায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী যতীন দাসের অনশন ধর্মঘটকেও সমর্থন জানিয়েছিলেন তারকেশ্বর দস্তিদার। একজন পুলিশ অফিসারের ডাইরি থেকে জানা গেল ১৮ই এপ্রিল বিকেলে তারকেশ্বরকে চট্টগ্রামে দেখা গিয়েছিল। অবশ্য আদলত পুলিশ অফিসারের এই সাক্ষ্য বিশ্বাস করেননি। তারকেশ্বর দস্তিদারের দিক থেকে বলা হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল তিনি ছিলেন রাজসাহীতে। এই তারিখে আসামী তারকেশ্বর যে রাজসাহীতেই ছিলেন এই ব্যাপারে আসামীদের পক্ষে থেকে কোন প্রমাণাদি আদালতের কাছে পেশ করা হয়নি। মামলায় বলা হ'ল আসামী তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩০ সালে বোমা বিস্ফোরণে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। এই সময় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সব কাজকর্ম করতেন তারকেশ্বর দস্তিদার। পরে ইন্সপেক্টর তারিণী চরণ মুখার্জীকে হত্যা করার অপরাধে বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হয়। তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর চাঁদপুরে। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ কার্যকরী হওয়ার আগে তাঁকে রাখা হয়েছিল জেলে। এই সময় প্রীতিলতা আলিপুর জেলে বহুবার রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। জেল রেজিস্টার থেকে জানা যায় প্রীতিলতা বার চল্লিশ আলিপুর জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ওই সময় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আলিপুর জেলে আটক আবস্থায় মৃত্যুর দিন গুনছিলেন।

ধলঘাট থেকে প্রীতিলতার একটি চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিটি থেকে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতিলতার যোগাযোগের ব্যাপারটি জানা যায়। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রীতিকে বলেছিলেন 'ফুট্যদা' তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে একজন। ফুট্যদা বন্ধু হলেও তাঁর কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। এই ফুট্যদাই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে বিপ্লবের পথে এনেছিলেন।

মামলার সাক্ষ্য থেকে পরে জানা গেল এই ফুট্যদা' বা ফুটুদা' প্রকৃতপক্ষে তারকেশ্বর দস্তিদার। তারকেশ্বর দস্তিদার ধলঘাট ষড়যন্ত্রে বা পাহাড়তলি অভিযানে যুক্ত ছিলেন। আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সূর্য সেনের মত তারকেশ্বর দস্তিদারও একই দোষে দোষী।

আসামী কল্পনা দত্ত ১৯৩২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর পাহাড়তলি থেকে পুরুষের বেশে ধরা পড়ার পর ২৩শে নভেম্বর জামিনে মুক্তি পান। এরপর কল্পনা দত্ত আত্মগোপন করেন জামিনে থাকা অবস্থায়। এই সময় কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১০৯ ধারায় একটি মামলা আদালতে ঝুলছিল।

সরকারপক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হ'ল সূর্য সেনকে গ্রেপ্তারের সময় কল্পনা দত্ত একই জায়গায় ছিলেন। কিন্তু কোনভাবে তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে একফাঁকে সরে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে সেদিন ধরা যায়নি।

কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করার পর গহিরা থেকে একটি বিশেষ প্রমাণপত্র পাওয়া গিয়েছিল। প্রমাণপত্রটি কল্পনা দত্তের নিজের হাতে লেখা। প্রমাণপত্রটির অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুরো লেখাটি বোঝা যায়নি। যে অংশটি বোঝা যাচ্ছিল তার থেকে দেখা যায় কল্পনা দত্ত ছিলেন কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী। ছাত্রী অবস্থায় কল্পনা বিপ্লবী কাজকর্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মিতে যোগ দেন। কল্পনা দত্ত রিপাব্লিকান আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানের পরেই। তাঁর প্রধান কাজ ছিল বিচারাধীন বিপ্লবীদের যে কোন উপায়ে জেল থেকে বাইরে বের করে আনা। এ ছাড়া জেলবন্দী বিপ্লবীদের জেলের অভ্যন্তরে আগ্নেয় অস্ত্র সরবরাহ করা। মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আদালত বললেন, কল্পনা দত্ত ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন। মহিলা বিবেচনায় ফাঁসির বদলে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—আপিল শুনানির পর মহামান্য হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায়'ত বহাল রাখলেনই উপরন্তু রায়ে আরো মন্তব্য করলেন—এই সব বিপ্লবী রাজদ্রোহীরা ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযান চালিয়ে মানুষকে হত্যা করে দেশের আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করেছেন নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। মহিলা কিংবা শিশুরাও এঁদের ক্রোধের শীকার হচ্ছে। সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডিত আসামীদের প্রতি কোন অনুকম্পা দেখানোর প্রশ্ন আসে না। সূর্যকুমার সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ যথাযোগ্য দণ্ড। কল্পনা দত্তের দণ্ডাদেশেরও পরিবর্তনের কোন কারণ নেই।

এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছিল একটি স্মরণীয় মামলার।

মামলার ফলাফল যাই হোক না কেন, আমরা কি ভুলতে পারি মহান বিপ্লবী সূর্য সেনকে, বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে, তারকেশ্বর দস্তিদারকে যাঁরা পরাধীন ভারতবর্ষকে বিদেশির হাত থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছিলেন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে।

মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা

১৯৩১ সালের ৯ই জুলাই। সিলেট সহর। দ্বারকানাথ গোস্বামীর নেতৃত্বে ৪০ জন যুবক-যুবতীর একটি মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল সিলেট সহরের টাউন হলের দিকে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের হাতে ছিল কালো পতাকা। সামনের দিকের কয়েকজনের কাছে ছিল বিপ্লবী শহিদ দীনেশ গুপ্ত ও ভগৎ সিংয়ের বড় ব্যানারের ছবি। মিছিলটি পৌঁছল সিলেট টাউন হলে। এরপর অনুমান সন্ধে ৬টা নাগাদ প্রায় ২০০ লোকের একটি সভা অনুষ্ঠিত হল টাউন হলে। সভায় দ্বারকানাথ গোস্বামীর বক্তৃতার পর সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সিদ্ধান্তটি ছিল—'দীনেশ গুপ্ত মাতৃভূমির জন্য যে মহৎ আদর্শের নিদর্শন রেখে গেলেন তার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সিলেটবাসী তাঁকে তারিফ করছেন, এই সভা সকলকে অনুরোধ করছে সেই একই পথ অনুসরণ করতে।'

এর কয়েকদিন পর অর্থাৎ ২৬শে জুলাই নেওয়া হল অপর আর একটি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তটিতেও দ্বারকানাথ গোস্বামী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিদ্ধান্তটি হল—

'ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু, দীনেশ গুপ্ত এবং অন্যান্য বীর শহিদ যাঁরা দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের জীবন বলিদান করেছেন, যাঁদের ব্রত ছিল বিদেশি শোষণের অবসান—সেইসব বীর শহিদের নির্ভীকতা ও আদর্শকে সামনে রেখে সুরমা উপত্যকার যুবশক্তিকে এগিয়ে যেতে হবে।'

এই সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে দ্বারকানাথ গোস্বামীকে অভিযুক্ত করে একটি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হল সরকারপক্ষ থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৫/ ৩০২ এবং ১১৭/৩০২ ধারায়। সিলেটের দায়রা আদালতে মামলাটির বিচার শুরু হল। সাক্ষ্য ও সওয়াল জবাব শোনার পর জুরিরা সবাই একমত হয়ে আসামী দ্বারকানাথকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। জুরির বিচারে আসামী নির্দোষ বলে ঘেষিত হলেও দায়রা আদালতের জজ সাহেব জুরিদের সঙ্গে একমত হতে না পারায় দায়রা আদালত মামলাটিকে রেফারেন্স কেস হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিলেন বিচারের জন্যে।

এরপর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি উঠল ১৯৩২ সালে। হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি ছিলেন জ্যাক ও এম. সি. ঘোষ।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী ছিলেন স্যার এন. এন. সরকার ও অনিলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আসামী-পক্ষ সমর্থন করেছিলেন বি. সি. চ্যাটার্জী, হেমেন্দ্রকুমার দাস, পরেশলাল সোম, প্রিয়নাথ দত্ত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ পালিত।

কলকাতা হাইকোর্ট মামলার নথিপত্র দেখে ও দু-পক্ষের সওয়াল শুনে সিদ্ধান্তে এলেন যে, অভিযুক্ত আসামী দ্বারকানাথ গোস্বামীর মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবশক্তিকে খেপিয়ে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা।

ভারতের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করার জন্যই বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত, ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু এবং হরকিষেণের বিপ্লবী কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে এবং যুবসমাজকে ওইসব বিপ্লবীদের পথে চলার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছে। যেসব দেশদ্রোহী ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের পথকেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। অভিযুক্ত আসামীর দুটি সিদ্ধান্তই রাজদ্রোহিতামূলক। জুরিরা দায়রা আদালতে আসামীকে নির্দোষ ঘোষণা করলেও হাইকোর্ট জুরিদের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। হাইকোর্ট আরো বললেন, হাইকোর্টের এক্তিয়ার আছে জুরিদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে তাঁর নিজ সিদ্ধান্তে আসার।

হাইকোর্ট দ্বারকানাথ গোস্বামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭/৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করলেন। আসামীকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

কলকাতা হাইকোর্ট রায়টি দিয়েছিলেন ১৯৩২ সালের ৪ঠা আগস্ট।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষের দিকে দিকে তরুণ যুবক-যুবতীর মনে পৌঁছেছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য এক অতলস্পর্শী ডাক। সুকান্তের ভাষায় বলা যেতে পারে—

'রক্তে আনো লাল
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে
ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।'

স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছি ওঁদের, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য এক অতলস্পর্শী ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। ওঁদের কথা মনে করেই বোধ হয় লেখা হয়েছিল—

'পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে
আজ অসহ্য আবেগে
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান
রঙ লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ
ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী
আজ ঢাকা।'

অরবিন্দের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ

১৯০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের একটি বিশেষ চিঠি। চিঠিটির শিরোনাম ছিল 'আমার স্বদেশবাসীর প্রতি।' 'কর্মযোগিন'-এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা শ্রীমনোমোহন ঘোষ। তদানীন্তন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসন অভিযোগ এনেছিলেন—শ্রীঅরবিন্দের লেখা উক্ত চিঠিটি নাকি রাজদ্রোহিতামূলক। ব্রিটিশ প্রশাসনের মতে, 'আমার স্বদেশবাসীর প্রতি' চিঠিটির উদ্দেশ্য ছিল সরকারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে জনরোষ তৈরি করা। লেখক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আত্মগোপন করে থাকায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীমনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায়। মামলাটির বিচার হয়েছিল কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। শ্রীমনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ প্রমাণিত বলে সিদ্ধান্ত হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-অভিযুক্ত শ্রীমনোমোহন ঘোষকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায় ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এ ছাড়াও 'কর্মযোগিন' শ্রীনারায়ণ প্রেস থেকে ছাপা হয় বলে প্রেসটিকেও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হল। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডাদেশটি দিয়েছিলেন ১৯১০ সালের ১৮ই জুন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে শ্রীমনোমোহন ঘোষের পক্ষে আপিল করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। আপিলের শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। বেঞ্চটি গঠন করা হয়েছিল বিচারপতি হলমউড সাহেব ও বিচারপতি ফ্লেচার সাহেবকে নিয়ে।
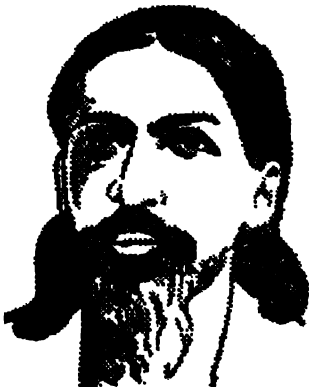
বিপ্লবী-ভগীরথ শ্রীঅরবিন্দ (১৩১৪)

দণ্ডিত আসামী শ্রীমনোমোহন ঘোষের আইনজীবী ছিলেন তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী শ্রী বি. সি. চ্যাটার্জি ও শ্রী মন্মথনাথ চ্যাটার্জি। অপর পক্ষে অর্থাৎ সরকারের পক্ষে ছিলেন মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল ও ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার মিস্টার অর সাহেব।

আপিলের শুনানি শুরু হতেই মাননীয় বিচারপতি হলমউড সাহেব অ্যাডভোকেট

জেনারেলকে লক্ষ্য করে বললেন—আমরা 'কর্মযোগিন'-এ ছাপানো চিঠিটি থেকে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যার থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে কোনরকম উত্তেজনা ছড়ানোর প্রচেষ্টা অথবা যা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কোন ক্ষোভ সৃষ্টি করার প্রয়াস।

উত্তরে অ্যাডভোকেট জেনারেল বললেন—মিঃ লর্ড, আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারাটির মূল বয়ান আদালতের কাছে তুলে ধরে অভিযোগের সারমর্ম প্রমাণ করতে পারি। মাননীয় বিচারপতি হলমউড বললেন—নিশ্চয়ই আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা লেখাটিতে আপাতগ্রাহ্য কোন দোষত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না।

জজসাহেবের মন্তব্য শুনে অ্যাডভোকেট জেনারেল তখন শ্রীঅরবিন্দের 'আমার স্বদেশবাসীর প্রতি' লেখাটির কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। আদালতকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—লেখাটির মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার প্রয়াস রয়েছে। এই ধরনের লেখা প্রকাশ করার মূল উদ্দেশ্য সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

এরপর নিজের বক্তব্যের সারমর্ম প্রমাণ করার জন্য বহু নজির টানলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : সরকারের প্রতি কার্যত কোন আক্রমণ নেই লেখাটিতে। আপনার কী অভিমত?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : মিঃ লর্ড, কিছু শব্দ রয়েছে লেখাটির ভেতর যা থেকে বুঝতে পারা যাবে সরকারের কিছু কাজকর্মের সমালোচনা করা হয়েছে লেখাটির মাধ্যমে।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : তাহলে কি সরকারের কোন কাজের সমালোচনা করা যাবে না?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : নিশ্চয়ই করা যাবে। সেই সমালোচনা হতে হবে গঠনমূলক। লেখক, মুদ্রাকর বা প্রকাশক যদি তাঁদের পরিসীমা লঙ্ঘন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা অপরাধী।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : কীভাবে লেখাটির মাধ্যমে রাজদ্রোহিতার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : রিফর্ম-স্কিম নিয়ে আলোচনা অবশ্যই করা যেতে পারে। তাই বলে কখনই বলা যেতে পারে না যে, স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিব্রত করার জন্যেই স্কিমটি নেওয়া হয়েছে।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : লেখক শুধুমাত্র লর্ড মোরলের তৈরি বিশেষ একটি স্কিমকে আক্রমণ করে লিখেছেন। ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করা হয়নি।

লেখাটিতে কোন কোন জায়গায় সরকারকে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে জনরোষ তৈরি করার প্রচেষ্টা হয়েছে তা বোঝবার চেষ্টা করলেন মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : লেখাটির কোন অংশই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারার এক্তিয়ারে আসে না।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : দেশ শাসন করার জন্য সরকারের একাধিক ব্রাঞ্চ থাকে। কোন ব্রাঞ্চকে কটাক্ষ করা মানেই তো সরকারি প্রশাসনকে হেয় করা।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : তাহলে কি আপনি মনে করেন হাইকোর্টও সরকারেরই একটি ব্রাঞ্চ? আমি তা মনে করি না।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : না, মিঃ লর্ড! আমি সরকার মানে শাসন বিভাগকে উদ্দেশ্য করে বলতে চেয়েছি।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : তাহলে কি কোন জুনিয়র অফিসার দেশের সরকার?

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : তাহলে কি কোন চৌকিদার দেশের সরকার?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : আমি তা মনে করি না।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : লেখক কেবলমাত্র খোলাখুলি লর্ড মোরলের কার্যধারাকে সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছেন।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : মিঃ লর্ড! লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ....

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : তাহলে কি আপনি বলতে চান, লর্ড মোরলের কোন স্কিমের সমালোচনা করা সমগ্র সরকারের সমালোচনা? সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারাটি প্রয়োগ করা যাবে?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : তা অবশ্য করা যাবে না। তবে লেখাটির উদ্দেশ্য কিন্তু সরকারের প্রতি ঘৃণা জন্মানো।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, শ্রীঅরবিন্দের চিঠিটি ছাপা হয়েছে ২৪শে ডিসেম্বর সংখ্যায়, আর সর্বপ্রথম অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছে পরের বছরের ২রা এপ্রিল। এত দেরি করে অভিযোগ করার কারণ কী?

অ্যাডভোকেট জেনারেল · নানা কারণে অভিযোগটি দায়ের করতে দেরি হয়েছে। তবে দেরি যে হয়েছে সেইটি মেনে নিতেই হবে।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারের উচিত ছিল অনেক আগেই অভিযোগ আনা।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : মিঃ লর্ড! এই ধরনের সব লেখা সব সময় দ্রুত নজরে আসে না। তাই হয়তো অভিযোগ আনতে দেরি হয়েছে। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : ইংরেজ সরকার অসৎ, এমন কিছু বলা হয়নি লেখাটির মাধ্যমে। আচ্ছা মিস্টার অ্যাডভোকেট জেনারেল, কোন পুলিশ সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করা হলে কি বলা যাবে গভর্নমেন্টকে হেয় করার জন্য সমালোচনা করা হয়েছে?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : ইয়েস মিঃ লর্ড, পুলিশ গভর্নমেন্টেরই অংশ।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : তাহলে গভর্নমেন্টের কোন অফিসারের দুর্নীতির কথা বললে বা সমালোচনা করলে ধরে নিতে হবে গভর্নমেন্টকে বলা হচ্ছে। দুর্নীতির কথা বলে কাউকে, সঠিক হলেও, আক্রমণ করা যাবে না?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : বিশেষ কোন অফিসারকে উদ্দেশ করে লেখা হলে অবশ্য অন্য ব্যাপার। এখানে সরকারের সব অফিসারকেই কটাক্ষ করা হয়েছে।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : বিশেষ কোন শ্রেণীর অফিসারদের লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে কি?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : লেখাটি থেকে তাই মনে করা যেতে পারে।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : লেখাটির মাধ্যমে কেবলমাত্র মডারেটদের আক্রমণ করা হয়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : লেখাটিতে 'বয়কট' করার কথা বলা হয়েছে।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : স্বদেশী 'বয়কট' অভিযান কেবলমাত্র বিদেশী জিনিসপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এর থেকে প্রমাণ হয় না সরকারের বিরুদ্ধে 'বয়কট'।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : মিঃ লর্ড, আমি দুঃখিত 'বয়কটের' সংজ্ঞা দিতে।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'বয়কট' হল রাজনীতির হাতিয়ার। এর অর্থ কখনই সমগ্র সরকারকে 'বয়কট' করা নয়।

অ্যাডভোকেট জেনারেল : মূল উদ্দেশ্য সরকারের বিরোধিতা।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : আমরা বিচারক হয়ে পর্যন্ত বুঝতে পারছি না লেখাটির মাধ্যমে কীভাবে দেশের সরকারকে ছোট করে আইনবিরোধী কাজ করা হয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষ কী করে বুঝবেন লেখাটি দোষণীয়? একজন মুদ্রাকর কী করে বুঝবেন লেখাটি ছাপানো অন্যায়?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : মুদ্রাকর বুঝতে পারলেন না পারলেন তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা আইনের মাপকাঠিতে লেখাটি ছাপিয়ে প্রকাশ করা ঠিক হয়েছে কিনা তাই দেখা।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : এক কথায় বলুন, কোন একটি স্কিম ত্রুটিযুক্ত বলাটা কি রাজদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া?

অ্যাডভোকেট জেনারেল : যাই বলা হোক না কেন, মিঃ লর্ড, 'কর্মযোগিন'-এ শ্রীঅরবিন্দের লেখা চিঠিটি উদ্দেশ্যপূর্ণ। এর মূল উদ্দেশ্য জনরোষ সৃষ্টি করা।

এইভাবে প্রশ্ন-উত্তর চলল দুজন জজ সাহেব ও অ্যাডভোকেট জেনারেলের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পাবে, ১৯০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের লেখা 'আমার স্বদেশবাসীর প্রতি' 'কর্মযোগিন'-এ প্রকাশিত হওয়ায় লোকাল গভর্নমেন্টের অনুমোদনে কলকাতার শ্রীনারায়ণ প্রেসে পুলিশের তল্লাশি চলেছিল। এই প্রেসটি থেকেই 'কর্মযোগিন' ছাপা হত। লেখক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আত্মগোপন করায় তাঁকে পাওয়া গেল না। গ্রেপ্তার করা হল শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা, প্রেসের মালিক শ্রীমনোমোহন ঘোষকে।

জজ সাহেবদের নানা প্রশ্নের উত্তরে এবার অ্যাডভোকেট জেনারেল 'কর্মযোগিন'-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি লেখা পড়তে শুরু করলেন। ইংরেজিতে অনুবাদ করে লেখাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ডকট্রিন অব স্যাক্রিফাইস'। লেখাটির লেখক জনসাধারণকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একদল মডারেট, দ্বিতীয় দল জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদী নীতিতে বিশ্বাসী দল মডারেটদের নীতিকে নিষ্পেষণ নীতি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। লেখাটিতে বলা হয়েছিল গভর্নমেন্টের নীতি ভ্রান্ত।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : মিস্টার চ্যাটার্জি এই ব্যাপারে কী বলেন?

আসামীর উকিলবাবু এবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : মিঃ লর্ড, লেখাটির মাধ্যমে কখনই সরকারের বিরোধিতা করা হয়নি। লর্ড মোরলের রিফর্ম স্কিমটিকে সমালোচনা করা হয়েছে মাত্র। আমার মক্কেল মনোমোহন ঘোষকে এই ব্যাপারে রাজদ্রোহের অভিযোগে ফেলা যায় না। একটা ভুল ধারণার ওপর মামলা রুজু করা হয়েছে। সরকারের মামলাটি করা উচিত হয়নি। তাছাড়া বোঝাই যাচ্ছে লেখাটিতে রাজদ্রোহের দোষ থাকলে অনেক আগেই সরকারপক্ষ থেকে মামলা করা হত।

আসামীপক্ষের উকিলবাবুর জবাব শুনে অ্যাডভোকেট জেনারেল বললেন : সরকারের অনুমোদন পেতে দেরি হওয়ায় মামলাটি রুজু করতে দেরি হয়েছে।

মিস্টার জাস্টিস হলমউড : নথি থেকে আপনার যুক্তি মানা যাচ্ছে না।

মিস্টার জাস্টিস ফ্লেচার : আর্টিকেলটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৫শে ডিসেম্বর।

মিস্টার চ্যাটার্জি : ইয়েস মিঃ লর্ড। সেইদিন ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ দিন। কলকাতা শহরে কোন গোলমাল হয়নি। লেখক চিঠিটির মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে আইন মোতাবেক বিশেষ একটি স্কিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে বলেছেন। কোন গুপ্ত সংস্থার মাধ্যমে উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা করেননি।

প্রশ্ন-উত্তরের পালা শেষ হল। এবার বিচারকদ্বয় আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে রায় দান করলেন। হাইকোর্টের রায়ের দিনটি ছিল ১৯১০ সালের ৭ই নভেম্বর।

বিচারপতি হলমউড তাঁর রায়ে বললেন, লেখার মাধ্যমে রাজদ্রোহিতামূলক প্রয়াস নিলে লেখক, মুদ্রাকর বা প্রকাশক নিশ্চয়ই দায়ী হবেন। সেক্ষেত্রে সরকারপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে লেখাটি রাজদ্রোহিতার দোষে দুষ্ট। বাদীপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে, জনসাধারণকে উত্তেজিত করে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মানোই লেখাটির উদ্দেশ্য ছিল।

হলমউড সাহেব আরো বললেন : চিঠিটির অংশবিশেষের ওপর নির্ভর করে নিম্ন-আদালত অন্যায়ভাবে সিদ্ধান্তে আসায় আসামীর দণ্ড হয়েছে। সমগ্র লেখাটির বিচারে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তে আসা উচিত ছিল। সমগ্র লেখাটি পড়লে বোঝা যাবে লেখক লেখাটির মাধ্যমে সরকারের কোন সমালোচনা করেননি। আক্রমণ করা হয়েছে রিফর্ম স্কিমটির। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, মডারেটদের আক্রমণ করা হয়েছে। কারণ মডারেটরা লর্ড মোরলের স্কিমটিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

হলমউড সাহেব মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি সিদ্ধান্তে আসায় দণ্ডিত আসামীকে মুক্তির আদেশ দিলেন।

বিচারপতি হলমউড সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি ফ্লেচার সাহেবও তাঁর রায়ে বললেন : শ্রীমনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাঁর রায়েও আসামীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশের কথা বলা হল।

রায়ে আরো বলা হল : শ্রীনারায়ণ প্রেসটিকেও বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা শ্রীমনোমোহন ঘোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ থেকে হাইকোর্টের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলেন।

বর্তমান ভারত সরকারের দেখা উচিত, এই স্মরণীয় মামলাটির নথিটি যেন ভালভাবে রক্ষা করা যায়, অবশ্য যদি মূল নথিটি এখনও পর্যন্ত রক্ষিত হয়ে থাকে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে এদের কথা সবাই ভুলে গেছে

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান।"

বলিদান দেওয়া দূরে থাক, কয়েকটি নক্ষত্রকে বাদ দিয়ে বাকিদের কথা বোধহয় আজ প্রায় অনেকেরই মনে নেই। যে সব বিপ্লবী দেশের মুক্তির জন্যে লড়াই করে ফাঁসির দড়িতে মাথা গলিয়ে দিয়েছিলেন নির্ভীকভাবে, তাঁদের মধ্যে ক'জনের কথা মনে রাখা হয়েছে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে? যে সব কিশোর ও যুবক এক সময় ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশ-মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্যে নানাভাবে নিজেদের শামিল করেছিলেন বিপ্লবী কাজকর্মে তাঁদের কথা ক'জনই বা আজ জানেন? তবে কি ওদের কথা মনে করেই বিদ্রোহী কবি লিখেছিলেন—

ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান।

ক'জন ভারতবাসীর মনে আছে ঢাকার তিন কিশোর বিপ্লবী পরিমল চ্যাটার্জী, শান্তিময় গাঙ্গুলি বা অমিয়ভূষণ সেনের কথা? ক'জন আমরা মনে রেখেছি চট্টগ্রাম রেভোলিউশনারি আর্মির সভ্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বা কল্পনা দত্তের কথা? ক'জনের স্মৃতিপটে আছে ফাঁসির আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কথা? ক'জন জানেন তারকেশ্বর দস্তিদারের বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস? মাস্টারদাকে বাদ দিলে বাকিদের কথা খুব অল্প লোকই জানেন। পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনকে অপসারিত করতে যে সব বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবে শামিল হয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত তাঁদের সকলকে নিয়ে একটি প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়নি।

এবার আসা যাক ঢাকার তিন কিশোর বিপ্লবীর মামলায়। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ধরা পড়েছিল পরিমল চ্যাটার্জি, শান্তিময় গাঙ্গুলি ও অমিয়ভূষণ সেন। তারিখটি ছিল ১৯৩১ সালের ২৯শে জুলাই। ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঢাকার রেলওয়ে স্টেশনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষ থেকে। এই ছেলে তিনটির তখন বয়েস কত হবে! পরিমল ও শান্তির ছিল আঠের আর অমিয়র বয়েস ছিল পনের। ঢাকার পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর ছিল ১৮৯৯ জুলাইয়ের এক রাতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ইস্তাহার বা পোস্টার মারা হবে বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। গোয়েন্দা পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হল এই ব্যাপারে। বলা হল বিপ্লবীরা যেন কোনভাবেই পোস্টার লাগাতে না পারে। পুলিশ প্যাট্রোল সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল এই রাতে। নির্দেশ মত পুলিশ মহল সতর্ক থাকল বিপ্লবীরা যেন রাতের অন্ধকারে রাজদ্রোহিতামূলক পোস্টার লাগিয়ে জনসাধারণকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে না পারে।

রাত অনুমান দুটো। দুজন কনস্টেবল তাদের ডিউটি সেরে ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরির সামনে দিয়ে ফিরছিল। হঠাৎ তাদের দৃষ্টি পড়ল লাইব্রেরির গেটের সামনে তিনটি কিশোরের দিকে। তিনটি ছেলে কনস্টেবল দুজনকে দেখে রেলওয়ে ক্রসিংয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ছেলে তিনটি ওই দুজন কনস্টেবলের কিছুটা আগে আগে যাচ্ছিল। কনস্টেবল দুজন লাইব্রেরির গেটের সামনে এসে দেখল, গেটের পাশের দেওয়ালে ইংরেজিতে লেখা একটি পোস্টার মারা হয়েছে।

পোস্টারটির মাথায় বড় করে লেখা হয়েছে—'Blood Calls for Blood' অর্থাৎ 'রক্তের বদলে রক্ত চাই।' কিছুটা দূরে ছিল রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং। কনস্টেবল দুজন ওই লেভেল ক্রসিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। একটু আগেই ওই দিকেই যাচ্ছিল কিশোর তিনটি। ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছতেই সাদা পোশাকের কনস্টেবল দুজন দেখল—পুলিশের দুটি প্যাট্রোল পার্টি ও ডিফেন্স পার্টির কয়েকজন সদস্য বসে গল্পগুজব করছে। কিশোর তিনজন ওদের পাশ দিয়েই একটু আগে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছিল। কিছু সন্দেহ না হওয়ায় ছেলে তিনটিকে ওরা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। সাদা পোশাকেব কনস্টেবল দুজন তখন প্যাট্রোল পার্টির পুলিশদের পাবলিক লাইব্রেরির গেটে লাগানো পোস্টারের কথা জানালো। পোস্টার লাগানোর কথা শুনে তখন সবাই মিলে কিশোর তিনটির খোঁজ শুরু করল। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ দল রেলওয়ে স্টেশনে এসে উপস্থিত হল। তারা পেয়ে গেল কিশোর তিনটিকে স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর একটি বিশ্রামকক্ষে।

পরিমলের হাতে তখনও ছিল কয়েকটি পোস্টার এবং কিছু ইস্তাহার। শান্তির হাতে ছিল একটি ইলেকট্রিক টর্চ ও একটি ইস্তাহার। অমিয় পুলিশ দেখে চট করে তার হাতের প্যাকেটটি সামনে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পুলিশ দল নৌকোর মাঝিদের সাহায্যে নদীর জল থেকে প্যাকেটটি উদ্ধার করল। দেখা গেল, প্যাকেটটির মধ্যে রয়েছে পোস্টার লাগাবার আঠার শিশি ও অন্যান্য কিছু জিনিস। গ্রেপ্তার করা হল পরিমল, শান্তি ও অমিয়কে। একটি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হল ওদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১১৭ ও ৩০২ ধারায়। মামলাটি পরে বিচারের জন্যে উঠল ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে। তখন ছিল জুরির বিচার। জুরিরা সরকার পক্ষের সাক্ষী-সাবুদ ও দু পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে কিশোর তিনটিকে 'নির্দোষ' বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু দায়রা বিচারপতি জুরিদের সঙ্গে একমত হতে না পারায় মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিলেন রেফারেন্স কেস হিসেবে।

কলকাতা হাইকোর্ট শুনানির সময় বাদী পক্ষের সাক্ষী থেকে দেখতে পেলেন ঘটনার রাতের অন্ধকারেই পুলিশ দেওয়ালে লাগানো সব পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছিল। ভোরের আলোতে কেউ ওই পোস্টার দেখতে পায়নি। স্বভাবতই পোস্টারের লেখা কারো জানার সুযোগ ছিল না। পোস্টারে কী লেখা ছিল তা যদি সাধারণ মানুষ জানতেই না পারল, তাহলে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পোস্টার বা ইস্তাহার পড়ে বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোনপ্রশ্নই আসেন না। সাধারণ মানুষকে ক্ষ্যাপানোর প্রশ্নও আসে না।

কলকাতা হাইকোর্ট মামলাটি শুনে বললেন, জুরিদের সিদ্ধান্তই সঠিক। কিশোর তিনটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ বা ৩০২ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

পরিমল, শান্তি ও অমিয় মুক্তি পেল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। রায়টি দিয়েছিলেন মাননীয় বিচারপতি সি. সি. ঘোষ ও বিচারপতি কস্টেলো ১৯৩২ সালের ১২ই জুলাই।

আজ ভাবতে ভাল লাগে দেশের স্বাধীনতার জন্য এই সব কিশোর নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে নানাভাবে শামিল হয়েছিল দেশের কাজে। আবার ভাবতে কষ্ট হয়—স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এদের কথা প্রায় সবাই ভুলেই গেছে।

ওদের মনে রাখুক কি ভুলে যাক—এই সব দামাল ছেলেরা চিরকাল এগিয়ে যাবে দুঃসাহসিক কাজে। ওরাই বলতে পারে—

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল।

পুলিশের নির্দেশ না মানায় সুভাষচন্দ্রের জেল হয়েছিল

১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কর্পোরেশন স্ট্রিট ও চৌরঙ্গিব সংযোগস্থল থেকে। আগে থেকে পুলিশের কাছে খবর ছিল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ২৬শে জানুয়ারি তারিখটি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এই দিনটিকে উপলক্ষ করে মিছিল, সভা-সমিতি করা হবে শিল্পনগরী কলকাতার বুকে। নেতৃত্ব দেবেন তদানীন্তন কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু। স্বভাবতই প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠলেন তিনি। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসন ২৬শে জানুয়ারি সম্ভাব্য মিছিল, সভা-সমিতি রোধ করবার জন্যে পবিকল্পনা নিল আগে-ভাগেই। কলকাতার পুলিশ কমিশনার কলকাতা পুলিশ আইনের ৬২(এ) এবং কলকাতা সাবার্বান পুলিশ আইনের ৯৩(এ) ধারা মোতাবেক এক নির্দেশনামা জারি করলেন ১৯৩১-এর ২৪শে জানুয়ারি। নির্দেশনামাটিতে বলা হল ২৬শে জানুয়ারি কলকাতা বা তার সন্নিহিত এলাকায় কোন মিছিল বা সভা-সমিটি অনুষ্ঠিত করা চলবে না। হুকুমনামাটি সংবাদপত্র ও ইস্তাহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হল। এমন কি পুলিশ কমিশনারের হুকুমনামার একটি কপি সুভাষচন্দ্রের ওপর জারি করা হল। প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল সুভাষচন্দ্র যেন কোনভাবেই ২৬শে জানুয়ারি শহরের বুকে মিছিল বা কোন সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত করার প্রস্তুতি নিতে না পারেন। বলাই বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগের কারণ।

সুভাষচন্দ্র বসু

নির্ভীক দৃঢ়চেতা সুভাষচন্দ্র কলকাতার পুলিশ কমিশনারের নির্দেশকে সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ৪/৫ শ' লোকের একটি মিছিল কর্পোরেশন স্ট্রিট ধরে কলকাতা ময়দানের দিকে এগিয়ে আসছিল। মিছিলটিকে আটকানোর জন্য পুলিশবাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল কর্পোরেশন স্ট্রিট ও চৌরঙ্গির সংযোগস্থলে। মিছিলটি যখন ঐ সংযোগস্থলে এসে পৌছল, তখন পুলিশবাহিনী মিছিলটি রুখে দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় পুলিশ কমিশনারের জারি করা নির্দেশনামার

কথা স্মরণ করিয়ে দিল। ইতিমধ্যে আরো বহুলোক মিছিলটিতে যোগ দেয়। মিছিলের কলেবর বৃদ্ধি পায়। সুভাষচন্দ্রকে মিছিল ভেঙে দিয়ে ফিরে যেতে বলা হয়। তিনি পুলিশ কমিশনারের নির্দেশের পরোয়া করলেন না। মিছিলটি ময়দানের দিকে যেতে লাগল। পুলিশ তখন মিছিল ভেঙে দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল।

পুলিশ যখন মিছিলটিকে থামিয়ে দিয়েছিল, তখন ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়েছিল। পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ এবং ১৪ ধারায়। অর্থাৎ বে-আইনি সমাবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগ মামলাটিতে। তদন্ত শেষে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হল। বিচার শুরু হতে পৃথক পৃথক দুটো ধারায় অভিযোগ গঠন করা হল।

প্রথম অভিযোগটিতে বলা হল—সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যরা (পাঁচজনের বেশি) ১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারি কলকাতায় কলকাতা পুলিশ কমিশনারের ২৪শে জানুয়ারির নির্দেশ অমান্য করে বে-আইনি সমাবেশ করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হল—সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যরা ঐ একই জায়গায়, একই দিনে বে-আইনি সমাবেশ করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ করেছেন।

বিচারে তদানীন্তন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সুভাষচন্দ্রকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ এবং ১৪৭ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারায় তাঁকে ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আলাদাভাবে ১৪৩ ধারায় কোন দণ্ডবিধান করা হয় না।

সুভাষচন্দ্র যখন জেল খাটছেন, সেই সময় ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা। রমেন্দ্রচন্দ্র রায় নামে কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক সুভাষচন্দ্রের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে একটি আবেদন পেশ করেন। আবেদনকারী হাইকোর্টের কাছে সুভাষচন্দ্রের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে নিজের পরিচয় দিলেন। আবেদনকারীর প্রার্থনা ছিল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আইন মোতাবেক প্রমাণ হয়নি, সুতরাং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক।

সুভাষচন্দ্র তাঁর হয়ে হাইকোর্টে আবেদন পেশ করার ঘটনাটি জানতে পারলেন। জেল থেকে তিনি হাইকোর্টকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠি থেকে জানা গেল, আবেদনকারী সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন না। তাঁর জ্ঞাতসারে বা তাঁর মতামত নিয়ে রমেন্দ্রচন্দ্র রায় হাইকোর্টে আবেদনটি পেশ করেননি। আবেদনটি তাঁর পক্ষে পেশ করে আবেদনকারী মোটেই বন্ধুর কাজ করেননি। তিনি সবস্তরেই মামলাটি লড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এসেছেন। আবেদনকারী তাঁকে জনসাধারণ অথবা প্রশাসনের কাছে অপদস্থ ও তাঁর ক্ষতি করার জন্য হয়ত আবেদনটি হাইকোর্টে পেশ করে থাকবেন। মামলাটি তিনি চালাতে চান না!

সুভাষচন্দ্রের এই চিঠি পেয়ে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় লর্ড উইলিয়ামস্ ও এস. কে. ঘোষ খুব বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের চিঠির বক্তব্য জানার পরেও হাইকোর্ট মামলাটি শুনেছিলেন। যুক্তি হিসেবে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন সত্যি সত্যি যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত কোন আইন অগ্রাহ্য করে সঠিক বিচার করে না থাকেন তাহলে তার ফয়দা লুটে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হাইকোর্ট শহিদের মর্যাদা দিতে নারাজ বিচারের প্রতি সুভাষচন্দ্রের ভ্রূকুটি করা বা নিরাসক্ত ভাব দেখানোর জন্য হাইকোর্ট বিশেষত মামলাটি শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। মামলাটি শুনানির পর রমেন্দ্রচন্দ্রের আবেদনটি

খারিজ করে দিয়ে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন। ১৯৩১-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি। হাইকোর্টের রায়ে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ বহাল রইল।

হাইকোর্টের রায়টি পড়ার পর মনে হওয়া স্বাভাবিক যেন তদানীন্তন সময়ে সুভাষচন্দ্র যে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন, তা যেন হাইকোর্ট জানতেনই না। পুলিশ কমিশনারের ২৪শে জানুয়ারির নির্দেশ সম্বন্ধে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন----একজন পুলিশ কমিশনারের ওপর শহরের আইন শৃঙ্খলার সব দায়-দায়িত্ব বর্তায়, সুতরাং তিনি কলকাতা পুলিশ আইন অনুযায়ী ঐ ধরনের নির্দেশ দিতেই পারেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর পক্ষে পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ না মানা, বে-আইনি মিছিল পরিচালনা করা অন্যায় হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ সঠিক ও নির্ভুল বলে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় অভিমত জানালেন।

হাইকোর্টের রায় পক্ষে গেল কি বিপক্ষে গেল তা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের কোন মাথাব্যথা ছিল না। জেলের মেয়াদ শেষে বাইরে বেরনোর পর সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে বীরের সংবর্ধনা।

'দি হাওড়া গ্যাং কেস'

১৯১০ সালের ২০শে জুলাই হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শ্রীননীগোপাল সেনগুপ্ত এবং আরো ৪৫ জন অভিযুক্ত আসামীকে কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য সোপার্দ করেছিলেন। অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ), ১২২ ও ১২৩ ধারার। পরে অবশ্য দণ্ডবিধির ১২৩ ধারাটিকে অভিযোগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল কিছু আইনগত কারণে। তদানীন্তনকালে তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে হাইকোর্টে ট্রাইবুনালটি গঠন করা হয়েছিল। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারপতি তিনজন ছিলেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি লরেন্স জেনকিনস, বিচারপতি ব্রেট ও বিচারপতি ডি. চ্যাটার্জি। সেই সময়ে 'দি হাওড়া গ্যাং কেস' হিসাবে মামলাটি পরিচিত ছিল। 'দি হাওড়া গ্যাং কেস' কলকাতা হাইকোর্টের স্মরণীয় মামলাগুলির মধ্যে একটি।

অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ছিলেন ননীগোপাল সেনগুপ্ত, বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জি, নরেন্দ্রনাথ বোস, নিবারণচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখার্জি, পবিত্র দত্ত, শরৎচন্দ্র মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র, শিবু হাজরা, হরিপদ অধিকারী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আনন্দপ্রসন্ন রায়, বিমলাচরণ দেব, কালিপদ চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী সরকার, হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ভুটান মুখার্জি, চারুচন্দ্র ঘোষ, চুনীলাল নন্দী, ভূষণচন্দ্র মিত্র, রামপদ মুখার্জি, অতুল পাল, যোগেশ মিত্র, গণেশ দাস, শৈলেন দাস, রানী ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য, তিনকড়ি কর, মন্মথ বিশ্বাস, শিরীষচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, বিধুভূষণ বিশ্বাস, বিনয় চক্রবর্তী, দাশরথি চ্যাটার্জি, ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী, কার্তিক দত্ত, তারানাথ রায়চৌধুরী, মন্মথ চৌধুরী, সুশীলকুমার বিশ্বাস, অতুল মুখার্জি, উপেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ।

অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের মূল অভিযোগ ছিল আসামীরা সমবেতভাবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা অপসারিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ভারতবর্ষের ব্রিটিশরাজকে উৎখাত করার জন্য অভিযুক্ত আসামীরা হিংসার পথ অনুসরণ করেছেন বল প্রয়োগের মাধ্যমে। তাঁরা সংগ্রহ করেছেন মারাত্মক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ। বিপ্লবের মন্ত্রে এইসব অভিযুক্তরা দীক্ষিত। এরা চেষ্টা করছেন বহু নবীন রক্তকে নিজেদের দলে টানতে। এই জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করা হচ্ছে দেশের নির্দোষ যুবকদের। অভিযুক্ত আসামীদের দলের প্ররোচনায় বহু যুবক বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য খরচ যোগড় করার জন্য বিপ্লবী দলের পরিচালনায় বহু জায়গায় ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। খোলা হয়েছে 'স্বদেশী দোকান'।

অভিযুক্ত আসামী দলের বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযোগ, তাঁরা দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আইন-বিরুদ্ধ কাজকর্ম সংগঠিত করতে গিয়ে দুজন পুলিশ অফিসার ও একজন গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন। এ ছাড়াও তাঁরা নিজেদের যুক্ত করেছেন নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অভিযুক্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই ডাকাতির অভিযোগে বা অন্যান্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ বা অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় সেই সব মামলা থেকে বেকসুর মুক্তিও পেয়ে গিয়েছিলেন।

সব থেকে মজার ব্যাপার নেত্রা ডাকাতির অভিযোগে আলাদা বিচার না হয়ে ষড়যন্ত্র মামলাটির মধ্যে নেত্রা ডাকাতিও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও নেত্রা ডাকাতির জন্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা বিচার পর্ব অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল দেশের চলতি আইন মোতাবেক।

হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালও মন্তব্য করলেন—অভিযুক্ত আসামীদের বর্তমান ষড়যন্ত্র মামলাটিতে সব অভিযোগ ঢুকিয়ে দেওয়া অনভিপ্রেত। হাইকোর্ট আরো বললেন, সরকারপক্ষের এই ধরনের প্রচেষ্টা অভিসন্ধিমূলক।

সরকারপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী ষড়যন্ত্রের সময় সীমা ছিল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে। ষড়যন্ত্রের পীঠস্থান ছিল হাওড়ার শিবপুর, কলকাতার বিভিন্ন স্থান, নাটোর, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোর প্রভৃতি অঞ্চল। অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল লোকাল গভর্নমেন্টের আদেশ বা অনুমোদন অনুযায়ী। আসামীদের মধ্যে ললিতমোহন চক্রবর্তী ও জ্যোতিন্দ্রনাথ হাজরা ষড়যন্ত্র মামলাটিতে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের লোক। ললিতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৭শে অক্টোবর দার্জিলিং শহর থেকে। তাকে যে কোন কারণেই হোক ২রা নভেম্বরের আগে ডায়মন্ড হারবারে আনা হয় নি। ললিতকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয় ৫ই নভেম্বর। আদালতের কাছে আবেদন করা হয় ললিতের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার জন্য। ইতিপূর্বে পুলিশ ইন্সপেক্টার শামসুল আলম ২রা থেকে ৫ই নভেম্বরের মধ্যে ললিতকে বহুবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। শামসুল আলম জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ললিতের জবানবন্দি তাঁর ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। অবশ্য ৫ই নভেম্বরের আগে কেন ললিতকে আদালতে হাজির করানো হয়নি তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পুলিশের তরফে আদালতের কাছে রাখা হয়নি। আরো মজার ব্যাপার শামসুল আলমের ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করা ললিতের জবানবন্দিটি হারিয়ে গিয়েছে বলে আদালতকে জানানো হয়েছিল।

হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনাল এই ব্যাপারেও মন্তব্য করেছিলেন—এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীর জবানবন্দি হারিয়ে যাওয়া খুবই আশ্চর্যজনক। পুলিশের হেফাজত থেকে হারিয়ে যাওয়া সন্দেহজনক।

রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সি. সি. চ্যাটার্জি। প্রকৃতপক্ষে ললিতের স্বীকারোক্তিটি ছিল সমগ্র মামলাটির ভিত্তি। তাই পুলিশের কাছে ইতিপূর্বে দেওয়া ললিতের জবানবন্দি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জবানবন্দিটি হারিয়ে যাওয়া আদালত ভাল চোখে দেখেননি।

যাই হোক মামলাটিকে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য সোপার্দ করার আগে নিম্ন আদালত ৪৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। ১২০০টি প্রমাণপত্র মামলায় সরকারপক্ষ থেকে দাখিল করা হয়েছিল।

রাজসাক্ষী ললিতের স্বীকারোক্তির সঙ্গে হাইকোর্টের দেওয়া অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য ছিল ব্যবধানে ভরা। বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ললিতের সাক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না এক আদালতে দেওয়া সাক্ষ্যের সাথে অপর আদালতে দেওয়া সাক্ষ্যের মধ্যে

অপর রাজসাক্ষী যতীন হাজরা ছিল গাঁজা আসক্ত একজন মানুষ। নানা বদগুণ ছিল যতীন হাজরার। যতীন হাজরাকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯১০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। স্পেশাল ট্রাইবুনাল যতীনের স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেননি।

ষড়যন্ত্র মামলায় যে ডাকাতিগুলির কথা বলা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ১৯০৯ সালের ২৮শে অক্টোবরের হালুদবাড়ি ডাকাতি, ১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিলের চাংরিপোতা রেলওয়ে স্টেশন ডাকাতি, প্রতাপচকের ডাকাতি ১৯০৮ সালের ১৪ই অক্টোবর, রতিয়ার ডাকাতি, তারিখটি ছিল ১৯০৮ সালের ২৯শে নভেম্বর, মোরহালের ডাকাতি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। মুসাপুরের ডাকাতি এবং মহারাজপুরের ডাকাতি।

ললিত তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বলেছিল—বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা অর্থাৎ পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমুক্তি। যতীন হাজরা তার স্বীকারোক্তিতে বলেছিল---বিপ্লবী আদর্শে তার কোন আগ্রহ ছিল না। জীবনধারণের জন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সে ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিল। এ ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পান্নালাল দাস নামে অপর আর একজন আসামী স্বীকারোক্তি দিয়েছিল প্যাটারসন নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। সে বলেছিল, স্বদেশী আন্দোলনের নামে ডাকাতিগুলি করা হয়।

হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনাল রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্যর বিশ্বাসযোগ্যতা মিলিয়ে দেখার জন্য সবগুলি ডাকাতির ঘটনা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে দেখেন।

চাংরিপোতার ডাকাতি মামলা—আগেই বলা হয়েছে চাংরিপোতার ডাকাতির তারিখ ছিল ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর। হাইকোর্ট বলেন, চাংরিপোতায় আদৌ কোন ডাকাতি হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। চাংরিপোতার ডাকাতি নিয়ে ইতিপূর্বে একটি তদন্ত হয়েছিল একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে। সাক্ষ্য-সাবুদ না পাওয়ায় তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত আসামী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ফণীভূষণ মিত্রকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং চাংরিপোতার ডাকাতির ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আইনত প্রমাণ হয়নি।

শিবপুরের ডাকাতির মামলা—শিবপুরের ডাকাতির দিনটি ছিল ১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল। শিবপুরের ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে ১৯০৮ সালের ৪ঠা কিংবা ৫ই এপ্রিল। প্রমাণ না পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা যায়নি। ডাকাতির ব্যাপারেও কোন ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া গেল না। ললিতের স্বীকারোক্তি এই ডাকাতির ব্যাপারে আদালতের কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয়নি।

বাইতা ডাকাতি মামলা—তারিখ ছিল ১৯০৮ সালের ২৯শে নভেম্বর। সুশীল বিশ্বাস নামে একজন আসাম স্বীকারোক্তি দিয়ে ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়েছিল মন্মথ, ব্রহ্মপদ ও ভূপেনকে। পরে অবশ্য সুশীল তার দেওয়া স্বীকারোক্তির সত্যতা অস্বীকার করে। এই দিকটি বিবেচনা করে বাইতা ডাকাতির যড়যন্ত্রের অভিযোগটিও দাঁড়ায়নি।

বিঘাটি ডাকাতি মামলা—ডাকাতির তারিখ ছিল ১৯০৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। কার্তিক দত্ত ছিল ডাকাতির একজন আসামী। এই ডাকাতির ব্যাপারে কোন যড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে আদালত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

মোড়েহাল ডাকাতি মামলা—১৯০৮ সালের ২রা ডিসেম্বর ছিল ডাকাতির তারিখ। অবশ্য মোড়েহাল ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করায় আসামী মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর শাস্তি হয়েছিল।

যতীন মোড়েহাল ডাকাতি মামলায়ও রাজসাক্ষী হয়েছিল। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যতীন ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জড়িয়ে ছিল দাশরথি চ্যাটার্জি, শিবু হাজরা ও অতুল পালকে।

আদালত সন্দেহ প্রকাশ করেছিল আদৌ যতীন ডাকাতির সময় উপস্থিত ছিল কিনা। মন্মথ নিজেই মোড়েহাল ডাকাতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। তার স্বীকারোক্তিতে যতীন হাজরার ডাকাতির সময় উপস্থিত থাকার কোন সাক্ষ্য ছিল না। যতীন নিজেও মুক্তি পেয়েছিল প্রমাণ অভাবে। সুতরাং এই ডাকাতির ব্যাপারেও কোন যড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মাসুপুর ডাকাতি—ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি। অথচ ললিতের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় মাসুরের ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসের কোন একদিন। ডাকাতির তারিখটিতে গরমিল থাকায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়নি।

নেত্রা ডাকাতি মামলা—নেত্রার ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৩শে এপ্রিল। ললিত চক্রবর্তীকে প্রকৃতপক্ষে গ্রেপ্তার করা হয় নেত্রার ডাকাতিকে কেন্দ্র করে। ললিতকে গ্রেপ্তার করার পর তার স্বীকারোক্তি থেকে পাওয়া যায় অন্যান্য ডাকাতির ঘটনাবলী।

নেত্রার ডাকাতি হয়েছিল রামতারণ মিত্রের বাড়িতে। ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রামতারণবাবু নিজেই থানায় প্রথম এজেলাটি দায়ের করেন। এজেলাটি থেকে দেখা যায়—ডাকাতরা ডাকাতির সময় বেশ ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বলছিল। তাদের বাস্তবিক ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল। ডাকাতি করে সোনার অলঙ্কার এবং টাকা-পয়সা নেওয়ার পর ডাকাতরা যাওয়ার সময় বলেছিল—আমরা টাকা-পয়সা গয়নাগাঁটি নিচ্ছি দেশের প্রয়োজনে। আমাদের অর্থের দরকার। এই লুটের টাকা-পয়সা যাবতীয় ব্যয় করা হবে দেশের মাটি থেকে ইংরেজদের হটাতে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যখন সময় আসবে আমরা লুটের এই টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি সুদে আসলে আপনাদের ফেরত দিয়ে দেব। এর পর ডাকাতরা মালপত্র নিয়ে রামতারণের বাড়ি ত্যাগ করেছিল।

ললিতের সাক্ষ্যে পাওয়া যায় নেত্রার ডাকাতিতে প্রায় ২১জন অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে মামলার প্রথম এজেলা থেকে দেখা যায় ৭/৮ জন ডাকাতিতে অংশ নেয়। ললিত

তার স্বীকারোক্তিতে বলেছিল—ননীগোপাল সেনগুপ্তের নির্দেশ মত ট্রেনে চেপে সন্ধ্যা অনুমান ৫-৪০ মিঃ কিংবা ৬-৪০মিঃ সময়ে সে দেওল' পৌঁছায়। তার সঙ্গে আরো অনেকে ছিল। তারা সকলে একটি খোলা মাঠে এসে জড় হয়। সেই মঠে জয়নগর ও মাজিলপুরের ৫ জন লোক এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডায়মন্ডহারবার থেকে সর্বশেষ ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়ার পর প্রায় মধ্যরাতে তারা ডাকাতির লক্ষ্যস্থলে রওনা দেয়। ললিত অন্যান্যদের বামতারণ মিত্রের বাড়িটি দেখিয়ে দেয়। রামতারণের বাড়ির সামনে পৌঁছলে কালী চক্রবর্তী ও মাধারু নামে দু-জন দলের লোক বাড়ির দেওয়াল টপকায় রামতারণের বাড়িতে ঢোকার জন্য। ললিত নিজে একটি ড্রেনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। লুটতরাজ হয়ে যাওয়ার পর ললিত অন্যান্যদের পথ দেখিয়ে ২/৩ মাইল দূরে একটি গাছের তলায় এসে উপস্থিত হয়। ডাকাতির টাকা পয়সা ও গয়নাগাঁটির হিসেব-নিকেশ হয় এই গাছের তলায়। এরপর জয়নগর ও মাজিলপুর থেকে আসা লোক ৫ জনকে লুটের টাকা-পয়সা গয়নাগাঁটি ও ডাকাতির অস্ত্রশস্ত্র সব দিয়ে দেওয়া হয়। তারা কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ওখান থেকে নানা পথে চলে আসে। ললিতের গ্রুপে ছিল শৈলেন দাস, বিষ্টুপদ চ্যাটার্জি ও অতুল মুখার্জী। ললিত ওই তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে মগরা রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছায়। ওখান থেকে তারা ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে আসে।

মহারাজপুরের ডাকাতি—ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৭শে জুলাই। হালুদবাড়ি ডাকাতির মাস দুই আগে। মহারাজপুর ডাকাতির মামলা আদালতে প্রমাণ করা যায়নি।

হালুদবাড়ি ডাকাতি—ডাকাতির তারিখ ১৯০৯ সালের ২৮শে অক্টোবর। হালুদবাড়ি ডাকাতি মামলায় অবশ্য আসামী শৈলেন দাস, সুশীল বিশ্বাস, অতুল মুখার্জি, কিরণ রায়, গণেশ দাশ ও শৈলেন চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। একই মামলায় বিধুভূষণ ঘোষ ও মন্মথনাথ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের দুজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। হালুদবাড়ি ডাকাতিতে ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হালুদবাড়ি ডাকাতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়। আদালতকে বলা হয়, দশম জাঠ রেজিমেন্টের কয়েকজন সিপাইকে হাত করে নিয়ে বিপ্লবীদের নেওয়া ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওই সেপাইদের যুক্ত করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত আসামীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে। দশম জাঠ রেজিমেন্টের সজ্জন সিং, চুনাই হাবিলদার ও রামগোপালকে ভাঙিয়ে এনে দলে টানবার চেষ্টা করা হয়েছিল বিপ্লবী কাজকর্মের সুবিধার্থে এই কাজের ভার নিয়েছিল নরেন চ্যাটার্জি, শরৎ মিত্র, ভূটান মুখার্জি ও ননীগোপাল সেনগুপ্ত। সরকার পক্ষ থেকে মামলায় বলা হয় সিপাই সজ্জন সিং ও রামগোপালকে হাওড়ার শিবপুরে ভূটানের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল নরেন চ্যাটার্জি। সজ্জন সিংকে নাকি তিনবার টাকা-পয়সা দেওয়া হয়েছিল বিশেষ কারণে। একবার টাকা দেওয়া হয়েছিল নরেনের মাধ্যমে। বাকি দুবার রাজসাক্ষী ললিতের হাত দিয়ে। জাঠ রেজিমেন্টের সিপাই তিনজন নাকি সব সময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। এইসব গল্প বিশ্বাস করা ট্রাইবুনালের পক্ষে সম্ভব হয়নি নানা কারণে।

সরকারপক্ষের মতে বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওদের তৈরি 'ছাত্র-ভাণ্ডার'। 'ছাত্র-ভাণ্ডার' প্রকৃতপক্ষে খোলা হয়েছিল ছাত্রদের জন্য ১৯০৯ সালে। 'ছাত্র-ভাণ্ডার' প্রাথমিক স্তরে সমবায়-ভিত্তিক হলেও ১৯০৬ সালে এটিকে লিমিটেড কোম্পানিতে

রূপান্তরিত করা হয়। 'ছাত্র-ভাণ্ডার' ও 'যুগান্তরের' মধ্যে ছিল গভীর সম্পর্ক। 'ছাত্র-ভাণ্ডার' থেকে বিক্রি করা হত তিনটি সন্দেহজনক বই। বই তিনটির নাম ছিল—'মুক্তি কোন পথে', 'বর্তমান রণনীতি' এবং 'জাতীয় সমস্যা'।

ট্রাইবুনাল মামলার রায়ে বললেন—বই তিনটি যে কেবলমাত্র 'ছাত্র-ভাণ্ডার' থেকে বিক্রি করা হত এমন কোন প্রমাণ আদালতের কাছে নেই। বরং দেখা যাচ্ছে 'ছাত্র-ভাণ্ডার' ছাড়াও নানা দোকানে বিক্রি হত এই সব বইগুলো। ছাত্র-ভাণ্ডারের প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে এই তিনটি বই ছাড়া অন্যান্য বহু বই ছিল। এর থেকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যুক্তিগ্রাহ্য নয়। 'ছাত্র-ভাণ্ডারকে' এই ষড়যন্ত্র মামলায় যুক্ত করা অন্যায়।

'যুগান্তর'কে ষড়যন্ত্রের পুরোধা হিসেবে বলা হয়েছিল। লেখাগুলো সম্বন্ধে তদানীন্তন সময়ে সাধারণ মানুষের ছিল বিশেষ আগ্রহ। ভিড় জমে যেত 'যুগান্তর' কেনার জন্য। ভিড় সামলাতে অনেক সময় পুলিশের সাহায্য নিতে হত। যুগান্তরের লেখাগুলোর লক্ষ্য ও সুর ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে ভাল লাগত না। 'যুগান্তর'কে জব্দ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। 'যুগান্তরের' সঙ্গে যুক্ত ছিল মামলার দুই আসামী তারানাথ ও কার্তিক। এ ছাড়া আসামীদের মধ্যে অন্য কোন আসামীর 'যুগান্তরের' সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বর্তমান মামলাটির ষড়যন্ত্রের অভিযোগের সঙ্গে পরোক্ষভাবে মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্রের একটি যোগসূত্রের কথা বলতে চেষ্টা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল এই যোগসূত্রটি রক্ষা করত কার্তিক দত্ত ও হেম দাস। আরো বলা হয়েছিল, ষড়যন্ত্রকারীদের দল বিপ্লবী সংগীত, যোগব্যায়াম, লাঠি চালনা শিক্ষা দিত দলের সভ্যদের। আশ্চর্যের ব্যাপার, সমগ্র ডাকাতিগুলোতে লাঠি চালানোর কোন প্রমাণই ছিল না।

এবার এক এক অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্লেষণ করলেন আদালত।

বিচার বিবেচনার পর ৬ জন বাদে সব অভিযুক্ত আসামীদের মুক্তি দিয়ে দিলেন হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনাল।

দণ্ডিত এই ৬ জন আসামীরা ছিল শৈলেন দাস, সুশীল বিশ্বাস, অতুল মুখার্জি, গণেশ দাশ, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ সেন। এদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ দেওয়া হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায়।

হাইকোর্টের এই স্মরণীয় মামলার রায়টি হয়েছিল ১৯১১ সালের ১৯শে এপ্রিল।

'দি হাওড়া গ্যাং কেসের' কথা গুটি কয়েক পুরানো মানুষ বাদে আজ বোধহয় সবাই ভুলে গিয়েছেন। সময়ের বিবর্তনে সব কিছুই একদিন স্মৃতিপট থেকে হারিয়ে যায়।

'মুক্তি কোন পথে'—রাজদ্রোহিতার অভিযোগ

মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য যেসব দেশপ্রেমিকরা এক সময় নিজেদের জীবন উৎসর্গীকৃত করেছিলেন তাঁদের অনেকের কথাই বর্তমান প্রজন্মের কাছে আজ অজ্ঞানা। অনেকেই জানেন না বিপ্লবী অবনীভূষণ চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বোস, নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, কালীদাস ঘোষ, শচীন্দ্রলাল মিত্র, নগেন্দ্রনাথ সরকার, সুধীর কুমার দে, প্রিয়ো ওরফে কিনু, ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী, মোহিনীমোহন মিত্র, মন্মথনাথ মিত্রের বিপ্লবী জীবনের কথা।

সময়টা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের শেষাশেষি। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এই তেরজন বিপ্লবীকে। পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ফৌজদারী মামলা এনেছিলেন। এই তেরজন অভিযুক্ত বিপ্লবীদের বিচার হয়েছিল বিশেষ ট্রাইবুনালে। বিশেষ ট্রাইবুনালের রায়ে অভিযুক্ত তেরজনের বিরুদ্ধেই রাজদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এদের সাত বছর মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

বিশেষ ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে আপিল করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। আপিল মামলাটির শুনানি চলেছিল ১৯১০ সালের ১৮ই জুলাই থেকে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত।

তদানীন্তন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের অভিযোগ ছিল এই তেরজন অভিযুক্ত আসামী ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশ সরকারকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এরা সকলেই হিংসার পথ বেছে নিয়ে বিপ্লবী কাজকর্মের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল অভিযুক্তদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ। এই গোপন দলিল থেকে বিপ্লবী কাজকর্মের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে বোমা তৈরির পদ্ধতি এবং এই তৈরি বোমা দিয়ে কোথায় কীভাবে আক্রমণ হানা যেতে পারে তার বিবরণ। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনকে কিভাবে বিব্রত করে তোলা যাবে, কীভাবেই বা হত্যা করা যাবে সরকারী আমলাদের, এইসব পরিকল্পনার কথা বলা ছিল বইটির পাতায় পাতায়।

মামলায় আরো বলা হয়েছিল অভিযুক্ত বিপ্লবীরা দেশের জনসাধারণকে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য তৈরি করেছিলেন নানা ধরনের বিপ্লবী বক্তৃতা, বেঁধেছিলেন বিপ্লবী গান, লিখেছিলেন বিপ্লবী কবিতা। বিপ্লবী কাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সভ্যদের শেখানো হত লাঠিখেলা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার পদ্ধতি, শেখানো হত ছোরাখেলা

প্রভৃতি। অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য তোলা হত চাঁদা, নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হত বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য।

মামলার ঘটনার থেকে প্রকাশ—এই সব ধৃত বিপ্লবীরা হিংসাত্মক কাজ করার জন্য নানা জায়গায় ডাকাতি পর্যন্ত করেছিলেন টাকা-পয়সা সংগ্রহের জন্য। তাদের আন্দোলনকে ব্যাপকতা দেওয়াই ছিল এইসব বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য।

তেরজন অভিযুক্তর মধ্যে অবনীভূষণ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী অবনীভূষণ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তারের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট কুমুদনাথ মুখার্জী। অবনীর স্বীকারোক্তি থেকে প্রকাশ পায় অন্যান্য অভিযুক্তের নাম ও অন্যান্য নানা বিষয়। স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছিল অবনীর সাথে অন্যান্য ধৃত অভিযুক্ত আসামীরা বিপ্লবী কাজকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন।

অবনীর স্বীকারোক্তিকে কেন্দ্র করে কলকাতার ১৫নং জোড়াবাগান স্ট্রিট থেকে পুলিশ উদ্ধার করে নানা গোপন দলিল দস্তাবেজ। এইসব কাগজপত্র ছিল একটি ঘরের বিশেষ ট্রাঙ্কের ভিতরে। জানা গেল বিশেষ ঘরটিতে ওই সময় থাকতেন বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বোস আর ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত। ট্রাঙ্কটির মধ্যে পাওয়া গেল এক বান্ডিল পুস্তিকা। পুস্তিকার নাম 'মুক্তি কোন পথে।'

'মুক্তি কোন পথে' পুস্তিকায় লেখা ছিল কীভাবে সংবাদপত্র ছাপতে হবে, কী ধরনের বিপ্লবী গান বাঁধতে হবে। কী কী বিষয়ে পুস্তক রচনা করা হবে। কীভাবে গোপন সভা-সমিতি পরিচালনা করতে হবে।

এ ছাড়াও পুস্তিকাটিতে নির্দেশ ছিল গোপনভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করার এবং হিংসাত্মক কাজকর্ম পরিচালনা করার।

বিদেশী অপশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যুবকদের প্রতি নির্দেশ ছিল অস্ত্র নিয়ে প্রশাসনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। গুপ্ত সমিতির কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও নানা নির্দেশ ছিল। 'মুক্তি কোন পথে' পুস্তিকায় বর্ণনা দেওয়া ছিল বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে কিভাবে বোমা বাঁধতে হবে। পেনসিলে স্কেচ করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল কীভাবে বিপ্লবীদের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

গুপ্ত সমিতির কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা বিবরণ দেওয়া ছিল 'মুক্তি কোন পথে' পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটিতে ছাপার তারিখের কোন উল্লেখ না থাকায় কবে পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে কিছু ঘটনা থেকে বোঝা গিয়েছিল অন্তত ১৯০৮ সাল থেকে পুস্তিকাটির অস্তিত্ব ছিল। কারণ ১৯০৮ সালে চন্দননগরের মেয়র ও মেয়র পত্নীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা মারা হয়েছিল তাদের বাসগৃহের বিশেষ ঘরটিকে লক্ষ্য করে। যদিও বোমা কোন অজ্ঞাত কারণে বিস্ফোরিত না হওয়ায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই আক্রমণের উল্লেখ ছিল 'মুক্তি কোন পথে' পুস্তিকায়। এই বিবরণ থেকে স্বভাবতই বোঝা যায় ১৯০৮ সালে 'মুক্তি কোন পথে' পুস্তিকাটির অস্তিত্ব ছিল।

মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ থেকে দেখা যায় অবনীর স্বীকারোক্তির বিশেষ বিশেষ ঘটনা উদ্ধার করা দলিল দস্তাবেজের ঘটনার সাথে মিলে যাচ্ছে। তাছাড়া ধৃত আসামীরা প্রায় প্রত্যেকেই ঢাকা জেলায় পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাদের একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগও খুব বেশি ছিল।

মামলার থেকে আরও একটি বিষয় প্রাধান্য পায়। অবনীকে নাংলা ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অবনী যখন জেলে বন্দী ছিলেন, সেই সময় একই জেলে বন্দী ছিলেন বিপ্লবী ললিত। ললিতের সাথে জেলেই পরিচয় হয়েছিল অবনীর। জেলের মধ্যে অবনীর সাথে ললিতের গুপ্তভাবে চিঠির আদান প্রদান চলত। ললিত গুপ্ত চিঠি মারফত অবনীকে তার স্বীকারোক্তি অস্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা গেল অবনী বিচারের সময় আদালতে জানালেন তাঁর স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় নথিভুক্ত করা হয়নি। পুলিশের শেখানো কথা অনিচ্ছায় বলতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁকে। তিনি বলেছিলেন—পুলিশ অফিসার শামসুল আলম তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করায় তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে সেইমত মিথ্যা বিবরণ দিয়ে স্বীকারোক্তি করেছিলেন।

নথিপত্র থেকে দেখা গেল পুলিশ অফিসার শামসুল আলম খুন হয়েছেন ২৪শে জানুয়ারি। আর অবনী ও ললিতের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। বুঝতে অসুবিধা নেই শামসুল আলমকে জড়িয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য নতুন গল্প বানানো হয়েছিল শামসুল আলম ইতিমধ্যে খুন হওয়ায়। আদালত বললেন—অবনীর এই গল্প পরিকল্পিত। ললিতের গুপ্ত চিঠিটি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। সেই চিঠিতে নির্দেশ ছিল স্বীকারোক্তির বিবরণ অস্বীকার করার।

স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত হওয়ার পরও দীর্ঘকাল অবনী আদালতে কখনই জানান নি যে, তাঁর কাছ থেকে চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং পুলিশ অফিসার শামসুল আলমকে জড়িয়ে পরবর্তীকালের গল্পটি অবনীর বানানো। আদালত অবনীর স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করলেন। আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—অবনী পুলিশের বিনা প্ররোচনায় স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।

অভিযুক্ত বিধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতার ১৫নং জোড়াবাগান স্ট্রিট থেকে। তার হেফাজত থেকে পাওয়া গিয়েছিল গুপ্ত নথিপত্র। বিধু ১৫নং জোড়াবাগান স্ট্রিটের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তার লেখা চিঠিপত্রে ঠিকানা ব্যবহার করতেন আহিরীটোলা স্ট্রিটের একটি ঠিকানা দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর বাসস্থানের কথা গুপ্ত রাখতে চাইতেন বিশেষ কারণে।

অবনীর স্বীকারোক্তি থেকে আরো একটি বিশেষ ঘটনার কথা জানা গেল—নাংলায় ডাকাতি করার জন্য তাঁরা সবাই মিলে ১৩ই আগস্ট জিকরগাছার গুপ্ত সভায় জমায়েত হয়েছিলেন। বিধুর ব্যক্তিগত ডাইরি থেকে তারিখটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

যড়যন্ত্র মামলাটিতে একজন স্বনামধন্য জমিদারের নায়েব ও ভুগিলহাট পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। পোস্টমাস্টারের সাক্ষ্য থেকে প্রকাশ পায় বিধু ১৩ই আগস্ট জিকরগাছায় এসেছিলেন এবং পোস্ট অফিস থেকে মানি-অর্ডারের টাকা তুলেছিলেন। অভিযুক্ত আসামী বিধুভূষণ দে-র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হল। মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বিশেষ ট্রাইবুনাল আরো সিদ্ধান্তে এলেন—অভিযুক্ত আসামী অশ্বিনী, কালিদাস, নগেন্দ্রচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ সরকার, কিনু পই, সুধীর দে, ব্রজেন্দ্র, সতীশ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কম-বেশি রাজদ্রোহিতার যড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু অভিযুক্ত আসামী মোহিনী আর মন্মথর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হল না।

কলকাতা হাইকোর্ট আপিল মামলায় রায়দান করলেন ১৯১০ সালের ৩০শে আগস্ট।

অবনীভূষণ চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বোস, নগেন্দ্রচন্দ্র, কালিদাস ঘোষ আর শচীন্দ্রলাল মিত্রকে দেওয়া হল সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

নগেন্দ্রনাথ সরকার, সুধীরকুমার দে, প্রিয়ো ওরফে কিনু পইকে দেওয়া হল পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জীর হল তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

মোহিনী মিত্র আর মন্মথনাথ মিত্র ছাড়া পেলেন অভিযোগ থেকে। এইভাবে কত শত শত বিপ্লবী দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে নিজেদের জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিপদসঙ্কুল জীবনে। তাদের একমাত্র ব্রত ছিল স্বাধীন ভারত।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। কিন্তু এইসব দেশহিতৈষী বিপ্লবীদের কথা সবাই প্রায় আজ ভুলে গিয়েছে। এইসব বিপ্লবীরা চেয়েছিলেন দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা। ব্যক্তিগতভাবে কিছু চাননি। এঁদের কাছে একটাই ভাবনা ছিল পরাধীন ভারতবর্ষের 'মুক্তি' কোন্ পথে আসবে। স্বার্থহীনভাবে আজীবন দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করে গিয়েছেন এইসব বিপ্লবীরা।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার নথিটি থেকে জানা যায় পরাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার কথা। জানা যায় কমিউনিস্ট সংগঠনের নেতৃত্বে সশস্ত্র ও জঙ্গী বিপ্লবের লক্ষ্য ও কর্মসূচি। আরো জানা যায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগের কথা।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত ওরফে নলিনীকুমার গুপ্ত, মহম্মদ সৌকত উসমানি, মুজাফ্‌ফর আহমেদ এবং শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে।
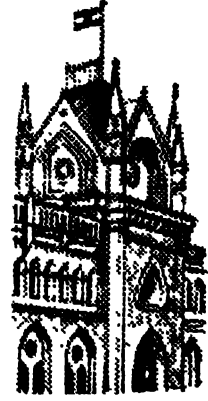
সরকারপক্ষ থেকে কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায়। সম্ভবত মামলাটি রুজু করা হয়েছিল ১৯২৩ সালের শেষের দিকে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছিল ১৯২১ সালের শুরু থেকে ১৯২৩ সালের প্রায় শেষ দিক পর্যন্ত অভিযুক্ত আসামীরা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ষডযন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল কানপুর। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র ও জঙ্গী বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছিল অভিযুক্তরা হিংসায় বিশ্বাসী। মামলার প্রধান আসামী শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় এই সময় থাকতেন ইউরোপে। সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল অভিযুক্ত আসামী মানবেন্দ্রনাথ রায় ইউরোপে থাকলেও কানপুর ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে। অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের সাথে তাঁর যোগযোগ ছিল নানাভাবে। শ্রীমানবেন্দ্রনাথের নির্দেশে ভারতের কমিউনিস্ট সংগঠনের নেতৃত্ব জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। পার্টির কর্মসূচিও নির্দিষ্ট হ'ত তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ মত।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীমানবেন্দ্রনাথকে আসামী করা হলেও তিনি ইউরোপে থাকতেন বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে আদালত ১৯২৪ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন শ্রীমানবেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা গেল না, তখন তাঁকে সাময়িকভাবে বাদ দিয়ে মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত আসামীদের বিচারের জন্য কানপুরের দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। গ্রেপ্তার না হওয়ায় সাময়িকভাবে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত রাখা হয়।

দায়রা আদালত শ্রীনলিনী গুপ্ত, মহম্মদ সৌকত উসমানি, মুজাফ্‌ফর আহমেদ এবং শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায় চার্জ গঠন করেন। এরপর দায়রা আদালতের বিচারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁরা

সকলেই দোষী সাব্যস্ত হন। তাদের সকলকেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায় ৪বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে অবশ্য দণ্ডিত আসামীরা দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট আপিল খারিজ করে দায়রা আদালতের দেওয়া দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছিলেন। দায়রা আদালত উপরোক্ত ৪জন আসামীকেই সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ২০শে মে।

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন ১৯৩১ সালে। ১৯৩১ সালের ২১শে জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বোম্বে সহরে। মানবেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯২৪ সালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বলে।

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র মামলাটি শুরু করা হয় ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। পূর্বে অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্রটি সরকারপক্ষ থেকে দায়ের করা হয়েছিল, সেইটিই পুনরায় পেশ করা হয় আদালতে। ১৯৩১ সালের ১৫ই অক্টোবর শ্রীমানবেন্দ্রনাথকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। দায়রা আদালত তাঁর বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন করেছিলেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায়।

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় দায়রা আদালত তাঁকে ১২বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। রায়ের তারিখ ছিল ১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারি। এই রায়ের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছিল। আপিলের শুনানি হয়েছিল জাস্টিস্ থম্ সাহেবের বেঞ্চে। আপিলটি খারিজ হলেও শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের শাস্তির মেয়াদ ১২ বছর কমিয়ে ৬ বছর করা হয়েছিল।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা বহু চিঠিপত্র সরকার পক্ষ থেকে এগজিবিটস্ হিসেবে আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। এ ছাড়াও একাধিক চিঠি দায়রা আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়কে তাঁর ইউরোপের ঠিকানায়। লিখেছিলেন তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট সংগঠনের একাধিক নেতা।

মামলার তদন্ত থেকে দেখা যায় ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কীভাবে সন্দেহজনক চিঠিপত্র পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে গিয়ে তার কপি ও ছবি তুলে রাখত এবং পরে খাম বন্ধ করে চিঠিগুলি নির্দিষ্ট ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিত। চিঠির লেখক ও প্রাপক গোয়েন্দা পুলিশের এই কার্যপ্রণালীর বিন্দুবিসর্গ জানতে পারতেন না। পরে চিঠির এই সব কপি ও ছবি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই চিঠিগুলির মধ্যে বহু চিঠি ছিল শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিজ হাতে লেখা চিঠি। এ ছাড়াও তদন্তের সময় তাঁর বেশ কয়েকটি চিঠি পাওয়া যায় সৌকত উসমানি, মুজাফফ্‌র আহমেদ এবং ডাঙ্গের হেফাজত থেকে। পাওয়া গিয়েছিল একাধিক বিপ্লবী পত্র-পত্রিকা এবং বহু বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা।

দায়রা আদালতে হস্তলিপি বিশারদ সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের হস্তলেখা। ইউরোপ থেকে লেখা চিঠিগুলি যে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিজ হাতে লেখা তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সরকারপক্ষ। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ অফিসারদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—দীর্ঘদিন ধরে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ লক্ষ্য রেখেছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ডাকযোগে আদান-প্রদান করা খামের চিঠিপত্র, বিভিন্ন পার্সেল এবং রেজেস্ট্রিকরা পত্র-পত্রিকার প্রতি। মাঝপথে এই সব ডাকের চিঠিপত্র, পত্র-পত্রিকা খুলে দেখে নিত

গোয়েন্দারা। সন্দেহজনক খামের চিঠিগুলির নকল রেখে দিত গোয়েন্দা পুলিশ। এইভাবে পরাধীন ভারতবর্ষে বিপ্লবী কাজকর্মের নানা সূত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ। বিপ্লবীদের বহু গুপ্ত খবর এসে গিয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের হাতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিজ হাতে লেখা বহু চিঠির নকল পৌঁছে গিয়েছিল গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। এই নকল করা চিঠির মধ্যে বেশ কয়েকটি আসল চিঠি পুলিশ উদ্ধার করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের হেফাজত থেকে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে দণ্ডিত আসামী মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ডঃ কে. এন. কাটজু। তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন শ্রী ডি. স্যান্যাল।

দণ্ডিত আসামীর পক্ষে ডঃ কে. এন. কাটজু প্রথমেই একটি আইনগত প্রশ্ন তুলেছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে। তিনি বললেন—মামলায় বর্ণিত ষড়যন্ত্রটি যে কানপুরেই হয়েছিল তার কোন উপযুক্ত প্রমাণ সরকারপক্ষ দিতে পারেননি। সেই কারণে কানপুরের দায়রা আদালতের এই ষড়যন্ত্র মামলাটি বিচারের কোন এক্তিয়ার ছিল না। মামলাটির বিচার হয়েছে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে।

হাইকোর্ট ডঃ কাটজুর এই বক্তব্য মেনে নিতে পারলেন না। বক্তব্য না মানার কারণ হিসেবে হাইকোর্ট মামলায় দাখিল করা কয়েকটি চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা মহম্মদ সৌকত উসমানির একটি চিঠির উল্লেখ করা হয় এই প্রসঙ্গে। চিঠিটির মাথায় লেখা ছিল ''কানপুর''। তারিখ দেওয়া ছিল ১৯শে মে, ১৯২৩। সৌকতের লেখা অপর একটি চিঠিতেও 'কানপুর' কথাটি লেখা ছিল চিঠির মাথায়। এই চিঠিটিতে তারিখ লেখা ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২৩। সৌকত উসমানিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৯শে মে ১৯২৩ সালে। ১৯শে মে, লেখা চিঠিটিও পুলিশের হাতে আসে ঐ তারিখেই। শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিজ হাতে লেখা অপর একটি চিঠি থেকে জানা যায় তিনি ইউরোপ থেকে কানপুরের নির্দিষ্ট ঠিকানায় সৌকত উসমানিকে ২৫ পাউন্ড অর্থ পাঠিয়েছিলেন যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করার জন্য। উসমানিও একাধিক চিঠি লিখেছিলেন শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়কে কানপুর থেকে। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকেও বোঝা যায় কানপুর ছিল বিপ্লবী কমিউনিস্টদের একটি প্রধান আখড়া। সুতরাং ষড়যন্ত্রের একটি কেন্দ্রস্থল যে কানপুর সেই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। স্বভাবতই আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে আইনগত প্রশ্নটি আদালতের কাছে গ্রাহ্য হল না। তাছাড়া একই মামলার অন্যান্য আসামীর বিচার পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল কানপুরের দায়রা আদালতে। বিচারে সব আসামীর শাস্তি হয়েছিল কানপুর দায়রা আদালতের আদেশে। পরবর্তীকালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সেই আদেশ বহাল রেখেছিলেন। সুতরাং ষড়যন্ত্র মামলাটিতে নতুন করে আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না।

ডঃ কাটজুর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল—মানবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন সঠিক হয়নি। কারণ চার্জে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের কোন নামের উল্লেখ করা হয়নি। কার কার সাথে মানবেন্দ্রনাথ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তার কোন উল্লেখ না থাকায় সামগ্রিকভাবে দায়রা বিচারটি বাতিল করা উচিত বলে সওয়াল করা হ'ল। ডঃ কাটজুর এই বক্তব্যের সাথেও হাইকোর্ট একমত হতে পারলেন না। উসমানি, ডাঙ্গে এবং মুজাফ্ফর আহমেদের কাছে

ইউরোপ থেকে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় একাধিক চিঠি লিখেছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে। ডাঙ্গের কাছে ইংরেজিতে চিঠি লিখতেন বোম্বের ঠিকানায়। উসমানির কাছে কানপুরে এবং মুজাফ্‌ফর আহমেদের কাছে কলকাতায়। মুজাফ্‌ফর আহমেদের কাছে লেখা অনেকগুলি চিঠি ছিল বাংলায় লেখা। এই চিঠিগুলিতে নানা নির্দেশ থাকত। ভারতে কীভাবে কমিউনিস্ট সংগঠন জোরদার করতে হবে, কীভাবে কর্মসূচি নিতে হবে, বিপ্লবী কাজকর্ম কীভাবে চালাতে হবে, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কীভাবে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, এই সব ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ ও মতামত দেওয়া ছিল আদালতের কাছে পেশ করা চিঠিগুলিতে। এ ছাড়াও তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে জানিয়ে দিতেন ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারার অভিযোগটি প্রমাণ করার জন্য ৪টি বিষয়ের উপর নির্ভর করা হয়েছিল।

প্রথমত, শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিজ হাতে লেখা চিঠিপত্র।

দ্বিতীয়ত, শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা একাধিক নেতার চিঠিপত্র।

তৃতীয়ত, শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা বেশ কয়েকটি বই, কিছু পত্র-পত্রিকা এবং একাধিক ইস্তাহার। এই বইগুলির মধ্যে ছিল (১) One Year of Non-Cooperation. এই বইটির লেখক ছিলেন শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীমতী ইভলিন রায়; (২) India in Transition (৩) 'What do we want', (৪) India's Problem and its Solution.

চতুর্থত, অন্যান্য সাক্ষ্য-সাবুদ।

পেশ করা পুস্তক-পুস্তিকা, চিঠিপত্র এবং একাধিক ইস্তাহার থেকে আদালত নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় কানপুর ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন।

দায়রা আদালতে বিচারের সময় দাখিল করা হয়েছিল শ্রীশ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেকে লেখা একটি চিঠি। চিঠিটি ছিল একটি নোট পেপারের উপর লেখা। চিঠির মাথায় লেখা ছিল "Not the Masses for Revolution—But Revolution for the Masses."

এ ছাড়াও জানা যায় বিপ্লবী পত্রিকা 'ভ্যানগার্ড' প্রকাশিত হ'ত ইউরোপ থেকে। শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় যুক্ত ছিলেন এই 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার সাথে। মানবেন্দ্রনাথের লেখা "India in Transition" বইটি প্রকাশিত হয়েছিল জেনেভা থেকে ১৯২২ সালে।

ডাঙ্গের কাছে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় ১৯২২ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সভায় মানবেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মস্কো সম্মেলনের সম্বন্ধে চিঠিতে লিখছেন—

"The Congress is well on the way. Delegates from almost all the Countries are here; even far off Java is not expected..... I am in charge of the Eastern Section of the Congress but there is no Indian delegates..... We are having numerous preliminary conference on the Eastern question which is one of the principal points of the Agenda. It is only here that one can get a true prespective not only on the working class movement in the West, but also on the revolutionary movement in the Eastern subject countries. It is too bad that our movement, which is the most powerful of the Colonial National Movements, should remain so isolated.....We were

all very glad to know of the forming a new party to assume the leadership of the Indian movement has been much discussed here....I take it for granted that the Socialist Labour Party of India understands the necessity of International is the only Revolutionary International body. Therefore I am sure the you will like to know the attitude of the Communist International towards the Indian movement at the present stage. In consonance with the point of view of the Communist International, I make the following proposition about the role the Socialist Labour Party of India should play....All Communists and Socialists should attempt to form a mass party embracing all the truly revolutionary element in order that many available revolutionary elements are not frightened away by the name, our Party should have a "non-offensive" name. We suggest "the People Party" of course the social basis of this party will be the workers and peasants and the political direction of the party should be in the hand of the Communists and Socialists who alone can be the custodians of the interest of toiling masses."

এইভাবে মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিরূপণ করে নির্দেশ দিতেন ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে। কিভাবে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে হবে তারও ছক করে পাঠিয়ে দিতেন ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে।

বার্লিন থেকে মানবেন্দ্রনাথ ভারতের তিন কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু, ডাঙ্গে এবং মুজাফ্‌ফর আহমেদকে একটি চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

"We must prepare for the conference which is very impotant. Your presence will be greatly appreciated. The delegates should reach here not later than the end of January."

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা অপর একটি চিঠি থেকে জানা যায় তিনি মস্কো সম্মেলনে প্রিসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

The infamous methods by which British Imperialism sucks the life blood of the Indian people are well known. They cannot be condemned too strongly nor will simple condemnation be of any practical value. British rule in India was established by force and is maintained by force; therefore it can and will be overthrown only by violent-revolution........

The people of India must adopt violent means without which the foreign domination based upon violences cannot be ended. The people of India are engaged in this great revolutionary struggle. The Communist International is whole-heartedly with them."

এই চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন হিংসার বদলে হিংসার

নীতিতে। ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হটাতে গড়ে তুলতে হবে জঙ্গী বিপ্লব এই ছিল তাঁর মনোভাব।

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা চিঠি প্রমাণ করে তিনি ইউরোপে থাকলেও কানপুর ষড়যন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার নথিটি নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে এই স্মরণীয় নথিটিকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা উচিত।

পত্রিকায় নিবন্ধ ছেপে রাজরোষে

১৯৩৮ সাল। ভারতে ব্রিটিশ রাজ। বহু যুবক-যুবতীকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায়। একদিকে চলছিল বিপ্লবী দলগুলির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি, অন্যদিকে চলছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনকে নানাভাবে সমর্থন করায় বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকাকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল।
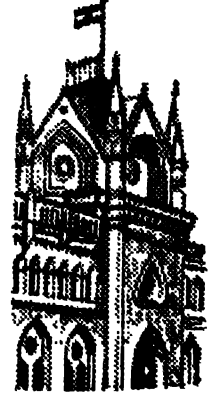
স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের প্রতি ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের অগ্নিরোষ ও নানা অন্যায় অবিচার নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করায় একাধিক সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। আদালতের বিচারে অনেককেই দণ্ডপ্রাপ্ত হতে হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ২রা মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল একটি বিশেষ নিবন্ধ। নিবন্ধটির শীর্ষক ছিল "মেদিনীপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা। শ্রীসুভাষ বোসের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন।" নিবন্ধটিতে বলা হয়েছিল—১৯৩৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা তাদের জেল থেকে মুক্তির দাবি জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের লিখিত চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। মেদিনীপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা ভয়াবহ। জেলের জনৈক জমাদার এবং কয়েকজন কারারক্ষী রাজনৈতিক বন্দীদের লাঠিপেটা করা হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করেছে। কারারক্ষীসহ বিশেষ জমাদারটি রাজনৈতিক বন্দীদের উদ্দেশ করে বলেছে ঢাকায় রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর যা করা হয়েছে তাদের ওপরও সেই ঘটনাই ঘটবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সময় একটা গুজব রটেছিল—ঢাকা জেলের বন্দীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পরে খবরটি ভিত্তিহীন বলে জানা গিয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ৯ই মার্চ আনন্দবাজারে আবার প্রকাশ করা হল মেদিনীপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে ২রা মার্চের খবরটি সঠিক নয়। প্রেসের মাধ্যমে এই খবর জানা গিয়েছে বলে প্রকাশিত।

১৯৩৮ সালের ২রা মার্চের প্রকাশিত শীর্ষক "মেদিনীপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা। শ্রীসুভাষ বোসের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন।" ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছিল—"Condition of Political Prisoners in Midnapore jail. Petition for interview with Mr. Subhas Bose."

এই শীর্ষক ও নিবন্ধটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে একটি ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত করা

হ'ল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায়। সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হ'ল অভিযুক্ত আসামী তাঁর পত্রিকায় উপরোক্ত প্ররোচনামূলক নিবন্ধটি ছেপে সাধারণ মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। উদ্দেশ্য সরকারের প্রতি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিরাগের মনোভাব সৃষ্টি করা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায় অভিযোগের বিচার হ'ল কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। বিচারে সত্যেন্দ্রনাথ দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কারাদণ্ড ও জরিমানার আদেশ হ'ল।

এই আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছিল দণ্ডিত আসামী সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটির শুনানি হয়েছিল বিচারপতি বার্টলে ও বিচারপতি হেনডারসনের ডিভিসন বেঞ্চে।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ২রা মার্চের নিবন্ধটি ছেপে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সরকারকে হেয় করেননি। নিবন্ধটি কোনমতেই প্ররোচনামূলক বা উত্তেজক নয়। প্রকাশিত লেখাটির মধ্যে সরকারের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের বিরাগ সৃষ্টির কোন প্রশ্নই আসে না। সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা জন্মানোও নিবন্ধটি উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া প্রেসের মাধ্যমে খবর পেয়ে ৯ই মার্চ আনন্দবাজারেই ২রা মার্চের খবরটি সঠিক নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং ২রা মার্চের ছাপানো নিবন্ধটির পিছনে অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য ছিল না পত্রিকার সম্পাদকের।

কলকাতা হাইকোর্ট প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া দণ্ডাদেশ খারিজ করে দিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলার রায়টি হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ১লা ডিসেম্বর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পক্ষে তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত আইনজীবীরা সওয়াল করেছিলেন হাইকোর্টে। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী এন. কে. বাসু, শ্রী এস. সি. তালুকদার প্রভৃতি আইনজীবী।

জরিমানার টাকা আগেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জমা পড়ে যাওয়ায় হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন, যদি নিবন্ধটি সরকারকে আহতও করে থাকে তার জন্য জরিমানা জমা দেওয়াই যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু যুবক-যুবতী যেমন দেশের কাজে আত্মত্যাগ করেছিলেন, তেমন বহু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকও ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের রক্ত-চক্ষুকে ভয় না করে মুক্তিসংগ্রামীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন আন্দোলনের সাথে যুক্ত বহু নিবন্ধ। এইসব পত্র-পত্রিকার তখনকার ভূমিকা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ হবে না।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ৩১ জন বিপ্লবীর বিচার হয়েছিল একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। স্পেশাল ট্রাইবুনালটি গঠন করা হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৩১শে অক্টোবরের সরকারী আদেশ অনুযায়ী। স্পেশাল ট্রাইবুনালে ছিলেন তিনজন বিচারক (কমিশনার)। এই তিনজন কমিশনার ছিলেন মিঃ এইচ. জি. এস. বিভার, আই-সি-এস শ্রী কে. সি. দাশগুপ্ত, আই সি-এস, এবং রায় বাহাদুর এন. সি. বোস। মিঃ বিভার এবং শ্রী কে. সি. দাশগুপ্ত ছিলেন সেই সময় জেলা ও দায়রা বিচারকের পদে। রায় বাহাদুর এন. সি বোস ছিলেন বাঁকুড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। এই তিনজন কমিশনারদের মধ্যে মিঃ বিভারকে করা হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালের সভাপতি।

ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছিল অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে। ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগে বলা হয়েছিল অভিযুক্ত আসামীরা সকলেই বিপ্লবী দলের সদস্য। এঁরা ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। এইসব বিপ্লবীরা টিটাগড় ও অন্যান্য বহু জায়গায় মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে অভিযুক্ত বিপ্লবীরা হিংসার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

টিটাগড়ের গোয়ালপাড়ায় বিপ্লবী দলের একটি প্রধান আখড়া ছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ছিল বিপ্লবীদের ডেরা। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ থেকে দেখা যায় অভিযুক্ত আসামীরা সকলেই টিটাগড় থানার অন্তর্গত গোয়ালপাড়ায় তাদের বিপ্লবী আখড়ায় মিলিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেম। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন। টিটাগড় মামলায় ষড়যন্ত্রের সময়সীমা ছিল ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত। স্পেশাল ট্রাইবুনালে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ পত্রটি দায়ের করেছিলেন ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট রায়সাহেব কান্তিচন্দ্র মুখার্জী। এই অভিযোগপত্রটিকে ভিত্তি করে ষড়যন্ত্র মামলাটির বিচার শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি। অভিযুক্ত সব আসামীর বিরুদ্ধেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছিল। ৩১ জন অভিযুক্ত আসামীর মধ্যে ২ জন রাজসাক্ষী হওয়ায় ২৯ জনের বিচার হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালে। অভিযুক্ত আসামী শ্রীশ্যামবিনোদ পাল-চৌধুরীর বিরুদ্ধে অপর আরো দুটি চার্জ গঠন করা হয়েছিল ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯(এফ্) এবং ১৯(এ) ধারায়। শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরীর ছিল একাধিক ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামগুলি ছিল 'সুরেশ', 'প্রনাদকুমার রায়', 'রমেশ মজুমদার', 'সতীশ বোস', 'প্রণব' প্রভৃতি।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার মূল বিচার শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মাননীয় পাবলিক প্রোসিকিউটর একটি আবেদন পেশ করেছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে। আবেদনটিতে প্রার্থনা ছিল অভিযুক্ত আসামী শ্রীসন্তোষকুমার সেন ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পালকে যেন আদালত ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কারণ অভিযুক্ত আসামীদ্বয় রাজসাক্ষী হিসেবে ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্পেশাল ট্রাইবুনাল ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী সরকার পক্ষের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। শ্রীসন্তোষকুমার সেন ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল মামলায় রাজসাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় এদের দুজনকেই সাক্ষীর তালিকায় রাখায় বাকি ২৯জন অভিযুক্ত বিপ্লবীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল।

মামলার শুরুতে ফরিয়াদী পক্ষ থেকে বলা হ'ল অভিযুক্ত আসামীরা আরো অন্যান্যদের সাথে মিলে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছিলেন অভিযুক্ত বাংলার ১৫টি জেলায় এবং বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

মামলার তদন্ত, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথিপত্র থেকে জানা গেল অভিযুক্ত আসামী শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরীর হেফাজাত থেকে পাওয়া গিয়েছিল গুলি ভর্তি একটি পিস্তল। টিটাগড়ের বিপ্লবীদের আখড়াটি থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ। উদ্ধার করা বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে ছিল সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, মেটা নাইট্রানিলিন, অ্যাবসলুট অ্যালকোহোল, মার্কারি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম নাইট্রেট, চারকোল। এই সব বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বিপ্লবীরা বোমা বাঁধতেন।

টিটাগড়ের বিপ্লবীদের প্রধান আখড়াটিতে এক সময় রাখা হয়েছিল দলের মহিলা সদস্য পারুল মুখার্জীকে। পারুল দেবীর ছদ্মনাম ছিল 'নীহার', 'শান্তি', 'আরতি', 'শোভারানী বোস', 'রানী', 'খুকি' এ 'সুরমাদেবী'। টিটাগড়ের এই বিপ্লবীদের আখড়াটিতে কাজকর্ম পরিচালিত হত শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ওরফে বুড়োদা, শ্রীশ্যাম বিনোদ পালচৌধুরী ও শ্রীমতি পারুল মুখার্জীর নেতৃত্বে। পারুলদেবী বিপ্লবী কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন।

নানা বিস্ফোরক দ্রব্য টিটাগড়ের গোয়ালপাড়ার বাড়ী থেকে পাওয়া যাওয়ায় শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরী এবং শ্রীমতি পারুল মুখার্জীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৫, ৫(এ) এবং ৫(বি) ধারায়ও এই মামলার চার্জ গঠন করা হয়েছিল।

টিটাগড়ের বিপ্লবী আখড়াটি থেকে পুলিশ বিস্ফোরক দ্রব্য ছাড়াও পেয়েছিল একাধিক সন্দেহজনক বইপত্র। বইগুলির মধ্যে ছিল—(১) Infantry Training (২) Field Gunnery (৩) Machine Gunners Hand Book (৪) War Equipment এবং (৫) Aeroplane Construction

মামলার একজন অভিযুক্ত আসামী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘটক গ্রেপ্তারবরণ করার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে পুলিশ জানতে পেরেছিল বিপ্লবী দলের নানা ষড়যন্ত্রের কথা। পরে অবশ্য জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজ বক্তব্য ট্রাইবুনালের কাছে পেশ করার সময় পূর্বে দেওয়া তাঁর স্বীকারোক্তিটি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। পুলিশের অত্যাচারে তিনি মিথ্যা ঘটনা দিয়ে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। পুলিশের শেখানো মত তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলতে বাধ্য করা হয়েছিল।

মামলার নথি থেকে দেখা যায় স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে অভিযুক্ত আসামীরা নিজ

নিজ বক্তব্য রেখেছিলেন ১৯৩৬ সালের ৫ই, ৭ই, ৮ই এবং ৯ই ডিসেম্বর। প্রত্যেক অভিযুক্তই তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

ষড়যন্ত্র মামলাটিতে সরকার পক্ষ থেকে ৫০২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা শেষ করেছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনাল।

অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষে কোন সাক্ষী মানা হয়নি। স্পেশাল ট্রাইবুনালের সব সাক্ষীদের সাক্ষ্য হওয়ার পর এবং অভিযুক্ত আসামীদের বক্তব্য নথিভুক্ত করার পর সরকারপক্ষের সওয়াল শুরু হয়েছিল। এই সওয়াল চলেছিল ১৯৩৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এরপর আসামী পক্ষের সওয়াল চলেছিল ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ অবধি। ১৯৩৭ সালের ২৭শে এপ্রিল তিনজন কমিশনার একমত হয়ে ঐতিহাসিক মামলাটিতে রায় দান করেছিলেন।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল বিচার-বিবেচনার পর ২৯ জন অভিযুক্ত আসামীর মধ্যে ১৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দন্ডবিধির ১২১(এ) ধারায় দন্ড বিধান করেছিলেন। এই ১৭ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও শ্রীপূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত ও শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল বিস্ফোরক পদার্থ আইনে। শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরী ভারতীয় অস্ত্র আইনেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। অবশ্য শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্রীশ্যামবিনোদ পালচৌধুরীকে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে বা ভারতীয় অস্ত্র আইনে আলাদা করে কোন দণ্ড বিধান করা হয়নি।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ জন দণ্ডিত আসামী স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন। আপিল শুনানির আগেই দণ্ডিত আসামী শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুন্সীর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর আগে জেলে বন্দী অবস্থায় হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলেন। বেশ কয়েকদিন অনশন করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

হাইকোর্টে আপিল শুনানি শুরু হতেই ৬ জন দণ্ডিত আসামীর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি আইনগত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এই ৬ জন দন্ডিত আসামী ছিলেন শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীনিরঞ্জন ঘোষাল, শ্রীসীতানাথ দে, শ্রীঅজিত মজুমদার, শ্রীজীবন ধুপি এবং শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য। এই ৬ জন আসামী একই ধরনের অভিযোগে পূর্বে আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীসীতানাথ দে এবং শ্রীনিরঞ্জন ঘোষালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারার অভিযোগটি প্রমাণ হওয়ায় সকলেই দন্ডিত হয়েছিলেন। এই কারণে হাইকোর্টের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল এই ৬ জন আসামীকে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যখন একবার অভিযুক্ত করা হয়েছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নতুন করে উঠতে পারে না। সুতরাং টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) ধারার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আইনত টিকতে পারে না। এই আইনগত প্রশ্নটি স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছেও রাখা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবুনাল বলেছিলেন—

"This is the Prosecution Case appears from the evidence of the approver, Santosh, where he speaks of the activities of Pravat Chakrabarty and Jogesh Mazumder at Barisal and also from the interpretation the Prosecution wants

to put on the mention of the names of Satya, Biren Bose and Jagadish Chakrabarty in the Cipher lists, Exs. 1175 and 1176 found in Pravat's possession. The Inter-Provincial Conspiracy Case was with regard to this Conspiracy formed by pravat Chakrabarty with Purnananda Das Gupta, Niranjan Ghosal and Sitanath Dey and others."

রায়ের অপর আর এক জায়গায় বলা হয়েছিল—

"The whole argument put forward by the defence counsel appears to be based on the assumption that if a man has once agreed with another to do an unlawful act, that aggreement is for all time to come; and we cannot consider that if after having agreed for a certain time to do thing, he is removed from the scene of action, thereafter he can agree afresh with the same men or other men to do the same unlawful act. This assumption is in our judgement, entirely fallacious."

কলকাতা হাইকোর্ট এই আইনগত প্রশ্নে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সাথে একমত হওয়ায় আসামী পক্ষের তোলা প্রশ্নটি টিকল না।

এই ব্যাপারে হাইকোর্টও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীসীতানাথ দে এবং নিরঞ্জন ঘোষালের আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ড হলেও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার ষড়যন্ত্রের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

হাইকোর্ট শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘটকের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে বললেন তাঁর স্বীকারোক্তি ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। তাঁর উপর পুলিশি অত্যাচারের গল্পটি পরে বানানো হয়েছে। হাইকোর্ট সব দিক বিচার-বিবেচনা করে শেষ সিদ্ধান্তে এসে আপিলের রায়ে বলেছিলেন—

"No doubt the house of Titagarh was the general head quarters of the conspiracy. Whether of not Purnananda lived there for the whole time or whether or not Shyam Benode was there all the time makes no difference as they undoubtedly used it as the heart and centre of the conpiracy during the time it was occupied by Parul."

নানা যুক্তিতর্কের আলোচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের আপিল খারিজ করে দিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের ৯ই মে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ই বহাল থাকল।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হয়েছিল তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত একটি ফুল বেঞ্চে। মাননীয় বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন কস্টেলো, জ্যাক এবং এম. সি. ঘোষ।

যুগান্তরের দায়ে 'সাধনা প্রেস' বাজেয়াপ্ত

১৯০৭ সাল। দেশে ইংরেজ শাসন। সাধারণ মানুষ বিদেশী শাসকের অত্যাচারে জর্জরিত। এই অবস্থায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বহু তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী। এই সময় বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে একাধিক নিবন্ধ ছেপেছিলেন। স্বভাবতই এই সব পত্র-পত্রিকাকে তদানীন্তন সরকারের অগ্নিরোষে পড়তে হয়েছিল। এমন কি পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিবন্ধ ছাপায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল।

১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদনায় যুগান্তর পত্রিকায় একটি উত্তেজক নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। নিবন্ধটি প্রকাশের তারিখ ছিল ১৬ই জুন, ১৯০৭। ১৬ই জুনের উত্তেজক নিবন্ধটির জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায়। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। কারাদণ্ডের আদেশটি দেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ সালের ২৪ শে জুলাই।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শুধু মাত্র শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেই শাস্তির আদেশ দিয়ে থামলেন না। কলকাতার সাধনা প্রেসটিকেও বাজেয়াপ্ত করার আদেশও দিয়েছিলেন। কারণ ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগে বলা হয়েছিল ১৬ই জুনের যুগান্তর ছাপা হয়েছিল কলকাতার 'সাধনা প্রেস' থেকে।

সাধনা প্রেসের মালিক ছিলেন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সাধনা প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়ায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকে একটি লিখিত আবেদন পেশ করা হয়েছিল চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। আদালতের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছিল ১৬ই জুনের প্রেস বাজেয়াপ্তর আদেশটি তুলে নিয়ে আদালত যেন সাধনা প্রেসটিকে তার মালিককে ফেরত দেওয়ার আদেশ দান করেন।

আবেদনপত্রে কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, ১৬ই জুনের যুগান্তর সাধনা প্রেস্ থেকে মোটেই ছাপা হয়নি। তাছাড়া প্রেসের মালিককে নোটিশ না দিয়ে প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ আইনগ্রাহ্য নয়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রার্থনা খারিজ করে দিয়েছিলেন চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। হাইকোর্টে অবিনাশচন্দ্রের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হ'ল 'সাধনা প্রেসটি কে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ আইন মোতাবেক হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হ'ল

প্রেসের মালিককে কোন নোটিশ না দিয়ে মালিকের অবর্তমানে বাজেয়াপ্তর আদেশটি সম্পূর্ণ বে-আইনি।

কলকাতা হাইকোর্টে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মামলার শুনানি হয়েছিল একটি ডিভিশন বেঞ্চে। হাইকোর্টে 'সাধনা প্রেসের' মালিকের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রী এ. চৌধুরী। সরকার পক্ষে ছিলেন স্ট্যানডিং কাউন্সেল মিঃ গ্রেগরী।

হাইকোর্টে মামলাটির শুনানীর সময় বিচারপতিদের কিছু প্রশ্ন এবং দু পক্ষের আইনজীবীদের উত্তর তুলে ধরা হচ্ছে—

মিঃ গ্রেগরী ঃ—মি লর্ড! ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫১৭ ধারায় ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আদালতকে। সেই ক্ষমতা বলে নিম্ন আদালত প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করেছেন। প্রেসটিকে উত্তেজক ও রাজদ্রোহিতামূলক নিবন্ধ ছাপার কাজে লাগানো হয়েছিল।

বিচারপতি ফ্লেচার ঃ—তাহলে'ত যে পেপার মিল প্রেসটিকে ছাপার কাগজ জোগান দিয়েছিল, সেই মিলটিকেও বাজেয়াপ্ত করতে হয়। মিঃ গ্রেগরী, এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

মিঃ গ্রেগরী ঃ—মি লর্ড! আমি মোটেই সেই কথা ভাবছি না। আমি বলছি না—যে বাড়ীটিতে ষড়যন্ত্র হবে, সেই বাড়ীটিকেও বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আমার বক্তব্য 'সাধনা প্রেস' থেকেই ১৬ই জুনের যুগান্তর ছাপা হয়েছিল। সেই কারণেই ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেস বাজেয়াপ্তর আদেশ যুক্তিসঙ্গত।

বিচারপতি মিত্র ঃ—প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করার আগে কি প্রেসের মালিককে নোটিশ করা হয়েছিল?

মিঃ গ্রেগরী ঃ—নোটিশ দিয়ে মালিককে জানাতেই হবে, এমন কোন বিধান নেই।

বিচারপতি মিত্র ঃ—প্রেসের মালিকের অজ্ঞাতে ও বিনা নোটিশে তাঁর প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করা যায় কি?

মিঃ গ্রেগরী ঃ—নোটিশ দেওয়ার ব্যাপারে নিম্ন আদালতের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

বিচারপতি ফ্লেচার ঃ—এমন নজির আছে যে নৌকা করে চুরির মাল পাচার করা হয়েছে সেই নৌকাটিকে কিন্তু বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। (জাবিব গাজী বনাম সরকার মামলার নজিরটির কথা উল্লেখ করা হল।)

তাছাড়া দেখা গেল ১৯০৭ সালের ১৬ই জুনের যুগান্তর পত্রিকা সাধনা প্রেস থেকে ছাপা হয়নি।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পক্ষে আইনগত প্রশ্নগুলির যুক্তিগ্রাহ্যতা মেনে নিয়ে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া ২৪শে জুলাইয়ের প্রেস্ বাজেয়াপ্তর আদেশ বাতিল করে দিয়েছিলেন। সাধনা প্রেসটিকে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটির রায় হয়েছিল ১৯০৭ সালের ৬ই আগস্ট। তখন কলকাতা হাইকোর্টের নাম ছিল "হাইকোর্ট অফ্ জুডিকেচার অ্যাট্ ক্যালকাটা।"

হাইকোর্ট মামলাটির উপসংহারে বলেছিলেন—"We are also of opinion that the press could not be said to have been used for the commission of offence in the same way as a Gun, Sword or a Dagger. The offence was publication and not printing and the press is a remote instrument."

সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে মুচলেকার আদেশ

পরাধীন ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন ছিলেন একজন প্রথম সারির নেতা। তিনি তাঁর অনুগামী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একাধিক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে তাঁর স্বেচ্ছাসেবকরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আওয়াজ তুলেছিলেন—"করেঙ্গে কি মরেঙ্গে"। বিভিন্ন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনকে কারাবরণ করতে হয়েছিল একাধিকবার।

১৯৩০ সাল। এই সময় দেশের শান্তি রক্ষার্থে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিয়ে বলেছিলেন—শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর বিশেষ অনুগামী কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক যেন নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য আদালতের কাছে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকার করে মুচলেকা প্রদান করেন। এই অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, শ্রী শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য, শ্রীফণীভূষণ ব্যানার্জী ওরফে নিতাই, শ্রীবটকৃষ্ণ মিশ্র প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবকরা। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন বরিশালের মানুষের কাছে 'সতীন সেন' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন 'তারু' বলে পরিচিত।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর অনুগামী স্বেচ্ছাসেবকরা যাদের বিরুদ্ধে মুচলেকা প্রদানের আদেশ হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য মামলাটি উঠেছিল ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সতীন সেনও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের একাধিক কার্যকলাপ বিচার-বিবেচনা করে মুচলেকা প্রদানের সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সিদ্ধান্ত ছিল শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর অনুগামী ভলানটাররা দেশের শান্তি বিঘ্নিত করছেন নানা উস্কানিমূলক ও সরকার বিরোধী কাজের মাধ্যমে। তাই শান্তি রক্ষার্থে তাদের মুচলেকা প্রদান করা আবশ্যক। কারণ ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১১০ ধারার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নথি থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বললেন—দেখা যাচ্ছে ১৯২৮ সালের মার্চ পটুয়াখালিতে মস্‌জিদের পাশ দিয়ে একটি হিন্দু মিছিল নিয়ে যাওয়া উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধেছিল। এই হিন্দু মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন সতীন সেন। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সতীন সেন ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১১০ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত

হিন্দুদের মিছিলটিকে মস্‌জিদের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে আপস মীমাংসার চুক্তির ভিত্তিতে।

এই ব্যাপারে আপিলকারীদের পক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যখন মিছিল নিয়ে বিবাদের আপস মীমাংসা হয়ে গিয়েছে এবং আপসের ভিত্তিতে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে, সেই কারণে পূর্বোক্ত কোন ঘটনা নতুন করে তুলে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে মুচলেকা প্রদান করার আদেশ আইনত গ্রাহ্য হতে পারে না। পূর্বের মিটে যাওয়া ঘটনা আদালতের বিবেচনার বাইরে রাখা উচিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট বললেন, মামলার নথি থেকে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের মিছিলটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের বিবাদ আপসে মীমাংসা হলেও সতীন সেন এবং তাঁর অনুগামী স্বেচ্ছাসেবকরা আবার নানা ধরনের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড চৌকিদারী ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়ায় সতীন সেন ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিবাদ করেছিলেন এই ট্যাক্স বাড়ানোর বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের উস্কানি দেওয়া হয়েছিল তারা যেন চৌকিদারী ট্যাক্স জমা না দেন, সতীন সেনের প্ররোচনায় গ্রামবাসীরা ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায় ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামবাসীদের উপর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে পড়ে। ট্যাক্স আদায় করতে না পারায় গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ী নিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষে, গ্রামবাসীরা এই ব্যাপারে বিব্রত বোধ করায় সতীন সেন ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামবাসীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথমেই দেওলি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও ট্যাক্স কালেক্টরের বাড়ী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন সতীন সেনের নেতৃত্বে তাঁর ভলানটাররা এই কাজ করেছেন। সতীন সেনের নেতৃত্বে সুরাজমানি, লাউকাঠি, শ্রীরামপুর এবং মোরাডিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

সতীন সেনের প্রতিরোধে যখন ইউনিয়ন বোর্ডগুলি চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করতে পারছিল না, তখন মহকুমা শাসক একদল পুলিশ নিয়ে লাউকাঠিতে এসে ছিলেন ট্যাক্স আদায়ে সাহায্য করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সতীন সেনের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে মারধর খেয়ে পুলিশকে লাউকাঠি থেকে চলে যেতে হয়েছিল। সতীন সেনের ভয়ে মহকুমা শাসকও আর বেশি দূর এগোননি।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধেও সতীন সেনের ভলানটাররা প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

১৯২৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী বরিশালে সরকারী আঁনুকূল্যে একটি কৃষি প্রর্দশনীর উদ্বোধন হয়েছিল। সতীন সেনের দল এই কৃষি প্রদর্শনীটিকে কৃষক স্বার্থবিরোধী বলে ঘোষণা করেছিলেন। ২৩শে জানুয়ারী অবশ্য সতীন সেন বরিশালে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবকরা কৃষি প্রদর্শনীর সামনে পিকেটিং করে দর্শকদের প্রদর্শনীস্থলে যেতে বাধা দিয়েছিলেন। যারা স্বেচ্ছাসেবকদের বাধা অমান্য করে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন তাদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে।

সতীন সেন বরিশালে পৌছেছিলেন ২৯শে জানুয়ারী, ১৯২৯ সাল। এই দিন বরিশালে পৌছে তিনি বরিশালের বার অ্যাসোসিয়েশনে একটি বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন—সরকারী আনুকূল্যে পরিচালিত কৃষি প্রদর্শনীটি সম্পূর্ণভাবে কৃষকদের স্বার্থবিরোধী একটি প্রদর্শনী।

সেইজন্যই এই প্রদর্শনীটিতে কোন দর্শকের যাওয়া উচিত নয়। কৃষকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যই এই কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন। পরের দিন অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী কৃষি প্রদর্শনীটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সতীন সেন প্রায় ২৫০/৩০০ লোক নিয়ে বরিশালের টাউন হলে একটি সভা করেছিলেন। সেই সভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কৃষি প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একটি মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে প্রদর্শনী স্থল পর্যন্ত।

সিদ্ধান্ত মত মিছিল বার করার পর মিছিল থেকে সতীন সেনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। গ্রেপ্তার করেছিলেন সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়। কৃষি প্রদর্শনীটি শেষ হওয়ার পর সতীন সেনকে পুলিশ ছেড়ে দেয়।

কৃষি প্রদর্শনীটি শেষ হওয়ার পর পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সতীন সেন একটি আবেগময় উত্তেজক বক্তৃতা দিলেন দেশের যুব সমাজের উদ্দেশে। তিনি বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ১লা ফেব্রুয়ারী। তিনি যুবকদের ডাক দিলেন দেশের কাজে যোগ দিতে। বললেন আমাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে—স্বরাজের দাবিতে আমরা কিছু করব, না হয় মরব। 'করেঙ্গে কি মরেঙ্গে', এই হবে আমাদের লক্ষ্য। স্বরাজের দাবিতে আমাদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের কর্মীদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে আইরিশ, তুর্কি এবং চাইনিজদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে। সতীন সেন তাঁর বক্তৃতায় আরো বললেন—তিনি চান নির্ভীক ও কঠোর মনের যুবক যাঁরা হবেন দেশের কাজে নিবেদিত প্রাণ—যাঁরা বরিশালের মাটি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন। এই ধরনের আবেগময় বক্তৃতা স্বভাবতই দেশের যুবশক্তিকে প্রভাবিত করে থাকবে। ভারতের তদানীন্তন সরকারের পুলিশ অফিসার সতীন সেনের এই আবেগময় বক্তৃতাটির সারমর্ম ডায়রিতে লিখে নিয়েছিলেন। কারণ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি ছিল সতীন সেনের উপর।

সতীন সেনের একান্ত অনুগামী ভলানটার ছিলেন রমেশচন্দ্র চ্যাটার্জী। পুলিশি তদন্ত থেকে প্রকাশ পেয়েছে রমেশচন্দ্র চাটার্জী ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টার জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের হত্যাকারী, এই সাব-ইন্সপেক্টরটি সতীন সেনকে কয়েকদিন আগে মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। সতীন সেনকে গ্রেপ্তারের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সাব-ইনস্পেক্টরটিকে হত্যা করা হয়। সাব-ইন্সপেক্টরকে হত্যা করার কিছু আগেই ঘটনাস্থলে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল শ্রীমন্ত এবং নিতাইকে। এরা দু-জনেই পায়চারি করছিলেন রমেশের সাথে। সাব-ইন্সপেক্টর জ্যোতিষচন্দ্র রায়কে খুন করা হয়েছিল ছোরার আঘাতে। সতীন সেনের ভলানটারদের ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, আগ্নেয়াস্ত্রে চালনার শিক্ষা দিতেন শ্রীবটকৃষ্ণ মিশ্র।

১৯২৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি একটি মারামারির মামলা হয়েছিল। এই মামলাটির তদন্তকালে ইন্সপেক্টর আলতাফুদ্দিন সতীন সেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা নিয়ে তাঁর মতামত। সতীন সেন নির্ভীকভাবে খোলা মনে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মতামত। তিনি ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—হিন্দুরা যদি মুসলমানদের হাতে মার খান, সেই ক্ষেত্রে কখনই আক্রান্ত হিন্দু ব্যক্তিটির ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করা উচিত নয়। তাঁর পছন্দ আক্রমণকারীদের হিন্দুরাই উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবেন। সতীন সেনের ধারণা ছিল এই সব ব্যাপারে নালিশ করা দুর্বলতার লক্ষণ।

মামলার নথি থেকে আরো একটি বিশেষ ঘটনার কথা জানা গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে। এক সময় বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান ও বার-

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার রুদ্র। হেমন্তবাবু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করায় সতীন সেন তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি হেমন্তবাবু কোন কথা বলেন তবে তাঁকে উচিত শিক্ষা পেতে হবে। এর কয়েকদিন পরে হেমন্তবাবু খুন হন। তাঁর হত্যাকারী হিসেবে সতীন সেনের দুজন স্বেচ্ছাসেবককে সন্দেহ করা হয়েছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক দুজন ঘটনার দু-তিন দিন আগে থেকে গুপ্তভাবে হেমন্তবাবুর গতিবিধি লক্ষ্য করেছিলেন বলে প্রকাশ পেয়েছিল।

কৃষি প্রদর্শনীটি শেষ হতেই সতীন সেন অপর আর একটি ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীরাজেশ্বর রায় চৌধুরী পটুয়াখালিতে জমিদারি ছিল। তিনি তাঁর জমিদারি দেখতে পটুয়াখালিতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর জমিদারি সেরেস্তার ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রজারা যেন কাবুলিয়াতনামায় সহি করে দেন। কাবুলিয়াতনামায় সহি সম্পাদন না করে দিলে প্রজাদের তাঁর জমিদারির থেকে উচ্ছেদ করা হবে। এই ব্যাপারে জমিদারের নির্দেশের প্রতিবাদ করে সতীন সেন তাঁর স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে গরীব প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রজাদের বারণ করেছিলেন কাবুলিয়াতনামায় সহি সম্পাদন করতে। জমিদার জোর জবরদস্তি করলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভয় দেখানো হয়েছিল। সতীন সেনের প্রতিবাদে পটুয়াখালির জমিদারকে সরে যেতে হয়েছিল।

অপর আর একটি ঘটনার কথাও জানা গেল। রামাশঙ্কর ভট্টাচার্য নামে একটি যুবক পিওনের চাকরি করতেন সরকারী শুল্ক অফিসে। রামাশঙ্কর যোগ দিয়েছিলেন সতীন সেনের দলে। রামাশঙ্করকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ অনেক গুপ্ত-পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন। এই সময় এম. আব্দুল হালিম চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মামলায় সতীন সেনের দলের কর্মীদের শাস্তির আদেশ দিয়েছিলেন। সতীন সেনের দলের যুবকদের রাগ ছিল আব্দুল হালিম চৌধুরীর উপর। জেলা থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বদলির আগেই তাঁর উপর বদলা নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সৈনিকরা। এই ব্যাপারে রামাশঙ্করের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল সতীন সেন, হীরালাল দাশগুপ্ত, ফণীলাল চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্রনাথ রায় শলাপরামর্শে বসেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আব্দুল হালিম চৌধুরীর উপর কিভাবে আঘাত হানতে হবে।

একদিন যখন আব্দুল হালিম চৌধুরী আদালতের কাজ মিটিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন সেই সময় বিনোদ কাঞ্জিলাল, রবীন্দ্রনাথ রায় ও দেবেন দত্ত রাস্তার পাশে একটি বাড়ীতে অপেক্ষা করছিলেন। আব্দুল হালিম চৌধুরী কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেবেন দত্ত পিছন থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মাথা লক্ষ্য করে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। লোকজন ঘটনাস্থলে এসে যাওয়ার আগেই আক্রমণকারীরা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে রামাশঙ্কর স্বীকার করেছিলেন দলনেতা সতীন সেন ছিলেন দেশের কাজে নিবেদিতপ্রাণ।

মহকুমা শাসক খাঁন সাহেব একটি মামলায় সাক্ষ্য দিতে উঠে স্বীকার করেছিলেন সতীন সেন সব সময় চেষ্টা করতেন হিন্দু-মুসলমানদের দ্বন্দ্ব আপসে মিটিয়ে ফেলার। এই ব্যাপারে সতীন সেন মহকুমা শাসকের কাছেও নাকি একাধিকবার এসেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাকে কখনই তিনি মেনে নেননি।

নিম্ন আদালতের নথি থেকে যে সব ঘটনার কথা জানা গিয়েছিল তার বেশীরভাগ ঘটনাই ঘটেছিল ১৯২৮ সালের জুলাই মাসের আগে।

কলকাতা হাইকোর্ট সব ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেছিলেন—

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, শ্রী শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য, শ্রীফণীভূষণ ব্যানার্জী, শ্রীবটকৃষ্ণ মিশ্র এবং দলনেতা শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও অন্যান্য কর্মীদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। অন্যান্য কর্মীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল অন্যান্য অভিযুক্তরা সবাই সতীন সেনের সত্যাগ্রহ আন্দোলনেব সাথে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাদের কাছ থেকেও মুচলেকা নেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

হাইকোর্ট সরকার পক্ষের এই যুক্তি মানলেন না। নিম্ন আদালতের মুচলেকা প্রদানের আদেশ কেবলমাত্র শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীফণীভূষণ ব্যানার্জী, শ্রী শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য এবং শ্রীবটকৃষ্ণ মিশ্রব ক্ষেত্রে বহাল থাকল। অন্যান্যরা মুক্তি পেয়ে গেলেন হাইকোর্টের আদেশে।

অবশ্য মুচলেকার অর্থের পরিমাণ ও সময়সীমার কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট।

সতীন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন এবং হীরালাল দাশগুপ্তকে বলা হয়েছিল তিন বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখার অঙ্গীকার করে মুচলেকা প্রদান করতে। মুচলেকার অর্থের পরিমাণ হবে ১০০০ টাকা। শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য, ফণীভূষণ ব্যানার্জী এবং বটকৃষ্ণ মিশ্রকে বলা হয়েছিল দুই বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখার অঙ্গীকারে মুচলেকা প্রদান করার। এদের ক্ষেত্রে মুচলেকার অর্থের পরিমাণ হবে ২৫০ টাকা।

আপিল মামলাটিতে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন ১৪ই জুলাই, ১৯৩০

উত্তেজক বক্তৃতার দায়ে মণিবেন লীলাধর

১৯৩২ সালে মে-ডে উপলক্ষে বক্তব্য রেখে বোম্বের শ্রমিক নেত্রী মণিবেন লীলাধর কারা রাজরোষে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার দাবীতে সেচ্চারিত হতে। তিনি বলেছিলেন—শ্রমিকের কণ্ঠে আওয়াজ উঠুক— সব শ্রমিক এক হও'। 'শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ'।

শ্রমিকদের উদ্দেশে মণিবেন বলেছিলেন—দেশের ধনিকশ্রেণী এবং সরকার উভয়ই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তবেই ভাঙা সম্ভব পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ নীতি অব্যাহত থাকে। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানকল্পে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়তে হলে প্রয়োজন শ্রমিক ঐক্য এবং মজবুত শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিকরাই পাবে তাদের সংগঠনের মাধ্যমে জঙ্গী আন্দোলন তৈরি করতে। শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে শ্রমিকেবা আঘাত হানতে পারে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে। নিজেদের স্বার্থে ধনিকশ্রেণী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করছে। শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দিচ্ছে অন্যায় ভাবে। যারা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা কায়েম করে রেখেছে, তাদেরকে কেবলমাত্র সংগঠিত শ্রমিক ঐক্যই জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে উড়িয়ে দিতে পারে।

তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো বললেন—শ্রমিকভাইদের মনে রাখতে হবে সরকার ও ধনী সম্প্রদায়ের কাছে আছে নানা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র, অথচ শ্রমিকের হাতে কোন অস্ত্র নেই। শ্রমিকের হাতে অস্ত্র না থাকলেও তাদের আছে শ্রমশক্তি। শ্রমিকের এই শ্রম শক্তি অস্ত্রের চেয়েও বেশী ধারালো ও শক্তিবান।

শ্রমিকভাইদের ভুললে চলবে না তাদের শ্রমের বিনিময়েই সব কিছু তৈরি হচ্ছে, মুনাফা লুঠছে ধনীরা, কিন্তু শ্রমিক নিজেরাই থাকছে অভুক্ত। শ্রমিক নেত্রী নিজেই প্রশ্ন রাখলেন—এই কি দেশের বিচার?

তিনি আরো বললেন—শ্রমিকের হাতে যুদ্ধাস্ত্র না থাকলেও তাদের হাতিয়ার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে থাকবে প্রতিবাদ, অবরোধ, সাধারণ হরতাল। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না যে বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলন বা কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন কোনটাই পারবে না 'শ্রমিকরাজ' প্রতিষ্ঠা করতে। 'শ্রমিকরাজ' কায়েম করতে গেলে শ্রমিকদের অনুসরণ করতে হবে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়ের পথ।

তিনি আরো বললেন—সরকার শ্রমশক্তিকে ভয় করে। সেই জন্যই শ্রমিক নেতাদের দীর্ঘদিনের জন্যে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। অথচ কংগ্রেস নেতৃত্বকে অল্পদিনের জন্য জেলে থাকতে হয়।

মণিবেন লীলাধর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন এই বলে—'শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ'। 'ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিপাত যাক্'।

শ্রমিক নেত্রী মণিবেন লীলাধর ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী। তিনি সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি নানা সমাজসেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টা শ্রী এম. এন. রায়ের নীতিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের মে-ডে উপলক্ষে এই ধরনের উত্তেজক বক্তৃতার জন্য তদানীন্তন সরকার শ্রীমতি মণিবেন লীলাধরকে অভিযুক্ত করে একটি ফৌজদারী মামলা এনেছিলেন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪(এ) এবং ১৫৩(এ) ধারায়। মামলায় মণিবেন লীলাধরকে বোম্বের চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট উভয় ধারাতেই দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মণিবেন লীলাধর আপিল দায়ের করেছিলেন বোম্বে হাইকোর্টে। বোম্বে হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হয়েছিল ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে আপিলটি শুনেছিলেন দুজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ।

সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল শ্রীমতী মণিবেনের এই ধরনের উত্তেজক বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ক্ষ্যাপানো। সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা। ধনীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মানো।

মণিবেনের পক্ষে হাইকোর্টে বক্তব্য রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সমাজের ধনীকশ্রেণী কখনই সরকারের অংশ হতে পারে না। 'ক্যাপিটালিস্ট' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'ধনী' 'মহাজন' অর্থে। 'ক্যাপিটালিস্ট' শব্দ ব্যবহার করে কোনমতেই সরকারের প্রতি সাধারণ শ্রমিকের বিরাগ সৃষ্টি করা হয়নি। মণিবেনের বক্তৃতায় কেবলমাত্র ধনীকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) ধারার ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে শ্রমিক নেত্রীর মে-ডে বক্তৃতার প্রথমাংশ সরকারের সাথে সম্বন্ধহীন ছিল। সুতারং মণিবেন লীলাধরকে কোনমতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। হাইকোর্টও মেনে নিয়েছিলেন এই ব্যাখ্যা।

হাইকোর্ট বলেছিলেন অর্থনীতির দিক থেকে বলা যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধন' ও 'শ্রম' সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ বহন করে। 'ক্যাপিটালিস্ট' ব্যবহার করা হয় তাদেরই ক্ষেত্রে যাদের প্রচুর পরিমাণ ধন দৌলত শিল্পে নিয়োজিত হয়। কতটা ধনরাশি শিল্পে নিয়োগ করলে একজনকে 'ক্যাপিটালিস্ট' বলা যাবে তার কোন ব্যাখ্যা আইনে পাওয়া যায় না। সেই কারণেই 'ক্যাপিটালিস্ট' শব্দ বক্তৃতায় ব্যবহার করে কোন বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরাগ বা ঘৃণা জন্মানোর প্রশ্ন আসে না।

আসামীপক্ষের আইনজীবীর সাথে একমত হয়ে হাইকোর্ট মণিবেন লীলাধরকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) ধারার অভিযোগ থেকে মুক্তির আদেশ দিলেও তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ (এ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তির আদেশ বহাল রাখলেন।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী মণিবেনের আইনজীবী হাইকোর্টের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর মক্কেল ভবিষ্যতে কখনও সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখবেন না।

হাইকোর্ট আইনজীবীর এই প্রার্থনা বিবেচনা করে মণিবেন লীলাধরকে সশ্রম কারাদণ্ডের বদলে মাত্র ৩০০ টাকা জরিমানা করে আপিল মামলার নিষ্পত্তি করলেন।

মাননীয় অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল হাইকোর্টে আপিলটি শুনানির সময় শ্রীমতী মণিবেনের বক্তৃতার ইংরেজী বয়ানের কিছু অংশ তুলে ধরেছিলেন। মণিবেন তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন—
"The Government and the Capitalists are Sucking the blood of Labourers. We should fight with these people. What is needed is that we should unite in order to fight against two enemies."

এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন—

The learned Advocate General greatly stressed the word "fight" and the word "enemies". But seems to us that too much ought-non to be made of metaphorical expression which are not to be taken literally. Is not the learned Advocate General himselt fighting every day for his clients in Court? We hear of doctors and nurses fighting for the lives of their patients, and we also hear of Legislators fighting on the floor of Parliament or of Legislative Councils against Bill Clause by Clause. In none of these cases does any one understand by the word "fight" a physical conflict. The "fight" in common parlance often means only opposition and contention, and the case of the word "enemies" is very similar. People who are competitors in trade speak of one another as enemies. People whose interests in certain matters are adverse may also do so. We are not; therefore, to take it, because the word "enemy" has been used, that the speaker necessarily intended to inculcate feelings of enemity."

বোম্বে হাইকোর্ট আপিলের রায় দিয়েছিলেন ১৯শে আগস্ট, ১৯৩২ সাল।

"বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা" নিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ

১৯১৩ সাল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুবশক্তির মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ক্রমশই দানা বেধে উঠছিল। দেশের মুক্তিমন্ত্রে একাধিক বিপ্লবী সংগঠন সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সময় অবিভক্ত বাংলাব গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন নিওনেল হেউইট কোলসন সাহেব।

১২ই মে ১৯১৩ সাল, কোলসন সাহেব রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিলেন বরিশালের শ্রীগিরীন্দ্রমোহন দাস ও আরো ৪৩ জন যুবকের বিরুদ্ধে। সেই সময় ববিশালে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নেলসন সাহেব। এই নেলসন সাহেবের আদালতেই পেশ করা হযেছিল মামলার অভিযোগপত্র। সঙ্গে ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করার প্রার্থনা। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগকারীর প্রার্থনা অনুযায়ী প্রাথমিক এজাহার গ্রহণ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারির আদেশ দিলেন। তদানীন্তনকালে এই মামলাটি "বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা" নামে পরিচিত ছিল। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এই মামলাটির কথা জানতে পেরে কলকাতায় অমৃতবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাদের দৈনিকে নিবন্ধ ছেপেছিলেন ১৯১৩ সালের ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৬ ও ৩০শে মে। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীমতিলাল ঘোষ। পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন শ্রীতারিণীকান্ত বিশ্বাস। তখন অমৃতবাজার পত্রিকা ছাপা হয ১৯ ও ২০ নম্বর বাগবাজার স্ট্রীট থেকে। বিচারাধীন অবস্থায় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলাটি নিয়ে মন্তব্যসহ নিবন্ধ প্রকাশ করায় অমৃতবাজার পত্রিকাব সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে। অভিযোগের তারিখ ছিল ৬ই জুন, ১৯১৩। মামলাটি শুনানীর জন্য তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। বেঞ্চের বিচারপতিরা ছিলেন স্যার লরেন্স হগ্ জেনকিনস্, স্যার হ্যারি স্টীফেন এবং স্যার আশুতোষ মুখার্জী। মামলার শুনানী শুরু হয়েছিল ১৮ই জুন, ১৯১৩।

হাইকোর্টে তদানীন্তন সরকারের পক্ষ থেকে হলফনামা দাখিল করে বলা হল ১৯১৩ সালের ২২শে মে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলাটি নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার ছাপানো নিবন্ধ মামলার বিচারক, অ্যাসেসরস, জুরি ও সাক্ষীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এ ছাড়াও মামলাটিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা মামলাটির পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর আদালত অবমাননাকর প্রয়াস বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। বলা হল অমৃতবাজার পত্রিকার মামলাটিকে নিয়ে ছাপানো সংবাদের

জন্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতিলাল ঘোষ এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রীতারিণী বিশ্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

তদানীন্তন সরকারের পক্ষে হাইকোর্টে হলফনামায় বলা হয়েছিল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলাটি বিচারাধীন অবস্থায় অমৃতবাজার পত্রিকা মামলাটিকে নিয়ে যে ধরনের নিবন্ধ প্রকাশ করেছে তা এককথায় বিচার ব্যবস্থার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং দেশের সরকারকে জনসাধারণের কাছে হেয় করার প্রয়াস।

কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে আদালত অবমাননার মামলাটিতে সরকারপক্ষে হলফনামা দাখিল করেছিলেন বাংলার রিমেমব্রানসার অফ্ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স। এই হলফনামাটিতেই সরকারপক্ষের বক্তব্য বলা ছিল। হলফনামাটিতে বলা হয়েছিল—

I, John Twidell, the Superintendent and Remembrancer of legal affairs and ex-offcio Public Prosecutor, Bengal, the petitioner abovenamed make Oath and say that what is stated in the forgoing petition is true to the best of my knowledge information and belief.

হাইকোর্টে মামলাটিতে সরকারপক্ষের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাঁর সহযোগী ছিলেন বাকল্যান্ড সাহেব।

শ্রীমতিলাল ঘোষের আইনজীবী ছিলেন মিঃ জ্যাকসন। শ্রীতারিণীকান্ত বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রী বি. চক্রবর্তী ও শ্রী সি. সি. ঘোষ।

মামলাটির শুনানি শুরু হতেই মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার জেনকিনস অ্যাডভোকেট জেনারেলকে উদ্দেশ করে বললেন,—আমি হলফনামাসহ পিটিশন পড়ে দেখেছি। মামলায় অভিযুক্ত শ্রীমতিলাল ঘোষের বিরুদ্ধে আইনগ্রাহ্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ দেখতে পেলাম না। এমন কি শ্রীমতিলাল ঘোষ যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক হিসেব কাজ করছিলেন, সেই মর্মে কোন তথ্য প্রমাণও আবেদনকারীর পক্ষে আদালতের কাছে উপস্থিত করা হয়নি।

প্রধান বিচারপতি এবার অ্যাডভোকেট জেনারেলকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন,

—এই ব্যাপারে অ্যাডভোকেট জেনারেল কি বলেন?

অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রধান বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে বললেন,—মামলার অভিযোগ থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রীমতিলাল ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন।

প্রধান বিচারপতি ঃ— কি করে জানা গেল শ্রীমতিলাল ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজার?

অ্যাডভোকেড জেনারেল ঃ—অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসে সম্পাদকের খোঁজ করতে গেলে পত্রিকার সাব-এডিটর জানিয়েছিলেন, পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতিলাল ঘোষ দার্জিলিংয়ে আছেন। সুতরাং পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে যে শ্রীমতিলাল ঘোষ কাজ করেছেন, সেই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রধান বিচারপতি ঃ—এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আদালত অবমাননার মামলায় শোনা কথার উপর নির্ভর করে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আদালতের পক্ষে সম্ভব কি?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—মি-লর্ড! কোম্পানীর আর্টিকেল অফ্ অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাওয়া গিয়েছে শ্রীমতিলাল ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকা লিমিটেডের একজন ডাইরেক্টর।

প্রধান বিচারপতি ঃ—এর থেকে কি আইনত প্রমাণ হয় শ্রীমতিলাল ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজার?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—মি-লর্ড! শ্রীমতিলাল ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন। তিনি সেই সব মামলায় কখনই অস্বীকার করেন নি যে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক নন।

প্রধান বিচারপতি ঃ—অন্যান্য মামলায় তিনি স্বীকার বা অস্বীকার যাই করেন না কেন, তাতে বর্তমান মামলাটিতে কি আসে যায়?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—না তা যায় না।

প্রধান বিচারপতি ঃ—অন্যান্য মামলায় অভিযুক্তর বক্তব্য কি বর্তমান মামলাটিতে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—না তা যাবে না।

এরপর হাইকোর্ট বেঞ্চের সব বিচারপতি একমত হয়ে আদালত অবমাননার দায় থেকে শ্রীমতিলাল ঘোষকে নিষ্কৃতি দিয়ে রুলটি খারিজ করে দিলেন। শ্রীমতিলাল ঘোষ হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পাওয়ায় মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল এবার শ্রীতারিণী কান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ হাইকোর্টের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন। তিনি বললেন,

—মি-লর্ড! ২২শে মে অমৃতবাজার পত্রিকায় "বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা" শিরোনামা দিয়ে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকৃতপক্ষে সরকারী প্রশাসনের এই ব্যাপারে দৃষ্টিগোচর হয়।

মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল এই ধরনের বক্তব্য শুরু করতেই শ্রীতারিণীকান্ত বিশ্বাসের আইনজীবী দাঁড়িয়ে উঠে আদালতকে বললেন,

—মি-লর্ড! অ্যাডভোকেট জেনারেলের কোন বক্তব্য শোনার আগে প্রথমেই বিবেচনা করা হউক হাইকোর্টের কাছে হলফনামা দেওয়া সরকার পক্ষের পিটিশনটি গ্রহণীয় কিনা! তাঁর ধারণা পিটিশনটি শোনার একতিয়ার কলকাতা হাইকোর্টের নেই। যদি একতিয়ারের প্রশ্নে কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলাটি চলতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি ঃ—আপনি এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন কেন?

আইনজীবী ঃ—হলফনামা ও নোটিশ দেওয়া হয়েছে লিগ্যাল রিমেমব্রানসারের পক্ষে অথচ মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল বক্তব্য রাখছেন গভর্নর জেনারেল ইন্‌কাউন্সিলের পক্ষে। সুতরাং এইভাবে মামলাটির শুনানি হাইকোর্টের আদিম বিভাগে চলতে পারে না। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধেও রুলটি খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে।

প্রধান বিচারপতি ঃ—এই ব্যাপারে অ্যাডভোকেট জেনারেলের মত কি?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—বর্তমান মামলার পিটিশনটিকে সেইক্ষেত্রে আপিল বিভাগের একতিয়ার হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

প্রধান বিচারপতি ঃ—কিভাবে অমৃতবাজারের প্রকাশিত নিবন্ধ বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে? তাছাড়া অমৃতবাজার পত্রিকা কি বরিশালে প্রচারিত বা পরিবেশিত হয়?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—"বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা"র রেশ কেবলমাত্র বরিশালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশে এই মামলাটির রেশ পড়বে।

বিচারপতি স্টীফেন এবার অ্যাডভোকেট জেনারেলকে প্রশ্ন করলেন,

—মিঃ অ্যাডভোকেট জেনারেল কেউ যদি মনে করেন অভিযুক্তদের মিথ্যা অভিযোগে কোন মামলায় যুক্ত করা হয়েছে, সেই অভিমত যদি ব্যক্ত করা হয়, তাহলে কি বলা যাবে

আদালত অবমাননা করা হয়েছে? কেউ কি নিজস্ব মতামত জানাতে পারবেন না?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—নিশ্চয়ই পারবেন। তবে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর মামলাটি নিয়ে বিচারাধীন অবস্থায় কোন মন্তব্য করা উচিত নয়।

বিচারপতি স্টীফেন ঃ—মূফঃস্বল আদালত অবমাননার অভিযোগ কি সরাসরি হাইকোর্টে তোলা যায়?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—মি-লর্ড! চার্টার আইনের বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী হাইকোর্ট সরাসরি বিচার-বিবেচনা করতে পারেন।

এতক্ষণ প্রশ্ন উত্তর শোনার পর মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ এবার প্রশ্ন করলেন,

—যদি হাইকোর্টের আদিম বিভাগে মামলাটির বিচারপর্ব চলে, তাহলে লিগ্যাল রিমেমব্রানসার কিভাবে হলফনামা দাখিল করলেন? আদিম বিভাগের যে কোন পিটিশন তো অ্যাটর্নির মাধ্যমে দাখিল করতে হবে?

অ্যাডভোকেট জেনারেল ঃ—মি-লর্ড! যেই পিটিশন করুন না কেন, ব্যাপারটি যখন হাইকোর্টের সামনে রয়েছে, এই অবস্থায় হাইকোর্টের শুনতে কোন আইনত বাধা নেই।

স্যার আশুতোষ ঃ—মামলাটি যখন হাইকোর্টের আদিম বিভাগে দায়ের করা হয়েছে, তখন কিভাবে আপিল বিভাগের এখতিয়ার হিসাবে মামলাটির শুনানী চলতে পারে?

মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার আশুতোষের প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলেন। আইনগত অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি আদালতের কাছে মামলার দরখাস্তের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন, হাইকোর্ট প্রার্থনা মঞ্জুর করায় মামলার শুনানি শুরু হল। দু-পক্ষের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট শেষপর্যন্ত শ্রীতারিণীকান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দেওয়া রুলটিও খারিজ করে দিলেন। শ্রীতারিণীকান্ত বিশ্বাসও মুক্তি পেয়ে গেলেন।

প্রধান বিচারপতির সাথে একমত হলেও বিচারপতি স্টীফেন এবং স্যার আশুতোষ আলাদা আলাদা ভাবে মামলাটিতে রায় দান করেছিলেন।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদ

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদসহ তদানীন্তন অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বক্তব্য ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। দুঃখের ব্যাপার, যে কারণেই হোক্ এই ঐতিহাসিক বক্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা খুব পরিষ্কার নয়।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদ, মিরাজকর, উসমানি, নিম্বকার, ডাঙ্গে প্রমুখ নেতৃত্ব আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা থেকে পাওয়া যায় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টির ইতিহাস ও পার্টির লক্ষ্য। হয়ত পরবর্তীকালে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির লক্ষ্যের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে। তবুও বলা যায় মূল লক্ষ্য থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি সরে আসেনি।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার কথা জানতে হলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকার। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মূল কেন্দ্র ছিল সোভিয়েত রাশিয়ায়। মস্কো শহর থেকে প্রধানত পার্টির কাজকর্ম চলত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের প্রধান লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পদানত করে শ্রমিক ও কৃষকের নেতৃত্বে শোষিত মানুষের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। সেই মর্মে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কর্মসূচীর মধ্যে প্রধানত ছিল সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র বিপ্লবের জাগরণ, শ্রমিক কৃষককে নিয়ে সংগঠন, ইয়ুথ লীগ ও ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করার। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার কর্মসূচি রূপায়ণে গঠন করেছিল বিভিন্ন দেশে শাখা সংগঠন। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার শাখা তৈরি করেছিল ১৯২১ সালে। এই শাখা সংগঠনটিই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল মুজফ্‌ফর আমহদ, ডাঙ্গে, সউকত, উসমানি প্রমুখের নেতৃত্বে। ইন্টারন্যাশনালের কর্মসূচি অনুযায়ী সেই সময় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালিত হ'ত। ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কর্মসূচিতে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার নথি থেকে পাওয়া যায় তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার কথা।

মিরাট ষডযন্ত্র মামলার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ মিরাটের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। ১৯৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী মিরাট মামলার অভিযুক্তদের দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। মামলাটিতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল মোট ২৭জনকে। বিচারের সুবিধার্থে ২৭ জন অভিযুক্তকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

প্রথম ভাগে রাখা হয়েছিল ১২ জন অভিযুক্তকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন (১) মুজফ্‌ফর আহমদ (২) ডাঙ্গে (৩) ঘাটে (৪) জোগলেকার (৫) নিম্বকার (৬) মিরাজকার (৭) উসমানি (৮) সোহন সিং জস্ (৯) মাজিদ্ (১০) অযোধ্যা প্রসাদ (১১) অধিকারী (১২) শামসুল হুদা।

উপরিউক্ত এই ১২ জন অভিযুক্তই তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগে রাখা হয়েছিল মাত্র ২ জন অভিযুক্তকে। এঁরা ছিলেন (১) স্প্রাট্ ও (২) ব্রাডলে। এই দুজনই ছিলেন তদানীন্তন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এই ২ জন কমরেডকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল অনুমান ১৯২৭ সালে। মুখ্যত স্প্রাট্ ও ব্রাডলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কর্মসূচি রূপায়ণ করতে।

তৃতীয় ভাগে রাখা হয়েছিল ৬ জন অভিযুক্তকে। এদের মধ্যে ছিলেন (১) গোস্বামী (২) পি. সি. যোশী (৩) চক্রবর্তী (৪) বসাক (৫) হুটচিনসন্ ও (৬) মিত্র। এই ৬ জন অভিযুক্ত সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন।

বাদবাকি অভিযুক্তরা ছিলেন চতুর্থ ভাগে। মিরাট মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল ভারতীয় দন্ডবিধির ১২১(এ) ধারায়। সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগে বলা হয়েছিল অভিযুক্ত আসামীরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে। মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসনের অপসারণ। শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ শেষ হওয়ার পর মুজাফ্‌ফর আহমদ-সহ অন্যান্য কমিউনিস্ট অভিযুক্তরা এক এক করে আদালতে তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য রেখেছিলেন। এ ছাড়া কমরেড নিম্বকার একটি লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ সহ অন্যান্য অভিযুক্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সকলেই কমরেড নিম্বকারের লিখিত বক্তব্য তাঁদের সকলের যৌথ বিবৃতি হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

লিখিত বক্তব্যের এক জায়গায় বলা হয়েছিল—"When we are trying to set up an entirely new system of laws we cannot be expected ot the existing one.......we fully subscribe to the system of thought and the well-thought out and scientific political programme laid down for the world revolution by that most powerful worldwide revolutionary organization, the Communist International ....while we assert our general deterministic view, we do not attempt to use this as an argument by which to escape from the consequences of our actions or to minimize them in the eyes of the court, on the contrary we lay the greatest possible stress upon the importance of conscious revolutionary activity, organiazation and leadership."

উপরিউক্ত ইংরাজী বয়ানের ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়—"আমরা যখন পুরোপুরি নতুন ভাবে আইন কাঠামো গড়তে সচেষ্ট তখন স্বভাবতই বর্তমান আইন কাঠামোর ওপর আমাদের বিশ্বাস থাকবে—এই কথা ভাবা যায় না। আমরা বিশ্বাসী কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চিন্তাধারায় অর্থাৎ বিপ্লবে। আমরা যখন আমাদের নীতিতে অবিচল তখন আমাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে আদালতের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চাই না। বরং আমরা সাধারণ মানুষকে বিপ্লব সম্বন্ধে জাগ্রত করতে চাই। সংগঠনের ও নেতৃত্বের উপর জোর দিতে চাই বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য।"

জাতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—"We consider that the way in which the economic and political life of the world generally and of India in particular have developed makes it certain that the Indian National revolution now developing, will culminate fairly soon in the revolutionary overthrow of the British Imperialist Rule."

অর্থাৎ "আমরা মনে করি বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারতবর্ষেও জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি হচ্ছে এবং অচিরেই বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে।"

এর পরেই বলা হয়েছিল—

"We have no objection to the help of the Communist International and the Russian Working Class. in fact we consider that India should welcome such help."

ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়—"কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কোন অন্যায় নেই, বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই আমরা উচিত বা সঙ্গত বলে মনে করি।"

অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য শেষ হলে মুজফ্ফর আহমদ নিজের বক্তব্য রাখতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আদালতকে বললেন—

"I am a revolutionary Communist. I had been a member of the Communist Party till the day of my arrest in connection with this case.......Our Paryt fully believed in the policy and principle and programme of the Communist International and propagated them as best it could under the circumstances. I am proud to state that with all my drawbacks I am one of the early pioneers of the Communist movement in the country."

অর্থাৎ "আমি একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট গ্রেপ্তারের দিন পর্যন্তও আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য ছিলাম। আমাদের পার্টি সর্বতোভাবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতি, লক্ষ্য ও অনুশাসনে বিশ্বাসী এবং আমরা মনে করি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতিকে ছড়িয়ে দেওয়াই সঠিক পদ্ধতি। আমি ব্যক্তিগতভাবে গর্বিত আমি দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন গোড়ার দিকের সৈনিক।"

শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজকর্ম ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মুজফ্ফর আহমদ বললেন—

"The first and foremost duty of the C.P.I. (the Communist Party of India) was, therefore, to create nilitant Trade Unions inside which alone these revolutionary cadres could grow. This is why the members of the Communist Party of India worked almost whole time in building Trade Unions inside the workers and Peasant Party which had been giving the Trade Union Movement a militant shape."

অর্থাৎ "প্রথমত ও প্রধানত ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে প্রয়োজন বিপ্লবী

জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করা। জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যদের মধ্য থেকেই আসবে বিপ্লবী কর্মী। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি সব সময় কৃষকশ্রমিকের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দিতে চাইছে।"

মুজফফর আহমদ তাঁর আদর্শের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বিচারকের সামনে পেশ করেছিলেন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায়। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টির একজন অগ্রণী সৈনিক। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের সাথে ছিল তাঁর গভীর সংযোগ। মুজফ্‌ফর আহমদ ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দন্ডিত হয়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯২৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই আবার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি রূপায়ণে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৫ সালে মুজফ্‌ফর আহমদ কানপুরে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট সম্মেলনে কর্মসমিতির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলার কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের সভ্য। তাঁর নিবন্ধ ও লেখা 'গণবাণী' পত্রিকায় ছাপানো হ'ত। ১৯২৭ সালে মুজফ্‌ফর আহমদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রিসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। অল ইন্ডিয়া ওয়ারকার অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টির (সর্ব-ভারত কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠনের) ফাউন্ডার সভ্য ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। তিনি বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পত্রিকার সম্পাদনার কাজও করেছেন।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের নিজ নিজ বক্তব্য নথিভুক্ত করতে দায়রা আদালতের সময় লেগেছিল ১০ মাস। সরকার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে দায়রা জজকে সময় নিতে হয়েছিল ১৩ মাস। মামলায় দু-পক্ষের সওয়াল চলেছিল ৪ মাসের উপর। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ২৭ জন অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মিরাটের অতিরিক্ত দায়রা আদালত সব আসামীকেই শাস্তি দিয়েছিলেন।

শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডিত আসামীরা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন ১৯৩৩ সালের ১৭ই মার্চ। আপিলের রায় দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ৩রা আগস্ট। হাইকোর্টের ডিবিশন বেঞ্চের বিচারপতিদ্বয় ছিলেন প্রধান বিচারপতি সুলাইমান ও বিচারপতি ইয়ং।

আপিলে মুজফ্‌ফর আহমদের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দিয়ে ৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক দন্ডিত আসামীরই শাস্তির মেয়াদ হাইকোর্ট হ্রাস করে দিয়েছিলেন। আপিলে মুক্তি পেয়েছিলেন আসামী দেশাই, হুটচিনসন, মিত্র, জাবওয়ালা, সেগল, কাসলে, গৌরীশঙ্কর, কদম এবং আলভি।

আপিল মামলায় হাইকোর্টে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে প্রধান আইনজীবী ছিলেন ডঃ কে. এন. কাটজু আর সরকার পক্ষে ছিলেন মিঃ কেম্প, শ্রী জে. পি. মিত্র প্রমুখ।

মামলাটির পাতায় পাতায় রয়েছে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার কথা, মিরাট মামলার নথি এককথায় বলা যায় একটি ঐতিহাসিক দলিল।

দু'জন ইংরেজকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল দু'জন বাঙালীর কাছে

ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজ সাহেবরা কথায় কথায় হাতে মাথা কাটতেন নেটিভদের। সেই সময় দুই মহাপ্রতাপান্বিত সাহেবকে দুই প্রখ্যাত বঙ্গসন্তানের কাছে দু-দুটি মামলায় ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়েছিল। পুরনো মামলার নথি ঘাঁটলে এমন সব চমকপ্রদ ঘটনা জানা যায়, যা এ কালের মানুষের অনেকেরই অজানা। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা পেশ করছি। প্রথমটি হল রাজা সূর্যকান্তের কাছে ফিলিপস সাহেবের ক্ষমা চাওয়া। সময় ১৮৯২-৯৩ সাল। মিস্টার ফিলিপস ছিলেন ওই সময় ময়মনসিং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। বলা যায়, তদানীন্তন ময়মনসিং জেলার ইংরেজ শাসনকর্তা। রাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী বাহাদুর ছিলেন ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার জাঁদরেল জমিদার। মিস্টার ফিলিপস নিজেই একবার রাজা সূর্যকান্তকে অভিযুক্ত করে একটি ফৌজদারি মামলা আনেন। রাজা বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি পৌর আইনের কিছু বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছেন। রাজা বাহাদুর কী ধরনের বিধিনিষেধ ভাঙার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, পুরনো নথিটিতে তার বিবরণ না থাকায় পাঠককে জানানো সম্ভব হল না। সূর্যকান্তের আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। শ্রীঘোষ তাঁর বাগ্মিতা ও আইনের পাণ্ডিত্যের জোরে রাজা বাহাদুরকে ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সূর্যকান্তের বিরুদ্ধে ফিলিপস সাহেব এই ধরনের ফৌজদারি মামলা দায়ের করায় সেই সময় ভারতবর্ষে, এমনকি ইংল্যান্ডে পর্যন্ত প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ পর্যন্ত এই মামলাটি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি রাজা বাহাদুরের বিরুদ্ধে আনা মামলাটিকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ নিবন্ধ তৈরি করেছিলেন। ১৮৯৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি স্যার রিচার্ড গার্থের বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি লর্ড স্ট্যানলি এই মামলাটিকে কেন্দ্র করে হাউস অব লর্ডসে বক্তব্য রেখেছিলেন ১৮৯৩ সালের ২৪শে জুন। তাঁর বক্তব্যের সার অংশ ছিল : একই ব্যক্তির কাছে শাসন ও বিচারের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। তাহলে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়।

মামলায় রাজা সূর্যকান্ত তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মিস্টার ফিলিপসের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি করে একটি দেওয়ানি মামলা রুজু করেছিলেন। ক্ষতিপূরণের দাবি ছিল ৬০,০০০ টাকার। সেই সময় স্যার অ্যান্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডোনাল সাহেব ছিলেন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তদানীন্তন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়াটের অবর্তমানে স্যার ম্যাকডোনাল

সাহেবকে সাময়িকভাবে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাজকর্ম চালাতে হয়েছিল। স্যার ম্যাকডোনালের একসময়ের সহপাঠী ছিলেন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। শ্রীঘোষ স্যার ম্যাকডোনালকে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। শ্রীঘোষের পরামর্শে স্যার ম্যাকডোনাল ফিলিপসের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন রাজা সূর্যকান্তের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করে মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে। শেষ পর্যন্ত রাজা বাহাদুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিলিপস সাহেবকে মামলা মেটাতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র মুর্শিদাবাদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে অস্থায়ীভাবে কাজে যোগদান করেছিলেন ১৮৬৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। এরপর অবশ্য তিনি বহরমপুরস্থ রাজশাহি কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অস্থায়ীভাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৭১ সালের ২৫শে এপ্রিল। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে কর্নেল ডাফিন নামক একজন সেনানীর হস্তে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের নামে আদালতে ফৌজদারী মামলা রুজ্ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরেজ সাহেবের এই অপমান করার ঘটনাটিকে জাতীয় অপমান হিসেবে গণ্য করে বাঙালী জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। অবস্থা বুঝে ডাফিন সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমের কাছে ক্ষমা চাওয়ায় নিষ্কৃতি লাভ করেন। কর্নেল ডাফিনের ক্ষমাপ্রার্থনায় কেবলমাত্র বঙ্কিমের নয়, বাঙালীর জাতীয় মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭৪ সালের ১৯শে জানুয়ারি তদানীন্তন প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর এই লাঞ্ছনার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, সেইসময় সরকারী পদে কর্মরত বঙ্কিমচন্দ্রের মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তির গায়ে হাত তুলে লাঞ্ছিত করেছিলেন একজন সাহেব সেনানী। আবার অন্যদিকে এই ভেবে আমাদের গর্ব হয় যে, ব্রিটিশ শাসনকালে মহাপ্রতাপান্বিত দুজন সাহেবকে দুই বিশেষ স্মরণীয় বাঙালীর ব্যক্তিত্বের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়েছিল।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৬৭ সালে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর ছিল মহকুমা শহর। তখন একজন ইংরেজ সাহেব ছিলেন মহকুমা শহর মেহেরপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এই সাহেবটির তত্ত্বাবধানে মেহেরপুরের সরকারী প্রশাসন চলত। সাহেবটির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিল তথাকথিত একটি নিচু জাতের মেয়ে। সাহেবটিকে অভিযুক্ত করে মেয়েটি আদালতে বলেছিল, মেহেরপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর ইজ্জত নিয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে এই ধরনের মারাত্মক অভিযোগ হওয়ায় নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই সে সম্বন্ধে তদন্ত করেন। ব্রিটিশ আমলে সাহেবের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ভাবাই যায় না। স্বভাবতই কোন অজানা কারণে মামলাটি চাপা পড়ে যায়। ধর্ষিতা মেয়েটি বিচার তো পেলই না, উপরন্তু অভিযোগকারিণী মেয়েটিকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করে দেওয়া হয় সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করার জন্যে। নিচু জাতের গরিব মেয়েটির আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন আইনজীবী নিযুক্ত করার মত আর্থিক ক্ষমতা ছিল না। সেই সময় বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন মেহেরপুর মহকুমার একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার। মেয়েটির করুণ অবস্থা দেখে তাঁর মন কেঁদেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাহেবটির বিরুদ্ধে মেয়েটি মোটেই মিথ্যে অভিযোগ করে নি। বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ মেয়েটিকে দায়রা আদালতের মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন

ঘোষের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে শ্রীঘোষ মামলাটিতে মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করতে না পাবায় ডব্লু. সি. ব্যানার্জিকে অনুরোধ করেছিলেন মেয়েটির হয়ে কৃষ্ণনগরের দায়রা আদালতে দাঁড়াতে। সেই সময় হাইকোর্টের ছুটি ছিল। ছুটি কাটাতে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লু. সি. ব্যানার্জি এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে। শ্রীঘোষের অনুরোধে ও মেয়েটির অসহায়তা বিবেচনা করে তিনি মেয়েটির আইনজীবী হিসেবে দায়রা কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লু. সি ব্যানার্জির সহায়তায় মেয়েটি তার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

"ফরওয়ার্ড" পত্রিকা রাজদ্রোহের অভিযোগে

পরাধীন ভারতবর্ষে 'ফরওয়ার্ড' নামে ইংরেজী পত্রিকাটি ছিল বিদেশী প্রশাসনের চক্ষুশূল। ভারতবাসীর উপর প্রশাসনের অন্যায় অবিচার নিষ্পেষণ ও নির্যাতন দেখলে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকাটি দৃঢ়তার সাথে তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত।

১৯২৬ সালে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী। পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন শ্রীপুলিনবিহারী ধর। কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

১৯২৬ সালের মাঝামাঝি অবিভক্ত বাংলার পাবনার আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা দিয়েছিল। পাবনায় চরম আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সত্ত্বেও সরকারী প্রশাসনের দিক থেকে সামান্যতম সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেল না। পাবনার সাধারণ মানুষ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও সরকারী প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা দেখে ভীষণভাবে অসহায় ও বিব্রত বোধ করছিলেন। স্বভাবতই দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন পাবনার সাধারণ মানুষ। পাবনার মানুষদের অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে ও ব্রিটিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা প্রশাসনিক গাফিলতি দেখে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা ১৯২৬ সালের ৭ই জুলাই পাবনার আইন-শৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। নিবন্ধটির শীর্ষক ছিল—"Anarchy in Pubna." অর্থাৎ "পাবনায় অরাজকতা"। "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত ৭ই জুলাইয়ের নিবন্ধটি সরকারী প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হল। সরকার বিরোধী নিবন্ধটিকে মেনে নিতে পারলেন না ভারতবর্ষের তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রশাসন।

এরপর সরকার পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ দায়ের করা হ'ল কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায়। অভিযুক্ত করা হল "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী ধরকে। অভিযোগে বলা হল "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯২৬ সালের ৭ই জুলাইয়ে প্রকাশিত "Anarchy in Pubna" (পাবনায় অরাজকতা) শীর্ষকের নিবন্ধটি অভিসন্ধিমূলক এবং রাজদ্রোহী। বিশেষ নিবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সমন পেয়ে আদালতে হাজির হলেন "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী এবং পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী ধর। এরপর "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার ৭ই জুলাইয়ের "Anarchy in Pubna" শীর্ষকের নিবন্ধটি নিয়ে মামলাটির বিচারপর্ব শুরু হল কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

সাক্ষ্যসাবুদ ও 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ৭ই জুলাইয়ের বিশেষ নিবন্ধটির বিচার-বিবেচনা করে কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত দুই অভিযুক্তকেই ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রায় দান করেন ১৯২৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী। শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীকে দেওয়া হল ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। শ্রীপুলিনবিহারী ধরের বিরুদ্ধে দেওয়া হল ২৫০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দন্ডিত আসামীদ্বয় কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করলেন। কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হয়েছিল একটি ডিভিশন বেঞ্চে ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে। ডিবিশন বেঞ্চের বিচারপতি ছিলেন স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ এবং গ্রেগরী সাহেব।

আপিলের শুনানির শুরুতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারার ইংরেজী 'সিডিসন' শব্দটির আইনগত ব্যাখ্যা উঠতেই মাননীয় বিচারপতিরা বললেন, ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজদ্রোহিতার অভিযোগের মামলায় 'সিডিসন' শব্দটির আইনগত ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নতুন করে এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গক্রমে হাইকোর্ট বললেন, লর্ড মেকলের তৈরী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের মূল পাণ্ডুলিপিটিতে ১২৪(এ) ধারাটির কোন অস্তিত্বই ছিল না। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে ১৮৭০ সালে ১২৪(এ) ধারাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে সংযোজিত করা হয় স্যার জেমস্ ফিট্জেমস্ স্টীফেন সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টায়।

নিম্ন আদালতের নথিপত্র পর্যালোচনা করে হাইকোর্ট অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায় কোন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে আদালতকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে কোন বিশেষ লেখার পিছনে লেখকের আসল উদ্দেশ্য কি! লেখাটির মাধ্যমে সাধারণ জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত বা সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস ছিল কি না! যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোন বিশেষ নিবন্ধ ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মানোর প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহলে অবশ্যই বিশেষ নিবন্ধটির লেখক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মামলার রায়টিতে বলেছিলেন, "পাবনায় অরাজকতা" (Anarchy in Pubna) নিবন্ধটির প্রথম পংক্তিটি ছিল সরকারের প্রতি বিদ্রুপাত্মক প্রয়াস। দ্বিতীয় পংক্তিটিতে ছিল তদানীন্তন বাংলার গভর্নরের নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ। বিদ্রূপ করা হয়েছিল সরকারের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। তৃতীয় পংক্তির বিষয়বস্তুই ছিল মামলার মূল আক্রমণ। এই পংক্তিটিতে বলা হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে। এককথায় বলা যায় সাম্রাজ্যবাদীদের তুরুপের তাস হল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রাখা। সব সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতিগত কৌশল যে কোন প্রকারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে রাখা। এই দুই সম্প্রদায় এক হতে না পারলে কখনই যৌথভাবে বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারবে না।

ভারতের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন জানেন পার্লামেন্টে কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে তাদের নীতি রূপায়ণ করতে সুবিধা হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে রাখতে

পারলে পার্লামেন্টে কোন পক্ষই ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুব বেশি একটা আক্রমণাত্মক হতে পারবে না। সরকারের বিরুদ্ধে কোন জোরদার আন্দোলনও গড়ে তোলা যাবে না।

মামলায় সরকার পক্ষ থেকে বলা হ'ল পাবনায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে যখন চরমতম সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই অবস্থায় 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা "Anarchy in Pubna" নিবন্ধটি প্রকাশ করে সাধারণ জনসাধারণের কাছে সরকারকে হেয় করেছে। বলা হ'ল ৭ই জুলাইয়ের এই বিশেষ নিবন্ধটি জনসাধারণকে উস্কানি দেওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে!

অন্যদিকে হাইকোর্টে দন্ডিত আসামীদের পক্ষে বক্তব্য রাখা হ'ল—যদি ৭ই জুলাইয়ের নিবন্ধটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বিদ্রূপাত্মক বা উস্কানিমূলক হয়েই থাকে, তবে তা করা হয়েছে পার্লামেন্টারি রীতিনীতিকে আক্রমণ করে এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের বিদেশ দপ্তরকে উদ্দেশ্য করে। সেই ক্ষেত্রে রাজদ্রোহের অভিযোগটি আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় না।

এ ছাড়া আসামীদের পক্ষে বলা হ'ল নিম্ন আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে ১৯২৬ সালের ৭ই জুলাইয়ের বিশেষ নিবন্ধটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটির বিচার বিবেচনা করেছেন ৭ই জুলাইয়ের নিবন্ধটির সাথে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত ৭ই জুলাইয়ের পরের অনেক নিবন্ধকে যুক্ত করে। আইনত ৭ই জুলাইয়ের পরের কোন নিবন্ধ বা সংবাদ মামলাটির বিচার্য বিষয় হতে পারে না। সুতরাং নিম্ন আদালতের রায় আইনগ্রাহ্য নয়। সুতরাং আসামীদের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত বলে আবেদন রাখা হ'ল হাইকোর্টের আপিল বেঞ্চের কাছে।

"ফরওয়ার্ড" ছিল ইংরেজী পত্রিকা। ইংরেজী জানা শিক্ষিত লোকরাই "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার পাঠক ছিলেন। "Anarchy in Pubna" নিবন্ধটির উদ্দেশ্য বোঝা তাঁদের কাছে এমন কোন অসুবিধা ছিল না। হাইকোর্টও এই ব্যাপারে একমত হলেন।

দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্ট বললেন, বিশেষ নিবন্ধটির প্রথম পংক্তি আলাদা করে দেখলে আইনগত দিক থেকে এই পংক্তিটি অবশ্যই দোষণীয় নয়। কিন্তু নিবন্ধটির সমগ্র অংশ পড়লে প্রথম পংক্তিটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির বিষয়বস্তুর বিচার বিবেচনা করতে গেলে প্রথম পংক্তিটিকে বাদ দিয়ে তা করা সম্ভব নয়। সব পংক্তি নিয়ে নিবন্ধটি পড়লে "Anarchy in Pubna" (পাবনায় অরাজকতা) নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী মূলক রচনা।

নিবন্ধটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ব্রিটিশ-প্রশাসনের নীতিই হ'ল "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" এবং এই নীতিকে ইংরেজীতে বলা হয় "ফেবারিট ওয়াইফ পলিসি"। এই নীতিকে আঁকড়ে ধরে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁর কাজকর্ম চালাচ্ছেন। সব সময়েই ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন চেয়েছেন—যেভাবেই হোক লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে যেন সরকার সমর্থনকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। তাহলে সরকারকে কোন নীতি গ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে রাখতে পারলে ব্রিটিশ নীতি কার্যকরী হওয়া সম্ভবপর হবে।

শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টও সিদ্ধান্তে এলেন দন্ডিত আসামীদ্বয় সঠিকভাবেই দোষী সাব্যাস্ত হয়েছেন। আপিলকারীরা ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪(এ) ধারার অপরাধে অপরাধী। নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রাখলেও কলকাতা হাইকোর্ট শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীর বিরুদ্ধে শাস্তির মেয়াদের কিছু পরিবর্তন করে দিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের

জায়গায় ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। শ্রীপুলিনবিহারী ধরের বিরুদ্ধে দেওয়া জরিমানার অঙ্ক ২৫০ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা করে দিলেন। শাস্তির মেয়াদ ও জরিমানার অঙ্কের পরিবর্তন করে আপিল খারিজ করে দিলেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের রায় হয়েছিল ১৯২৭ সালের ৫ই জুলাই।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীর কথা আজ হয়ত অনেকেই জানেন না। শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীর মত অনেক দেশপ্রেমিকের কথাই বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা খবর রাখে না। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস তৈরী হলে এইসব দেশপ্রেমিকদের নাম সেই ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্থান পাবে। দেশের শিক্ষিত মানুষ নিশ্চয়ই আশা করবেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হবে। যদি তা হয়, সেই ইতিহাসে এই সব মনীষীরা নিশ্চয়ই স্থান পাবেন।

মহামান্য তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃতদেব মধ্যে মহামান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন প্রথম সারির একজন অন্যতম নেতৃত্ব। বিংশ শতাব্দীব প্রথম দশকে বাল গঙ্গাধর তিলক গর্জে উঠেছিলেন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। প্রশাসনের অগ্নিরোষে তাঁকে পড়তে হয়েছে বার বার। ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে একাধিকবার। দণ্ডিত হয়েছেন আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ও দেশপ্রেমের অন্যতম প্রতিমূর্তি মহামান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহামান্য তিলক একদিকে দেশের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অপরদিকে সামাজিক কুসংস্কার ও যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে আমৃত্যু আন্দোলন করেছেন। মহামান্য তিলকের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন পর্যালোচনা করলে বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও সততার প্রতীক।

ইংরেজী ১৯০৮ সাল। এই সময় বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন মারাঠী সাপ্তাহিক পত্রিকা "কেশরি"র মালিক, সম্পাদক ও প্রকাশক। "কেশরি" সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হত মহারাষ্ট্রের পুনা শহর থেকে। ১৯০৮ সালের মে ও জুন মাসে "কেশরি" পত্রিকায় দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করে বাল গঙ্গাধর তিলক রাজরোষে পড়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১২ই মে "কেশরি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল "The Country's Misfortune" (ইংরেজী অনুবাদে নিবন্ধটির নামকরণ)। বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—"দেশের দুর্ভাগ্য"। দ্বিতীয় নিবন্ধটি "কেশরি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ৯ই জুন, ১৯০৮। নিবন্ধটির শীর্ষক ছিল—"These Remedies are not Lasting"। (ইংরেজী অনুবাদে নিবন্ধটির নামকরণ)। বাংলায় শীর্ষকের নাম দেওয়া যেতে পারে—"এইসব প্রতিবিধান দীর্ঘস্থায়ী নয়"।

উপরোক্ত নিবন্ধ দুটি "কেশরি" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তদানীন্তন ভারতের ব্রিটিশ সরকার ১৯০৮ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ফৌজদারী মামলা করেছিলেন। মামলাটি রুজু করা হয়েছিল চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) এবং ১৫৩(এ) ধারায়। চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ অ্যাসটন নামে এক সাহেব। তদানীন্তন সময়ে রাজদ্রোহিতার অভিযোগের বিচার হত হাইকোর্টে। ভারতীয় কার্যবিধি আইনের বিধান অনুযায়ী চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসটন সাহেব অভিযুক্ত আসামী বাল গঙ্গাধর তিলককে মূল বিচারের জন্য বোম্বে হাইকোর্টে সোপর্দ করেছিলেন। মামলাটির বিচার শুরু হয়েছিল বিশেষ জুরিদের সামনে ১৯০৮ সালের ১৩ই

জুলাই। একজন ফোরম্যান সমেত নয়জন বিশেষ জুরি ছিলেন মামলাটিতে। হাইকোর্টের দায়রা আদালতে বিচারকের আসনে ছিলেন মাননীয় বিচারপতি মিঃ ডেভার সাহেব। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রানসন। মামলার অভিযুক্ত আসামী বাল গঙ্গাধর তিলক আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেই হাইকোর্টে সাক্ষীদের জেরা এবং সওয়াল জবাব করেছিলেন। তিনি তাঁর পক্ষে কোন আইনজীবী নিযুক্ত করেন নি। বিচার শুরু হতেই চার্জ গঠন করা নিয়ে আইনগত নানা প্রশ্ন উঠেছিল। ১২ই মে-র নিবন্ধটিকে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে দুটি চার্জ গঠন করা হয়েছিল। প্রথমটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) এবং দ্বিতীয়টি ১৫৩(এ) ধারায়। ৯ই জুনের নিবন্ধটির জন্যও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) এবং ১৫৩(এ) ধারায় চার্জ গঠন করা হ'ল। অভিযুক্ত আসামী বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর বিরুদ্ধে গঠন করা সবকটি চার্জই অস্বীকার করলেন। আদালতকে বললেন, তিনি নির্দোষ। এরপর সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুরু হতেই ১২ই মে-র নিবন্ধ—"The Country's Misfortune" এবং ৯ই জুনের নিবন্ধ—"These Remedies are not Lasting" আদালতের কাছে মামলায় এগ্‌জিবিটস্ হিসেবে দাখিল করা হ'ল।

"The Country's Misfortune" (দেশের দুর্ভাগ্য) নিবন্ধটি ছিল মুজাফ্‌ফরপুরে বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে দুজন ইংরেজ রমণীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখা একটি নিবন্ধ। ঘটনার পরে জানা গিয়েছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ছোড়া বোমায় ভুলবশত কেনেডি পরিবারের দুইজন নির্দোষ মহিলার মৃত্যু হয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিক বিপ্লবী ক্ষুদিরাম দুই নিরাপরাধ মহিলার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। ব্যথিত হয়েছিলেন নিজের ভুলের জন্য। জানা গিয়েছিল কেনেডি পরিবারের এই মহিলাদের উপর বোমার আঘাত হানার কোন পরিকল্পনাই ছিল না বিপ্লবীদের। ভুলবশতঃ ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় বিপ্লবীরাও দুঃখিত হয়েছিলেন।

মহামান্য তিলক তাঁর এই নিবন্ধটিতে আরো বলেছিলেন, ভুলবশত বোমার আঘাতে দুজন ইউরোপীয়ান মহিলার মৃত্যু নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু বোমা ছোড়ার পশ্চাতে দেশের স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী যুবকদের ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি যে নিদারুণ ঘৃণা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। এই বোমা বিস্ফোরণ কোন সমাজদ্রোহী বা বদমাস গুণ্ডাদের কাজ বলে মনে করলে ভুল হবে। বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে দুই নিরীহ মহিলার মৃত্যু ঘটলেও মনে রাখতে হবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের শত্রু নিধন যজ্ঞে অনেক সময় কিছু নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু এমন কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। প্রসঙ্গক্রমে মহামান্য তিলক তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন রাশিয়ার বিপ্লবী ইতিহাসের কথা। এ ছাড়াও নানা আলোচনা ছিল নিবন্ধটিতে।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে "The Country's Misfortune" নিবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদের কিছু বিশেষ অংশ তুলে ধরা হ'ল—

(Article of the 12th May 1908)

The Country's Misfortune

"No one will fail to feel uneasiness and sorrow on seeing that India, a country which by its very nature is mild and peace-loving, has begun

to be in the condition of European Russia. Furthermore, indusputable that (the fact of) two innocent white Ladies having fallen victims to a bomb at Muzzafferpore will specially inspire many with hatred against the people belonging to the party of rebels. That many occurences of this kind have taken place in European Russia and are taking place even now, is a generally known historical fact. But we do not think that the political situation in India would, in such a short time, reach its present stage, at least that the obstinacy and perversity of the white official class (a) (bureaucracy) (a) of our country would (so soon) inspire with utter disappointment the young generation solicitious for the advancement of their country and impel them so soon to (follow) the rebellious path. But the dispensations of God are extraordinary. (b) It does not appear from the statements of the persons arrested in connection with the bomb explosion case at Muzzafferpore, that the bomb was thrown through the hatred (felt) for some individual or simply owing to the action of some . badmash. (c) madcap. even Khudiram, the bomb-thrower, himself feels sorry that two innocent ladies of Mr. Kennedy's family fell victims (to it) in place of Mr. Kingsford ; what, then, should be said of other ? It is plain from the statements of those identical young gentlemen, who took this work in hand by founding a Secret Society, that they were fully aware that it was not possible to cause British rule to disappear from this country, by such monstrous deeds. None of the arrested persons have stated that the mere establishment of the Secret Society at the present time would do away with the oppressive official class. Some of the Anglo Indian Journalists have Cast ridicule on these young men by insolently asking the question "will the English rule disappear by the manufacture of a hundred muskets or ten or five bombs?" But we have to suggest to the said editors that this is not a subject for ridicule The young Bengali gentlemen, who perpetrated those terrible things, do not belong to (the class of thieves or badmashes; (c) had that-been so, they would not also have made statements frankly to the Police, as (they have done) now. Though the Secret Society of the young generation of Bengal may have been formed like (that of the Russian rebels· for the secret assassination of the authorities, it plainly appears from their statements that is has been formed not for the sake of self exercise of power by the unrestrained and powerful white official class. It is known to all that mutinies and revolts of the nihilists, that frequently occur in Russia, take place for this very reason and looking (at the matter) from this point of view, (one) is

compelled to say that the same state of things, which has been brought about in Russia by the oppression of the official class composed of their own countrymen, has now been inagurated in India in consequence of the oppression practised by alien officers. There is none who is not aware that the might of the British Government is as vast and unlimited as that of the Russian Government. But rulers who exercise unrestricted power must always remember that there is also a limit to the patience of humanity."

নিবন্ধটির শেষ অংশে বলা হয়েছিল—"We are aware that the white official class or the Anglo-Indian Journalists will most astutely utilize Muzzaffarpore affair to lessen the rehemence of efforts; nay, their self-interest also lies in this. But it is our duty to strongly condemn also this perversion of the true state of things by Anglo-Indians, while condemning the desperate and suicidal deed perpetrated at Muzzaffarpore. Just as it is the duty of the Subjects to assist in preventing the murder of ruling officials so also it is the duty of the rulers to admit (the voice of) public opinion into the administration (of the Country) according to the present times, instead of keeping it (i. e., the administration) irresponsible. The scripture laying down the duties of Kings is declaring at the top of its voice that it is not possible for the ruling individuals to forget this duty or to deliberately disregard it and to make the subject only discharge their duties punctiliously; nay, (it further says that this) will be beneficial to neither party. Where this duty is disregarded, there the occurence of calamities, some time or other, like that at Muzzaffarpore is inevitable. Therefore, if the rulers wish that these undesirable incidents should not come to pass, our suggestion to them is that they should in the first instance, impose restrictions upon their own system of administration itself, and it is only with that object in view that today's article has been written."

বাল গঙ্গাধর তিলক উপরোক্ত নিবন্ধটিতে একদিকে রাশিয়ার বিপ্লবী ইতিহাস, অপর দিকে ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশ প্রশাসনের নিষ্পেষণের বর্ণনা দিয়ে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। নিবন্ধটির মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন, বোমার আঘাতে দুই ইউরোপিয়ান মহিলার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের হইচই করার কিছু নেই। যে কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এই ধরনের বহু নজির খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৯০৮ সালের ৯ই জুনের নিবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ বিশেষ অংশে বলা হয়েছিল—

(Article of the 9th June 1908)

These Remedies are not Lasting

"From this week the Government of India have again entired upon a new policy of repression. The fiend of repression has possession of the body of the Government of India after (every) five or ten years. The Present occasion, too, is of this very kind. The prevention of Meeting Act was passed, certainly after Lord Morley had become Secretary of State for India and now an Act relating to newspapers has been passed".

এই অংশ থেকে পরিষ্কার তদানীন্তন ভারত সরকার বিবিধ নিবারক আইনের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবাসীর এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিদেশী প্রশাসনের দমন পীড়ন এবং নিগ্রহমূলক কাজকর্মের বিবরণ যেন সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশিত না হয়। সরকার বিরোধী আন্দোলনের খবর যেন দেশের সাধারণ মানুষ জানতে না পারেন।

"These Remedies are not Lasting" নিবন্ধটির শেষ অংশে বলা হয়েছিল—

"Government has passed the "Newspaper" Act with a view to put a stop to the process of awakening ; and, therefore, there is a possibility of the disappointment assuming a more terrible form and of turn headedness being produced even amongst people of thoughtful and quiet disposition. The real and lasting means of stopping bombs consists in making a beginning to grant the important rights of Swarajya (to the people). It is not possible for measures of repression to have a lasting (effect) in the present condition of the Western Sciences and that of the people of India."

এইভাবে দৃঢ়তার সাথে বাল গঙ্গাধর তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন "কেশরি" পত্রিকায়। ব্রিটিশ প্রশাসনের দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে শ্রীতিলক ছিলেন প্রতিনিয়ত সোচ্চার। বাল গঙ্গাধর তিলক বোধহয় ব্রিটিশ প্রশাসনকে বলতে চেয়েছিলেন, দমনমূলক আইনের বেড়াজালে ভারতবাসীর কণ্ঠ বেশিদিন রোধ করা যাবে না। সরকারের এই ধরনের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এইটিই বোধহয় স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন শ্রীতিলক তাঁর "These Remedies are not Lasting" নিবন্ধটির মাধ্যমে।

"The Country's Misfortune" এবং "These Remedies are not Lasting" এই নিবন্ধ দুটি আদালতে পেশ করার পর মামলাটিতে সাক্ষ্য সাবুদ শুরু হতেই মিঃ ব্রানসন আদালতকে বললেন—

মি. ব্রানসন ঃ মাই লর্ড! আমি অভিযুক্ত আসামী মিঃ তিলকের নিজ হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ড আদালতের কাছে পেশ করছি। পোস্টকার্ডটিতে বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে লেখা ৪টি বইয়ের নাম উল্লেখ আছে।

মিঃ তিলক ঃ মাই লর্ড! আমি পোস্টকার্ডটির হেপাজত মোটেই অস্বীকার করছি না। কিন্তু পোস্টকার্ডটি নেওয়া হয়েছে আমার অসাক্ষাতে। পোস্টকার্ডটির বিষয়বস্তুর সাথে বর্তমান

মামলাটির কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং পোস্টকার্ডটিকে যেন সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে আদালত গ্রহণ না করেন।

বিচারপতি ডেভার ঃ পোস্টকার্ডটি যখন তল্লাসীকালে আপনার হেপাজত থেকে পাওয়া গিয়েছে, তখন আইনত পোস্টকার্ডটিকে মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজেই আদালত এই পোস্টকার্ডটিকে এগ্‌জিবিট হিসেবে গ্রহণ করছেন।

সরকার পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ শেষ হতে অভিযুক্ত আসামী বাল গঙ্গাধর তিলক আদালতের কাছে নিজের বক্তব্য রেখে বললেন—

'আমি বর্তমান মামলাটির অভিযুক্ত আসামী বাল গঙ্গাধর তিলক দৃঢ়তার সাথে স্বীকার করছি আমি মারাঠী সাপ্তাহিক পত্রিকা "কেশরির" মালিক, সম্পাদক ও প্রকাশক। স্বভাবতই পত্রিকাটির দায়দায়িত্বও অস্বীকার করছি না। পুনা থেকে সাপ্তাহিকটি প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়। মারাঠী ভাষার প্রতিটি শব্দের ইংরেজী পরিভাষা না থাকায় ইংরেজীতে অনুবাদ করা নিবন্ধ দুটির মর্মার্থের সাথে প্রকাশিত মারাঠী নিবন্ধের মর্মার্থের অনেক ফারাক থেকে গিয়েছে। তাই নিবন্ধ দুটি সম্বন্ধে সরকারের ভুল ধারণা থেকে গিয়েছে। আমি ১২ই মে-র নিবন্ধে বলতে চেয়েছি ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা এবং বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে। "কেশরি" পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ দুটির মাধ্যমে সরকারকে কোনভাবেই দেশের জনসাধারণের কাছে হেয় করা হয়নি বা জনসাধারণকেও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়নি।"

তাঁর হেপাজত থেকে পাওয়া পোস্টকার্ডটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, নতুন বিস্ফোরক আইনটি পাশ হওয়ায় তিনি নতুন আইনটির সমালোচনা করে নিবন্ধ লেখার জন্য পোস্টকার্ডটিতে উল্লেখ করা বইগুলির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং বিস্ফোরক পদার্থের উপর লেখা উল্লেখিত বই ৪ খানি লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাস্টকার্ডটি লিখেছিলেন। এই বইগুলি থেকে নানা তথ্য নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অন্য কোন উদ্দেশ্যে পোস্টকার্ডে লেখা বই ৪ খানির নাম উল্লেখ করা হয়নি। বাল গঙ্গাধর তিলক বিচারপতি এবং জুরিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, খোলা মন নিয়ে তিনি নিবন্ধ দুটি প্রকাশ করেছেন সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে তিনি নিবন্ধ দুটি প্রকাশ করেননি।

শ্রীতিলক আদালতকে তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বললেন—'আমি নির্দোষ। আমাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

এরপর আইনগত ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন—

মিঃ তিলক ঃ মাই লর্ড! রাজদ্রোহিতাব অভিযোগ প্রমাণ করতে তিনটি বিষয়ের উপর আদালতকে নির্ভর করতে হবে।

প্রথমত আদালতকে দেখতে হবে মামলায় উল্লেখিত নিবন্ধ দুটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত অভিযোক্তা সরকার পক্ষকে বলতে হবে নিবন্ধ দুটির কোন্ কোন্ অংশ প্ররোচনামূলক।

তৃতীয়ত আদালতকে খতিয়ে দেখতে হবে কী উদ্দেশ্য নিয়ে নিবন্ধ দুটি প্রকাশ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত আসামীর এই বক্তব্য শুনে মিঃ ব্রানসন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—

মি. ব্রানসন ঃ মাই লর্ড! এবং মাননীয় জুরিমহোদয়গণ! আপনাদের শুধু মাত্র দেখতে হবে, অভিযুক্ত আসামী নিবন্ধ দুটির লেখক ও প্রকাশক ছিলেন কি-না।"

তিনি যদি নিবন্ধ দুটির লেখক ও প্রকাশক হয়ে থাকেন, সেইক্ষেত্রে তাঁর কোন দায়িত্ব ছিল কি-না?

এরপর মিঃ ব্রানসন বিচারক ও জুরিদের উদ্দেশ করে বললেন—

বর্তমান মামলাটিতে অভিযুক্ত আসামী নিজেই আদালতের কাছে স্বীকার করেছেন, তিনি "কেশরি" পত্রিকার মালিক, সম্পাদক এবং প্রকাশক। স্বভাবতই তিনি নিবন্ধ প্রকাশে তাঁর দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। "কেশরি" পত্রিকায় নিবন্ধ দুটির সমগ্র অংশ পড়লে সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কি ধারণা জন্মাবে তাও বিবেচনা করতে হবে।

বিচারপতি ডেভার ঃ জুরিমহোদয়গণ! আপনাদের বিচার-বিবেচনার জন্য মামলার সমগ্র বিষয়টি তুলে ধরছি। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মামলার নজির উদ্ধৃত করে আইনগত দিকগুলিও বিশ্লেষণ করছি। সব দিক বিবেচনা করে আপনাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে অভিযুক্ত আসামী দোষী না নির্দোষ।

এরপর বিচারপতি মিঃ ডেভার মামলাটির সব দিক নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখলেন বিশেষ জুরিদের কাছে। আইনগত বিশ্লেষণও দিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। বিচারপতি মিঃ ডেভারের বক্তব্য ও আইনগত বিশ্লেষণ শোনার পর জুরিমহোদয়রা আলাদাভাবে বসলেন আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। রাত অনুমান ৯-২০ মিনিটে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে পুনরায় আদালত কক্ষে প্রবেশ করলেন।

জুরিমহোদয়গণ আদালত কক্ষে প্রবেশ করতেই ক্লার্ক অফ ক্রাউন জুরিদের উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন—

ক্লার্ক অফ ক্রাউন ঃ আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন কি?

ফোরম্যান ঃ হ্যাঁ।

ক্লার্ক অফ ক্রাউন?—আপনারা কি সবাই একমত হয়েছেন?

ফোরম্যান ঃ না।

ক্লার্ক অফ ক্রাউন ঃ আপনাদের মধ্যে ক'জন অভিযুক্ত আসামীর শাস্তির পক্ষে আর কতজন শাস্তির বিপক্ষে?

ফোরম্যান ঃ ৭জন শাস্তির পক্ষে, ২ জন শাস্তির বিপক্ষে।

বিচারপতি ডেভার ঃ আপনারা সবাই কি একমত হতে পারেন না?

ফোরম্যান ঃ মাই লর্ড! আমি দুঃখিত। সকলের একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিচারপতি ডেভার ঃ আমার পক্ষে এই অবস্থায় জুরিগণের বেশিরভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বেশিরভাগ জুরিগণের সাথে একমত হয়ে আমি তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ অভিযুক্ত আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হল।

মিঃ তিলক ঃ জুরিমহোদয়গণ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলেও আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করছি।

বিচারপতি ডেভার ঃ আপনি আর কিছু বলতে চান?

মিঃ তিলক ঃ আমি বলতে চাই দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে আমার কলম কখনই থেমে থাকবে না। জাতির স্বার্থে আমার কলম চলবেই। এই ধরনের বিচার দিয়ে আমাকে বেশিদিন আটক রাখা যাবে না।

শ্রীতিলকের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ দিতে গিয়ে বিচারপতি ডেভার বললেন—

মিঃ তিলক আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডের আদেশ লিখতে আমি আমার হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করছি। আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে মর্মাহত। আমার মনের অভিব্যক্তি এই অবস্থায় বোঝাতে পারব না। আমিও স্বীকার করছি, আপনার মত তেজস্বী ব্যক্তি ও দেশপ্রেমিক খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু এই বিচারালয়ে বিচারকের আসনে বসে আমার পক্ষে আপনার জন্য কিছু করার নেই। তবুও আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য গুণাগুণের জন্য যথাসম্ভব কম মেয়াদের শাস্তির আদেশ দিচ্ছি। আপনার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায় ৩ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল দুই কিস্তিতে। ১০০০ টাকা জরিমানা করা হ'ল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) ধারায়। ১৫৩ (এ) ধারার প্রথম চার্জটি থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হল।

দণ্ডাদেশ ঘোষণা করে বিচারপতি ডেভার আদালত কক্ষ ত্যাগ করলেন।

এই ঐতিহাসিক মামলার রায় হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২২শে জুলাই।

একটি স্মরণীয় রাজদ্রোহের মামলা
(ঢাকা অনুশীলন সমিতিকে নিয়ে)

বিংশ শতকের গোড়ার দিক। এই সময় পরাধীন ভারতের ইংরেজ প্রশাসন নিজেদের স্বার্থে বাংলাকে খন্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইংরেজ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল বহু ছাত্র, কিশোর, যুবক এবং বাংলার দেশপ্রেমিক মানুষ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠেছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রতিবাদের কোন আওয়াজই ইংরেজ প্রশাসনকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারল না। বাংলার মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাকে খণ্ডিত করা হ'ল। সৃষ্টি হ'ল একটি নতুন রাজ্যের। নতুন রাজ্যটির ইংরেজ নামাকরণ হ'ল ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম।

বিদেশী সরকারের প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলার বিভাজন ঘটলেও এই সময় বাংলার যুবশক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ও ক্রোধ। বাংলা বিভাজনের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় এসেছিলেন শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রী পি. মিত্র। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই দুই বাঙালী ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন নেতা। ঢাকায় এসে পৌঁছলে এই দুই নেতৃত্বকে নিয়ে একটি বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। সভার বিশাল সমাবেশে শ্রীবিপনচন্দ্র পাল এবং শ্রীপি. মিত্র ভাষণ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক বাংলাকে খন্ডিত করার বিরুদ্ধে। বাংলার যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশের মুক্তিমন্ত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিতে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রীপুলিনবিহারী দাস সহ বেশ কয়েকজন বাঙালী যুবক এগিয়ে এসেছিলেন দেশের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ নিয়ে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলের বেশ কিছু ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সব ছাত্রদের কলেজিয়েট স্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত ছাত্ররা এই অবস্থায় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়ায় পুলিনবিহারী দাসের প্রচেষ্টায় "ন্যাশনাল স্কুল" নামে একটি নতুন স্কুলের জন্ম হ'ল। ন্যাশনাল স্কুলে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলের বিতাড়িত ছাত্রদের ভর্তি করে নেওয়া হ'ল। এই সময় পুলিনবিহারী দাস থাকতেন ৫০ নম্বর উয়ারিতে। পুলিনবিহারী দাস তাঁর বাসস্থানের সংলগ্ন একটি বাড়ীতে এই ন্যাশনাল স্কুলটির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ন্যাশনাল স্কুলে লেখাপড়ার সাথে সাথে ছাত্রদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, যোগব্যায়াম, শরীরচর্চা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ১৯০৬-০৭ সালে ৫০ নম্বর উয়ারিতে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। পরে অবশ্য ঢাকা অনুশীলন সমিতির একাধিক শাখা সংগঠন বিভিন্ন নামে তৈরি হয়েছিল বাংলার নানা শহরে ও গঞ্জে। ঢাকা অনুশীলন সমিতি ছিল কার্যত একটি

সংগঠন। সমিতির কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মন্ত্রপাঠ করে সমিতির সভ্য হ'তে হ'ত। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের "আদি ও অন্তে" সন্নিবেশিত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ করতে হ'ত সমিতির কর্মসূচী রূপায়ণ করার ব্রত নিয়ে।

১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার উয়াবিতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধে। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে পুলিনবিহারী দাস সহ বেশ ককেজন যুবকের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পুলিনবিহারীর শাস্তি হয়েছিল।

৫০ নম্বর উয়ারির বাড়িটিকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ঢাকা অনুশীলন সমিতির অফিসটিকে ১৯০৮ সালে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় ঢাকার ৪৫২ নম্বর মইসুন্দির বাড়িতে। ঢাকার এই মইসুন্দির বাড়িটি সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত ছিল "ভূতের বাড়ি" বলে। পুলিনবিহারী দাস নিজেও মইসুন্দির বাড়িটির পিছনের অংশে বসবাস করছিলেন।

১৯০৮ সালের ১০ই আগস্ট হঠাৎ পুলিশ তল্লাসী অভিযায় চালায় ঢাকা অনুশীলন সমিতির নতুন বাড়িটিতে। পুলিশি তল্লাসীতে প্রথমবার বাড়িটি থেকে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। পুলিশের কাছে নাকি গুপ্ত খবর ছিল অনুশীলন সমিতির বাড়িতে বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্র লুকানো আছে। মাস দুই আড়াই বাদে দ্বিতীয়বার পুলিশ তল্লাসী করে অনুশীলন সমিতির মইসুন্দির বাড়িটিতে। দ্বিতীয়বারের পুলিশের তল্লাসী অভিযানও ব্যর্থ হল। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। তৃতীয়বার পুলিশের তল্লাসী অভিযান হয় ১৯০৮ সালের ১৫ই নভেম্বর। এইবারের তল্লাসীতে পুলিস ঢাকা অনুশীলন সমিতির বাড়ি থেকে উদ্ধার করে সন্দেহজনক কিছু নথিপত্র, ইস্তেহার, পুস্তিকা প্রভৃতি। পুলিশ প্রশাসনের হাতে অনুশীলন সমিতির গুপ্ত নথিপত্র এসে যাওয়ায় ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারী আদেশে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে সমিতির পক্ষে প্রকাশ্যে কোন কাজকর্ম চালানো সম্ভব ছিল না। ঢাকা অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম চলছিল গুপ্তভাবে।

১৯০৮ সালের জুন থেকে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম নামক নতুন রাজ্যটিতে ৪টি বড় ধরনের ডাকাতি হয়। এর মধ্যে ২টি ডাকাতিতে ডাকাতির সময় ডাকাতরা খুন করে দুই ব্যক্তিকে। পুলিশ প্রশাসন সন্দেহ করেছিল এই সব ডাকাতিতে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা যুক্ত ছিলেন।

এ ছাড়াও পুলিশের কাছে গুপ্ত খবর ছিল অনুশীলন সমিতির সভ্যদের হেফাজতে প্রচুর পরিমাণ বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে। একাধিক ফৌজদারী মামলা এনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল অনুশীলন সমিতি ও তার শাখা সংগঠনের সক্রিয় সভ্যদের। সরকারী প্রশাসনের কাছে খবর ছিল অনুশীলন সমিতির সভ্যরা সমিতির নির্দেশে ডাকাতি করে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করছিল সমিতির কাজকর্ম অব্যাহত রাখার জন্য। তদানীন্তন সরকারী প্রশাসন নিঃসংশয় ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করা। এই উদ্দেশ্যেই সমিতির সভ্যরা তালিম নিতেন লাঠি খেলার, ছোরা খেলার, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার, বোমা বানাবার। এ ছাড়াও অনুশীলন সমিতির সভ্যদের নিয়মিত যোগব্যায়াম ও শরীর চর্চা করতে হত। সভ্যদের এইসব কিছুই করতে হত সমিতির নেতৃত্বের নির্দেশে।

সমিতির কর্মসূচি ও লিখিত নিয়ম নীতি, দলিলপত্র, বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে বুঝতে অসুবিধা ছিল না, পরাধীন মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম

করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্যরা। ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনও অনুমান করতে পেরেছিল সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও সরকারের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক ষড়যন্ত্রমূলক কাগজপত্র প্রশাসনের হস্তগত হওয়ায় সরকার পক্ষ থেকে অনুশীলন সমিতি ও তার শাখা সংগঠনের ৪৪ জন সভ্যের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলাটিতে অভিযোগ পত্রটি পেশ করা হয়েছিল ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) /১২২/১২৩ ধারায়।

অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বময় কর্ণধার পুলিনবিহারী দাস, আশুতোষ দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, গুরুদয়াল দাস, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, রাধিকাভূষণ রায়, ক্ষীরোধচন্দ্র গুহ, শান্তিপদ মুখার্জী, ভূপতিমোহন সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নিশীভূষণ মিত্র, গোপীবল্লভ চক্রবর্তী, প্রমোদবিহারী দাস, শচীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী, যোগেশচন্দ্র রাউৎ, চারুচন্দ্র সেন, মাণিক্য, জ্যোতির্ময়, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, রাধিকা ব্যানার্জী, নিমাইচাঁদ বণিক, নিশিকান্ত বসু চৌধুরী, গোপালচন্দ্র ঘোষ, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, অবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-সহ আরো বেশ কয়েকজন অনুশীলন সমিতি ও তার শাখা সংগঠনের সভ্য। লোকাল গভর্নমেন্টের অনুমোদন নিয়ে শ্রীমনমোহন চক্রবর্তী ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ পত্রটি দাখিল করেছিলেন। ৪৪ জনের বিরুদ্ধে মূল মামলাটির বিচার হলেও সরকারী অনুমোদনপত্রে ৪৭ জন অভিযুক্তর নাম ছিল। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছিল অভিযুক্তরা সকলেই ঢাকা অনুশীলন সমিতি কিংবা তার শাখা সমিতির সভ্য ছিলেন। মামলাটির প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগকারী মনমোহন চক্রবর্তীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি লোকাল গভর্নমেন্টের দেওয়া অনুমোদনপত্রটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করেছিলেন। অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন লোকাল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী। এর পর ফৌজদারী আইনের বিধি ব্যবস্থামত ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিনবিহারী দাস-সহ ৪৪ জন অভিযুক্তকে ঢাকার দায়রা আদালতে সোপর্দ করেন দায়রা বিচারের জন্য। ঢাকার দায়রা বিচারপতি অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতির উপর ন্যস্ত করেছিলেন মামলাটির বিচারের দায়িত্ব। এই ঐতিহাসিক মামলাটিতে ৪৪ জন অভিযুক্ত আসামীর বিচার হয়েছিল ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে। মামলাটির বিচার শুরু হলে সরকারপক্ষ থেকে এগ্‌জিবিটস্ হিসেবে দাখিল করা হয় পুলিশ তল্লাসীতে প্রাপ্ত ইউনিটি লিফলেট্স, পুলিনবিহারী দাসের লেখা পরিদর্শক পুস্তিকা, আদি ও অন্ত মন্ত্রের বই, অনুশীলন সমিতির কর্মসূচি এবং সমিতির লিখিত নিয়ম-নীতি। এ ছাড়াও আদালতে দাখিল করা হয়েছিল বাংলা বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৈরি করা কিছু কাগজপত্র, বিভিন্ন দলিল দস্তবত, বিপ্লবী পুস্তিকা, গুপ্ত নির্দেশনামা প্রভৃতি।

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা আদালত মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ, উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে রায় দান করেছিলেন ১৯১১ সালের ৭ই আগস্ট। ৪৪ জন অভিযুক্ত আসামীর মধ্যে ৩৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন অতিরিক্ত দায়রা আদালত। ৮ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। দণ্ডিত আসামীদের শাস্তির মেয়াদ ছিল তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত।

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে ৩৫ জন দণ্ডিত আসামী কলকাতা

হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন ১৯১১ সালে। একজন দণ্ডিত আসামী ইতিমধ্যে পাগল হয়ে যাওয়ায় তাঁর পক্ষে কোন আপিল দায়ের করা হয়নি।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিল মামলার শুনানি হয়েছিল তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চে। বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন স্যার রিচার্ড হেরিংটন, স্যার আশুতোষ মুখার্জী এবং ক্যাশপার্ড্র।

দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল করেছিলেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীসি. আর. দাশ। সঙ্গে ছিলেন শ্রী এন. সে. সেন এবং শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

সরকার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ ডাব্লু. গার্থ। মিঃ গার্থের সঙ্গে ছিলেন শ্রী বি. সি. মিটার, শ্রী ই. পি. ঘোষ, শ্রী এন. গুপ্ত এবং শ্রীমণীন্দ্রলাল ব্যানার্জী।

পুলিশি তল্লাসীতে পাওয়া 'ইউনিটি লিফলেট্‌টি' বিচারের সময় দায়রা আদালতে দাখিল করা হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে। 'ইউনিটি লিফলেটে' উল্লেখ ছিল কিভাবে জাতীয় এবং সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। জাতীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা পেতে গেলে প্রত্যেক সভ্যকে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মনোভাবকে সমিতির নেতৃত্বের কাছে সমর্পিত করার আহ্বান ছিল 'ইউনিটি লিফলেটে'। আরো নির্দেশ ছিল মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে গেলে প্রতিটি সভ্যকে নেতৃত্বের নির্দেশিত পথে চলতে হবে। নেতৃত্বে যে কেউ থাকুন না কেন, কোন প্রশ্নের অবতারণা না করে তাঁর নির্দেশ আনুগত্যের সাথে মানতে হবে সমিতির সভ্যদের।

"পরিদর্শক" পুস্তিকাটিকে এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে। "পরিদর্শক" লিখেছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপুলিনবিহারী দাস। অনুশীলন সমিতির কর্মসূচী লিপিবদ্ধ ছিল পরিদর্শক পুস্তিকাটিতে। "পরিদর্শকের" শিরোদেশে লেখা ছিল—"কোন কাজে ব্রতী হওয়ার আগে মনোযোগের সাথে পরিদর্শক পাঁচবার পড়তে হবে।"

মামলায় এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ ছিল—"To Proceed to work after reading this work five times with attention."

পরিদর্শককে পুস্তিকা না বলে বরং বলা যায় একটি রচনা। ঢাকা অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিদর্শক থেকে পাওয়া যায়। পরিদর্শকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল সমিতির সভ্যদের কিভাবে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতে হবে। কিভাবে তাদের বিভিন্ন কাজে ব্রতী হতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় সমিতির গুপ্ত খবর পৌঁছানোর প্রয়োজন দেখা দিলে তা কখনই ডাকযোগে করা চলবে না। সভ্যরা নিজেরা যথাস্থানে পৌঁছে খবর পরিবেশন করবে। "পরিদর্শকে" পরিষ্কার নির্দেশ ছিল স্বদেশীদের সাথে বাহ্যিকভাবে কোন ঘনিষ্ঠতা থাকবে না সমিতির সভ্যদের। স্বদেশীদের বিদেশী সামগ্রী বর্জন আন্দোলন সফল করা অনিশ্চিত বলে মনে করা হয়েছিল; কারণ দেশের মাটিতে বিদেশী সরকার বর্তমান। বিদেশী সরকারকে দেশের মাটি থেকে তাড়াতে না পারলে বিদেশী দ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবুও সমিতির সদস্যদের যথাসম্ভব বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে সচেষ্ট হতে বলা ছিল "পরিদর্শকে"।

এর পরের অংশে লেখক "পরিদর্শকে" উল্লেখ করেছিলেন কেন মুসলমানদের সমিতির সদস্য করা হবে না। মুসলমানদের সমিতির সভ্য হতে না দেওয়ার যুক্তি ছিল—"যখন সমগ্র মুসলমান জাত আমাদের বিরুদ্ধে, তখন এক বা দুইজন মুসলমানকে সমিতির সভ্য হিসেবে যোগ দিতে দিলে সমিতির বিশেষে কোন লাভ হবে না।"

মামলায় এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ ছিল—

"When entire Mussalman race is against us. it will not be particularly profitable to us if one or two Mussalmans join our band."

"পরিদর্শকে' এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য পংক্তি ছিল। এই পংক্তিটিতে বলা হয়েছিল, "যদি এমন হয় যে সমগ্র মুসলমান জাত হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ওঠেন কিংবা তাঁরা ইংরেজদের সাথে যোগ দেন এবং আমাদের সমিতির মুসলমান সভ্যদের মা-বাবারা ও আত্মীয়-স্বজনেরা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেন, তখন আমাদের সমিতির মুসলমান সভ্যদের মতিগতির কী মোড় নেবে তা দু-পক্ষের সামনেই একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২/৪ জন মুসলমান ছাত্রকে সমিতির সভ্যদের সাথে লাঠিখেলা শিখতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। কারণ মুসলমান ছাত্ররা চলে যাওয়ার আগে সমিতির অনেক গুপ্ত মন্ত্রের কথা জেনে যাবেন।"

পরিদর্শকের এই বিশেষ অংশটির ইংরেজি অনুবাদ ছিল—

"If it so happens that the Mussalmans grow violent against the Hindus, or if they join with the English, and if the parents and relatives of the Mussalmans who have joined our band stand against us, then what course will all these Mussalman members adopt is a question to be considered by both sides. It will not be of any good to us, if two or four Mussalmans students come and play Lathi with us and then go away ; they will simply go away with a knowledge of some our secret mantras."

অনুশীলন সমিতির অফিসটি তল্লাসীর সময় পুলিশ একটি "বিজ্ঞপ্তি" উদ্ধার করেছিল। বিজ্ঞপ্তিটিকে মামলায় এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিটিতে সভ্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল—তাঁরা যেন সমিতির আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে নির্দেশিত নিয়মকানুন মেনে চলেন।

সমিতির লাইব্রেরী থেকে পুলিশ সন্দেহজনক দুটি বই নিয়েছিল। বই দুটির নাম ছিল, "দি মডার্ন আর্ট অফ ওয়ার" এবং "মুক্তি কোন পথে"।

এ ছাড়াও সমিতির লাইব্রেরী থেকে পাওয়া গিয়েছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকিকে নিয়ে লেখা একাধিক বিপ্লবী কবিতা।

সমিতির সভ্যদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল, সমিতির কাজকর্ম যেন ইংরেজ প্রশাসনের কাছে গুপ্ত থাকে। আধা মিলিটারি কায়দায় সমিতির সভ্যদের ট্রেনিং দেওয়া হ'ত।

"আদি ও অন্ত" পুস্তিকায় সন্নিবেশিত ছিল বিভিন্ন মন্ত্র। অনুশীলন সমিতির সভ্যরা প্রতিদিন "আদি ও অন্ত" থেকে মন্ত্র পাঠ করে নির্দিষ্ট কাজে ব্রতী হতেন। "আদি ও অন্ত" পুস্তিকাটি মামলায় দাখিল করা হয়েছিল। বিভিন্ন এগ্‌জিবিটস্ করা নথিপত্র ছাড়াও রাজদ্রোহের মামলাটিতে অনুশীলন সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সমিতির চরিত্র বোঝাতে সরকার পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে টানা হয়েছিল। সেইসব ঘটনা থেকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী চরিত্র অনুমান করা যায়।

১৯০৮ সালের ২রা জুন থেকে ১৯১০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০টি বিশেষ ঘটনার কথা জানা যায়। এই ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল—"বরা ডাকাতি", "সতিপাড়া নৌকাচুরি", "নরিয়া ডাকাতি", "রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি", "দরিয়াপুর ডাকাতি", "সুকুমারকে হত্যা" এবং "প্রিয়মোহনকে হত্যা।" এই সময়সীমার মধ্যে ঢাকার আদাপুরের একটি মুদির দোকান থেকে পাওয়া গিয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র এবং মুন্সিগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল একাধিক মারাত্মক ধরনের বোমা।

সরকারপক্ষের অভিযোগ ছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যরা এই সব অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।

বরা ডাকাতি হয় ১৯০৮ সালের ২রা জুন। ডাকাতি হয়েছিল শ্রীশশী সরকারের বাড়ীতে। ডাকাতি করার সময় ডাকাতদের মুখে ছিল মুখোশ। তাই ডাকাতদের চেনা সম্ভব হয়নি। সাক্ষীরা বলেছিল, ডাকাতরা সব ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোকরা ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করায় ধরে নেওয়া হয়েছিল অনুশীলন সমিতির সভ্যরা তাঁদের সমিতির স্বার্থে বরা ডাকাতিটি করেছেন।

দরিয়াপুরেও একই ভাবে ডাকাতি করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্যে দেখা যায়, ডাকাতরা ছিলেন সব ভদ্রলোক।

১৯০৮ সালের ১৪ই আগস্ট সতিপাড়ায় নৌকা চুরি হয়। চুরি যাওয়া নৌকাটি ছিল নীলমণি নামে এক মাঝির। সতিপাড়া নৌকা চুরিতে অনুশীলন সমিতিব যদু, বিনোদ ও ত্রৈলক্যকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৯০৮ সালের ১৩ই নভেম্বর সুকুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় গলা পচা অবস্থায়। অভিযোগ ছিল সুকুমারকে হত্যা করেছে সমিতির সদস্যরা। সমিতির নেতৃত্বের নাকি সন্দেহ ছিল সুকুমারের উপর। তিনি নাকি সমিতির অনেক গুপ্ত খবর পাচার করেছেন ইংরেজ সরকারের প্রশাসনের কাছে।

১৯০৯ সালের ২রা জুন "প্রিয়মোহনকে" "গোবেশ" ভেবে ভুল করে হত্যা করা হয়েছিল। গোবেশের উপর সন্দেহ হয়েছিল তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়ে সমিতির গুপ্ত খবর বলে দিতে পারেন। কারণ গোবেশকে পুলিশ জামিনে ছেড়েছিল গোবেশের কাছ থেকে জবানবন্দি আদায় করার উদ্দেশ্যে। গোবেশ নাকি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিতে রাজী হয়েছিলেন। প্রিয়মোহন ছিলেন গোবেশের ছোট ভাই। হত্যাকারীরা গোবেশকে সঠিক ভাবে চিনতেন না। গোবেশ বাড়ীতে ছিলেন না। বাড়ীতে ছিলেন তাঁর ছোট ভাই প্রিয়মোহন। প্রিয়মোহনকে গোবেশ ভেবে হত্যা করা হয়েছিল।

মামলায় এগ্‌জিবিট করা নথিপত্র, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দু-পক্ষের সওয়াল ও আইনগত দিক বিচার-বিবেচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট পুলিনবিহারী সহ ১৪ জন দণ্ডিত আসামীর আপীল খারিজ করে দিয়েছিলেন।

এই ১৪ জন দণ্ডিত আসামীর মধ্যে ছিলেন পুলিনবিহারী দাস, আশুতোষ দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, গুরুদয়াল দাস, প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, রাধিকাভূষণ রায়, ক্ষীরোধচন্দ্র গুহ, শান্তিপদ মুখার্জী, ভূপতিমোহন সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নিশিভূষণ মিত্র, গোপীবল্লভ চক্রবর্তী এবং প্রমোদবিহারী দাস।

হাইকোর্টের বিচারে ১৪ জন বাদে সবাই মুক্তি পেয়েছিলেন। হাইকোর্ট পুলিনবিহারীকে দিয়েছিলেন ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আশুতোষ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতির্ময়কে দেওয়া হয়েছিল ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। বঙ্কিমচন্দ্র রায় এবং গুরুদয়াল দাসকে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত, রাধিকাভূষণ রায়, ক্ষীরোধচন্দ্র গুহ, শান্তিপদ মুখার্জী এবং ভূপতিমোহন সেনগুপ্তের। ২ বছরের জন্য সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নিশিভূষণ মিত্র, গোপীবল্লভ চক্রবর্তী এবং প্রমোদবিহারী দাসকে।

এইভাবে কলকাতা হাইকোর্ট ঐতিহাসিক মামলাটির রায় দিয়েছিলেন ১৯১২ সালের ২রা এপ্রিল।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?"

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথিটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দেশের মুক্তিমন্ত্রে সমর্পিত বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে যে সব দেশপ্রেমিক বিপ্লবী যুবক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে বিভিন্ন রাজদ্রোহিতার মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে উঠেছিলেন তাদের অনেকের নামই জানেন না বর্তমান প্রজন্মের বহু মানুষ। এমনকি বর্তমান কালের অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ানো বীর শহিদদের কথা। ক্ষুদিরাম বোস বা সূর্য সেনের মত গুটিকয়েক বিপ্লবীর কথা মনে রাখলেও বাকিরা রয়ে গিয়েছেন গভীর অন্ধকারে। পুরানো দিনের লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ বা মনে রেখেছেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বা সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে। কিন্তু আজ অনেকেই জানেন না দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ বা বসন্তকুমার বিশ্বাসের বিপ্লবী জীবনের কথা।

স্মৃতিবিমুখ ভারতবাসীর কথা ভেবেই কি বিদ্রোহী কবি লিখেছিলেন—

"গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।"

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ১১ জন বিপ্লবীকে ১৯১৪ সালে দিল্লীর দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১২০(বি) এবং ৩০২/১০৯ ধারায়। মামলাটিতে অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, বলরাজ, বসন্তকুমার বিশ্বাস, হনয়ান্ত সহায়, রামলাল, চরণ দাস, মন্নুলাল, রঘুবীর শর্মা এবং খুশীরাম।

অভিযুক্ত ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা ১৯১৩ সালের ২৭শে মার্চ থেকে ১৯১৪ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে দিল্লী, লাহোর এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু জায়গায় দীননাথ, সুলতানচাঁদ, রাসবিহারী বোস, হরদয়াল, অর্জুনলাল শেঠী, হরিরাম শেঠী এবং আরো অনেকের সাথে মিলে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯১৩ সালের ১৭ই মে রাম পদারথকে হত্যা করা হয়েছিল।

দিল্লীর দায়রা আদালতে অভিযুক্তদের বিচার শুরু হয়েছিল ২১শে মে, ১৯১৪। মামলা শুরু হওয়ার পর এক নাগাড়ে সাক্ষ্যসাবুদ, সওয়াল জবাব চলেছিল ১৯১৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দিল্লীর দায়রা আদালত মামলাটির রায় দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালের ৫ই অক্টোবর। ১১ জন অভিযুক্তর মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই ৫ জন মুক্তি পাওয়া অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ছিলেন রামলাল,

চরণ দাস, মন্নুলাল, রঘুবীর শর্মা এবং খুসীরাম। বাকি ৬ জন অভিযুক্ত আসামী অর্থাৎ অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, বলরাজ, হনয়ান্ত সহায় এবং বসন্তকুমার বিশ্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন দায়রা আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১২০(বি) ধারায়। অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ এবং বালমুকুন্দকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

অবোধবিহারী এবং আমীরচাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনেও অপর একটি অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল অভিযুক্ত দুজন বোমা তৈরি করে সেই বোমা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। এই অভিযোগটিও প্রমাণিত হওয়ায় অবোধবিহারী ও আমীরচাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল আলাদাভাবে।

মামলার নথি থেকে প্রকাশ ১৯১৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই অক্টোবর অবোধবিহারী ও আমীরচাঁদের হেফাজত থেকে পাওয়া গিয়েছিল বোমার ক্যাপ। ৬ জন দণ্ডিত আসামী (৩ জন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং ৩ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত) আলাদা আলাদা ভাবে ৬টি আপিল দায়ের করেছিলেন পাঞ্জাবের চিফ্ কোর্টে। অন্য দিকে মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী চরণ দাসের মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকেও ১টি আপিল দায়ের করা হয়েছিল পাঞ্জাবের চিফ্ কোর্টে। এ ছাড়াও সরকার পক্ষ থেকে একটি আবেদন পেশ করে বলা হয়েছিল বসন্তকুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতের দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের বদলে তাকে দেওয়া হউক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। এই আবেদনের ভিত্তিতে পাঞ্জাব চিফ্ কোর্ট একটি রুল জারি করেছিলেন। রুল জারি করে বসন্তকুমার বিশ্বাসকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের বদলে কেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না?

পাঞ্জাব চিফ্ কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ একসাথে ৭টি আপিল এবং জারি করা রুলটি শুনেছিলেন। পাঞ্জাব চিফ কোর্ট সব কয়টি আপিল এবং রুল একসঙ্গে করে রায় দান করেছিলেন ১৯১৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

দীননাথ নামে এক অভিযুক্ত মামলায় নিজেকে হত্যা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন বলে স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টলিন্টনের কাছে। সুলতানচাঁদও স্বীকারোক্তি করেছিলেন দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাটিতে। মিঃ টলিন্টন দীননাথ এবং সুলতানচাঁদের স্বীকারোক্তি আইন মোতাবেক নথিভুক্ত করে নিয়েছিলেন। পরে দীননাথকে ক্ষমাপ্রদর্শন করে সরকার পক্ষ থেকে তাকে রাজসাক্ষী করে নেওয়া হয়েছিল। সুলতানচাঁদকেও ক্ষমা প্রদর্শন করে তাঁকে রাজসাক্ষী করে নেওয়া হয়েছিল।

অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ থাকলেও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) এবং ১২৪(এ) ধারায় কোন অভিযোগ (চার্জ) গঠন করা হয়নি। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে চার্জ গঠন করতে বা মামলা চালাতে প্রয়োজন ছিল সরকারী অনুমোদনের (Sanction)। বোধ হয় প্রয়োজনীয় অনুমোদন না থাকায় রাজদ্রোহিতার কোন অভিযোগ সোজাসুজি আনা হয়নি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথিটি থেকে সাক্ষ্য-সাবুদ দেখে আপিল আদালত বলেছিলেন অভিযুক্তদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইউরোপীয়ানদের এবং ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আমলাদের হত্যা করা। মামলাটিতে দীননাথের দেওয়া একাধিক বারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল দিল্লী ও লাহোরের নানা ষড়যন্ত্রের কথা।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দীননাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টলিন্টনের কাছে তিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪। পুলিশ ও প্রশাসনের অজানা অনেক ঘটনার কথা বেরিয়ে এসেছিল দীননাথের দেওয়া স্বীকারোক্তি থেকে।

সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে প্রকাশ দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রে অবোধবিহারী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংরেজ শাসনের অবলুপ্তির নীতিকে। পরাধীন দেশের মুক্তিমন্ত্র ছিল অবোধবিহারীর ধ্যান জ্ঞান ও ব্রত।

অবোধবিহারী ছিলেন একজন ২৫ বছর বয়সের বুদ্ধিদীপ্ত যুবক। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-টি পরীক্ষায় তিনি প্রথম ডিভিশনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। অবোধবিহারী ছিলেন আমীরচাঁদ এবং রাসবিহারী বোসের বন্ধু। বিশেষত এই তিনজনের নেতৃত্বে দিল্লী-লাহোরে হত্যা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছিল। অবোধবিহারী আমীরচাঁদের সহযোগিতায় মে এবং জুলাই মাসের 'লিবার্টি' লিফলেটের বয়ান তৈরি করেছিলেন। এই লিফলেটে প্রধানত ছিল বিপ্লবীদের নেওয়া কার্যবিবরণী, ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইউরোপীয়ানদের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজক বক্তব্য। 'লিবার্টি' ইস্তাহারের ২২ কপি নভেম্বর সংখ্যা এবং ৩৫ কপি 'OM' ইস্তাহার পুলিশি তল্লাসীতে পাওয়া গিয়েছিল আমীরচাঁদের বাড়ীতে রাখা অবোধবিহারীর বাক্স থেকে। রাসবিহারী বোস দিল্লী-লাহোর হত্যা ষড়যন্ত্রের প্রধান পরিকল্পনা রচয়িতা হলেও অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ থেকে রাসবিহারীকে পুলিশের স্পাই হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে এবং আসামীদের স্বার্থে। আসামীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও অন্যান্যদের দিল্লী লাহোর ষড়যন্ত্রে জড়ানোর জন্যই রাসবিহারীকে দিয়ে অবোধবিহারীর বাক্সে 'লিবার্টি' লিফলেটস্ রাখা হয়েছিল। অবোধবিহারীর অজান্তে এই লিফলেটস্ রাখা হয়েছিল তার বাক্সে। এ ছাড়াও আরো কিছু সন্দেহজনক জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল তাঁর বাক্সে তাঁকে মিথ্যা করে মামলায় জড়ানোর উদ্দেশ্যে। সুলতানচাঁদ ছিলেন আমীরচাঁদের দত্তক পুত্র। এই সুলতানচাঁদকেও দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুলতানচাঁদও দীননাথের মত স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তাকেও মামলায় রাজসাক্ষী করা হয়েছিল। সুলতানচাঁদ মামলায় তাঁর সাক্ষ্যতে দায়রা আদালতে বলেছিলেন তার বাবা আমীরচাঁদের সাথে অবোধবিহারীর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সুলতানচাঁদ আরো বলেছিলেন অবোধবিহারী লিবার্টি লিফলেটের নভেম্বর সংখ্যার কিছু কপি তাকে দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। 'লিবার্টি' লিফ্‌লেটস্ তাকে দেওয়া হয়েছিল বিলি করার জন্য। দীননাথ সমগ্র ষড়যন্ত্রটি নিয়ে যে ধরনের দীর্ঘ স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা থেকে পাওয়া যায় অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বসন্তকুমার বিশ্বাস ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের একটি পরিষ্কার ছবি। অবোধবিহারীর বিরুদ্ধে দীননাথের দেওয়া সাক্ষ্য দায়রা আদালত এবং আপিল আদালত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ দীননাথের সাক্ষ্যর সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য সাবুদের মিল ছিল।

রাসবিহারী বোস দিল্লীতে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন অবোধবিহারীর সাথে। সেই সময় তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন আমীরচাঁদের বাড়িতে। মামলার নথি থেকে প্রকাশ অবোধবিহারী ১৯০৮ সাল থেকে আমীরচাঁদের দিল্লীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। তাদের দু-জনের মধ্যে

বিপ্লবী ভাবনা চিন্তা নিয়ে নানারকম আলাপ-আলোচনা হত। অবোধবিহারীর বাক্স থেকে পাওয়া গিয়েছিল 'পয়জন ম্যানুয়াল' (Poison Mannual)। তিনি আমীরচাঁদের বাড়িতে বোমার ক্যাপ এনে রেখেছিলেন।

অবোধবিহারীর শাস্তির যৌক্তিকতা বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আপিল আদালত।

প্রথমত, অবোধবিহারীর সাথে আমীরচাঁদের ছিল বিশেষ বন্ধুত্ব। তাদের দু-জনের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ ছিল। এমনকি অবোধবিহারী তাঁর লিখিত জবানবন্দিতে আমীরচাঁদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন। দীননাথের সাক্ষ্যতেও অবোধবিহারীর সাথে আমীরচাঁদের বন্ধুত্বের কথা বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, অবোধবিহারী ও আমীরচাঁদের সাথে যোগাযোগ ছিল বিপ্লবী হরদয়াল এবং হনয়ান্ত সহায়ের। এঁদের মধ্যে ছিল গভীর সম্পর্ক। এঁরা সবাই ছিলেন বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত।

তৃতীয়ত, এইসব বিপ্লবী নেতৃত্ব দলে টেনেছিলেন সুলতানচাঁদ, রামলালের মত যুবকদের। এইসব দলে টানা যুবকদের মধ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করেছিলেন বিপ্লবী নেতৃত্ব। উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ রাখতে।

চতুর্থত, অবোধবিহারীর সঙ্গে 'আকাশ' পত্রিকার সম্পাদক গণেশলালের সাথে যোগাযোগ ছিল। 'আকাশ' পত্রিকা নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করত। সেজন্য বিপ্লবীরাও 'আকাশ' পত্রিকা খুব মনোযোগ সহকারে পড়তেন। 'আকাশ' পত্রিকায় নানা কায়দায় ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক নিবন্ধ ছাপা হ'ত।

পঞ্চমত, সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছিল প্রকাশিত মে ও জুলাই লিফ্‌লেটের রচয়িতা ছিলেন অবোধবিহারী নিজে।

ষষ্ঠত, অবোধবিহারীর বিপ্লবী কাজকর্মের পরামর্শদাতা ছিলেন আমীরচাঁদ। বিপ্লবী কাজকর্ম নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, ইস্তাহার তৈরির ব্যাপারে অবোধবিহারী সব সময় আমীরচাঁদের সাহায্য নিতেন।

সপ্তমত, আমীরচাঁদের বাড়িতে রাখা অবোধবিহারীর বাক্স থেকে এবং আমীরচাঁদের একটি দরজা বন্ধ ঘরে থেকে পুলিশি তল্লাসীতে পাওয়া গিয়েছিল বোমার ক্যাপ।

অষ্টমত, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল আমীরচাঁদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা বোমার ক্যাপগুলির সাথে রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় উদ্ধার করা বোমার ক্যাপগুলির সাথে হুবহু মিল ছিল।

দীননাথের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় লাহোরে বোমা বিস্ফোরণের মূল পরিকল্পনাটি ছিল অবোধবিহারীর। এ ছাড়াও সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে অবোধবিহারী লাহোরে এসেছিলেন এবং বসন্তকুমার বিশ্বাসের সাথে তাঁর বোমা বিস্ফোরণ করা নিয়ে শলাপরামর্শ হয়েছিল। বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য বসন্তকুমারের কাছে রাখতে দেওয়া হয়েছিল বোমা।'

' রাজসাক্ষী দীননাথ তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে আগরয়াল আশ্রমে বিপ্লবীদের নিয়ে একটি গুপ্তসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আশ্রমের এই গুপ্তসভায় যোগ দিয়েছিলেন. রাসবিহারী বোস, দীননাথ, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী এবং আরো অনেকে। আশ্রমের সভায় ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নেতৃত্বের ভার অর্পণ করা হয়েছিল এক এক জনের

উপর। অবোধবিহারী নিজে দায়িত্বে ছিলেন ইউনাইটেড্ প্রভিন্স ও পাঞ্জাবের। লাহোরের দায়িত্বে ছিলেন দীননাথ এবং বালমুকুন্দ। চরণ দাসের কাছ থেকে রাসবিহারীর লেখা একটা চিঠি উদ্ধার করা হয়েছিল। চিঠিটির ওপর তারিখ লেখা ছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২। নানা চিঠিপত্র থেকে এবং সাক্ষ্য সাবুদ থেকে জানা গিয়েছিল রাসবিহারী বোস লাহোরে এসেছিলেন ১৯১২ সালের ১৩ই অক্টোবর এবং লাহোর ত্যাগ করেছিলেন ১৭ই অক্টোবর।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথি থেকে প্রকাশ আমীরচাঁদ ছিলেন দিল্লীর মানুষ। দিল্লীতেই তিনি থাকতেন। দিল্লীর শিক্ষিত সমাজে আমীরচাঁদ ছিলেন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবান মানুষ। সরকার পক্ষের ১০৭নং সাক্ষী ছিলেন মিঃ ক্যানন অ্যালনট্। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, ১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ সালে আমীরচাঁদ মিশন কলেজ এবং স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই সময় মিঃ অ্যালনট্ আমীরচাঁদকে সতর্কিত করে দিয়ে বলেছিলেন—তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারলে তাঁর পক্ষে ভাল হয়। কিন্তু বাস্তবে আমীরচাঁদ গভীরভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবোধবিহারী ছিলেন আমীরচাঁদের বিশেষ বন্ধুলোক। রাসবিহারী দিল্লীতে এসে সাধারণত থাকতেন আমীরচাঁদের দিল্লীর বাড়িতে। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারী এসে বেশ কয়েকদিন থেকেছিলেন আমীরচাঁদের বাড়ীতে। হরদয়াল তাঁর দুই শিষ্য সুলতানচাঁদ এবং রামলালকে দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন আমীরচাঁদের কাছে বিপ্লবী কাজকর্মে তালিম নেওয়ার জন্য। আমীরচাঁদ হরদয়ালের নির্দেশমত সুলতানচাঁদ এবং রামলালকে বিপ্লবী কাজকর্মে শামিল হওয়ার জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি এই দুই শিষ্যকে নিজের বাড়ীতেই রেখেছিলেন। সুলতানচাঁদকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আমীরচাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কাজকর্মে সুলতানচাঁদ এবং রামলাল অন্যান্যদের সাথে নিজেদেরও নিয়োজিত করেছিলেন। রাজসাক্ষী সুলতানচাঁদ তাঁর সাক্ষ্যে স্বীকার করেছিলেন ১৯১৩ সালের নভেম্বর লিফলেটটি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমীরচাঁদ সক্রিয়ভাবে অবোধবিহারীকে সাহায্য করেছিলেন। সুলতানচাঁদ স্বীকার করেছিলেন আমীরচাঁদের বাড়ির একটি বন্ধ ঘর থেকে বোমার ক্যাপ পাওয়া গিয়েছিল।

বলরাজ সম্বন্ধে মামলার নথি থেকে পাওয়া যায় তিনিও দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'লিবার্টি' লিফলেট বিলির দায়িত্বে ছিলেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় রাসবিহারী বোস ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকদিনের জন্য খুশীরামের বাড়ীতে ছিলেন। রাসবিহারীর খুশীরামের বাড়িতে থাকার কথা কয়েকজনমাত্র উপর সারির বিপ্লবী ছাড়া অন্য কেউ জানতেন না। এই সময় অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ বলরাজ রাত ১০টার সময় খুশীরামের বাড়িতে গিয়েছিলেন রাসবিহারীর সাথে দেখা করতে। দীননাথও তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন তিনি বলরাজকে সর্বপ্রথম দেখেছিলেন ১৯২২ সালের জুলাই মাসে 'নবাহাউসে'। বলরাজকে দীননাথের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসবিহারী বোস। বলরাজ ছিলেন রাসবিহারীর একান্ত অনুগামী শিষ্য।

বলরাজ ছিলেন ২৪ বছর বয়সের একজন গ্রাজুয়েট যুবক। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় ১৯১৩ সালের মে মাসের ষড়যন্ত্রের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। বলরাজের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল তিনি অন্যান্যদের সাথে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। দীননাথের সাক্ষ্য বাদ দিলে বলরাজকে প্রথম অন্যান্যদের সাথে দেখা যায় ১৯১২ সালের ৯ই অক্টোবর। দীননাথ অবশ্য তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন ১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালে যখন রাসবিহারী বোস

লাহোরের 'নবাহাউসে' এসেছিলেন, সেখানে রাসবিহারীর সাথে বলরাজকে দেখা গিয়েছিল। মামলার নথি থেকে প্রকাশ বলরাজ ১৯১২ সালের ৯ই অক্টোবর যোধপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তিনি যোধপুরের মহারাজার পুত্রের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বলরাজ যোধপুরে পৌঁছেছিলেন ১২ই অক্টোবর। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বলরাজের আগরয়াল আশ্রমের সভায় উপস্থিত থাকার গল্প মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বলরাজ রাজপুত্র ও মিসেস্ উইন্ডহামের সাথে কাশ্মীরে ছিলেন। স্বভাবতই সেই ক্ষেত্রে বলরাজের সঙ্গে মে এবং জুলাই লিফলেটের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা এবং লাহোরের হত্যাকাণ্ডের সাথে যোগাযোগের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। যোধপুরের মহারাজের কাছ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে বলরাজ এক বছরের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। এরপর তিনি সরকারী কলেজে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর জেনারেল প্রতাপ সিংয়ের পুত্র প্রিন্স নরপত সিংয়ের আমন্ত্রণে বলরাজ মুসৌরী গিয়েছিলেন। ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রিন্স নরপতের সাথে পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন। ২৭শে নভেম্বর ফিরে এসেছিলেন লাহোরে; ছিলেন ১৯১৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত। এর পর যোধপুরে আবার ফিরে গিয়েছিলেন ১৯১৪ সালের ২১শে জানুয়ারী। ২০শে ফেব্রুয়ারীতে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত বলরাজ যোধপুরেই ছিলেন।

বলরাজের ব্যাপারে আপিল আদালত কিছু আইনগত অসুবিধার কথা বিচার-বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী বলরাজের আইনজীবীকে উদ্দেশ করে বললেন—বলরাজকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা দায়রা আদালতের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। দণ্ডিত আসামী রাজী থাকলে তাকে দেওয়া যেতে পারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৫ ধারায় শাস্তি। ১১৫ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তির পরিমাণ ছিল ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড। সুতরাং বলরাজের বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রদ করে তাঁকে দেওয়া যেতে পারে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। বলরাজ আপিল আদালতের মতামত মেনে নেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাতিল করে তাকে দেওয়া হয়েছিল ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

হরদয়াল সম্বন্ধে দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথি থেকে দেখা গেল, তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। ১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ সাল থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য হরদয়াল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। মামলায় হরদয়ালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর সাথে গভীরভাবে যোগাযোগ ছিল রাসবিহারী, অবোধবিহারী এবং আমীরচাঁদের। এরা সবাই একই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইউরোপীয়ান এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আমলা হত্যার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এইসব বিপ্লবীরা। রাজসাক্ষী দীননাথের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসের গুপ্তসভায় বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। হরদয়াল সেই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া লিখিত ইস্তাহারে গর্ববোধ করা হয়েছিল কানাইলাল দত্ত, মদনলাল ডিংরা ও ক্ষুদিরামের বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্বন্ধে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছিল কলেজ স্কোয়ারের হেড্ কনস্টেবল হত্যা এবং ময়মনসিংয়ে পুলিস ইন্‌সপেক্টার হত্যা নিয়ে।

১৯১৩ সালের ১৭ই মে দিল্লী শহরে হত্যার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সরকারী প্রশাসনের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল তা বুঝতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কোন অসুবিধা হয়নি। দীননাথের স্বীকারোক্তি থেকে পাওয়া

যায়, মে মাসের লিফলেটে ছিল ইউরোপীয়ান ও সরকারী আমলা হত্যার পরিকল্পনার কথা। জুলাই মাসের লিফলেটে বলা হয়েছিল কাপুড়থালায় ভাইস্‌রয়কে হত্যার পরিকল্পনার কথা। এ ছাড়াও ছিল মিঃ গর্ডন এবং স্যার জেমস্ সেপ্টনের সাথে আলোচনার কথা।

নভেম্বর মাসের লিফলেটে ছিল লাহোরে ক্রিসমাস ড্যান্সের সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনার কথা।

আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, হরদয়াল প্রভৃতি বিপ্লবী নেতৃত্ব সদ্য দলে যোগ দেওয়া যুবকদের মনে ধারণা সৃষ্টি করে দিতেন ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনই নিজেদের স্বার্থে তৈরি করেন খরা, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ পরিকল্পিতভাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করেন সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও দৈন্যতা। সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালান ভারতের মাটিতে ব্রিটিশরাজ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে। ব্রিটিশরাজের এই অপশাসন থেকে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে মুক্ত করতে চাইলে দেশের যুব সম্প্রদায়কে বিপ্লবের পথে নামতে হবে। ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির শপথ নিয়ে জীবনপণ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যুবকদের। এইভাবে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন বিপ্লবী চেতনা সঞ্চার করার জন্যে। বিপ্লবীদের উপর এমন কি নির্দেশ ছিল প্রয়োজনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে যুক্ত আমলাদের হত্যা করার।

আমীরচাঁদের বাড়ীতে রাখা অবোধবিহারীর বাক্স থেকে কিছু লেখা কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। আমীরচাঁদের নিজের হাতে একটি কাগজে লেখা ছিল—

"The cursed foreign yoke of thc English Devils."

"The Common foes of all Indians...Sucking our life blood"

"We are so many that we can seize and snatch from them their Cannon".

"Reforms will not do. Revolution and a general massacre of all the foreigners, specially the English will and can alone serve the purpose".

এইসব লেখা থেকে বোঝার কোন অসুবিধা ছিল না, কি উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবীরা এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী বালমুকুন্দের বিরুদ্ধে দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যে ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ এসেছিল তার সাথে দীননাথের স্বীকারোক্তিতে দেওয়া কাহিনীর মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বালমুকুন্দ ছিলেন দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। দীননাথের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় ১৯১২ সালের অক্টোবরে আগরয়াল আশ্রমের সভায় বালমুকুন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বালমুকুন্দকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হত্যার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার। এ ছাড়াও 'লিবার্টি' লিফলেটের বিলি বন্দোবস্ত করার দায়িত্বও ছিল বালমুকুন্দের উপরে। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায় বালমুকুন্দ ছিলেন আমীরচাঁদের কাছের একজন বন্ধু। লাহোরের হত্যাকাণ্ডের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। দীননাথ আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন তিনি ২টি বোমা পেয়েছিলেন বসন্তকুমার বিশ্বাসের কাছ থেকে। নেতৃত্বের নির্দেশমত তিনি বোমা ২টি দিয়েছিলেন বালমুকুন্দকে। মে লিফলেটের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন বালমুকুন্দ।

আপিল আদালতও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন লাহোরের হত্যাকাণ্ডের সাথে বালমুকুন্দ যুক্ত ছিলেন। বালমুকুন্দের আপিলটি খারিজ করে দিয়ে দায়রা আদালতের দেওয়া তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি বহাল রেখেছিলেন আপিল আদালত।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দায়রা আদালতের আদেশে বসন্তকুমার বিশ্বাসের যাবজ্জীবন

কারাদণ্ড হয়েছিল। সরকারপক্ষ থেকে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল বসন্তকুমার ছিলেন ষড়যন্ত্রের একজন নায়ক এবং প্রত্যক্ষভাবে লাহোর ষড়যন্ত্রে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বদলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশে দেওয়া হোক। অপরদিকে বসন্তকুমারের পক্ষ থেকে আপিল আদালতে বলা হয়েছিল বসন্তকুমারের সাথে হত্যা ষড়যন্ত্রের কোন যোগ ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ খারিজ করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক।

সাক্ষ্য-সাবুদ থেকে দেখা যায় বসন্তকুমার বিশ্বাস ছিলেন বাংলার নদীয়া জেলার একটি বাঙালী যুবক। রাসবিহারী বোস তাঁকে বাড়ীর কাজকর্ম ও রান্নাবান্নার জন্য নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। দিল্লীতে বসন্তকুমার সকলের কাছে 'হরিদাস' নামে পরিচিত ছিলেন। বসন্তকুমার লাহোরে এসেছিলেন ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে। গিরিধারী লাল নামের এক ব্যক্তির লাহোরে পপুলার ডিসপেনসারি নামে একটি ডাক্তারখানা ছিল। বসন্তকুমার লাহোরে এসে এই পপুলার ডিসপেনসারিতে কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজে লেগে গিয়েছিলেন। বসন্তকুমারের লাহোরে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা।

লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে বোমা বসানোর পরিকল্পনাটি ছিল অবোধবিহারীর। তিনি বোমা বসানোর ব্যাপারে নেতৃত্ব দিলেও বোমাটি লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে বসিয়ে ছিলেন বসন্তকুমার অবোধবিহারীর নির্দেশমত।

বসন্তকুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দীননাথের সাক্ষ্য দায়রা আদালতের আসেসররাও বিশ্বাস করেছিলেন। তাছাড়া বসন্তকুমারের লিখিত বক্তব্য থেকেও কতকগুলি ঘটনার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

বসন্তকুমারের লিখিত বক্তব্যে প্রকাশ, রাসবিহারী বোস তাঁকে কলকাতা থেকে দেরাদুনে নিয়ে এসেছিলেন রান্নাবান্নার কাজ করার জন্য। 'বসন্তে'র জায়গায় তাঁর নতুন নামকরণ করা হয়েছিল 'হরিদাস'। বসন্তকুমার ছিলেন নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষ। তাই ইচ্ছে করেই রাসবিহারী তাঁর আসল নাম নতুন জায়গায় কারোকে জানাতে চাননি। নিচু সম্প্রদায়ের লোককে দিয়ে রান্না করিয়ে সেই খাবার রাসবিহারী খাচ্ছেন জানাজানি হলে রাসবিহারীর সমাজে নিন্দে হবে সেই কারণেই তাঁকে পরিচিত করানো হয়েছিল 'হরিদাস' নামে।

এ ছাড়া রান্নাবান্নার মত কাজ করানোর জন্য তাঁকে দেরাদুনে নিয়ে গিয়েছে জানলে গ্রামের লোক তাঁকে হেয় জ্ঞান করবে, এই জন্যও তিনি নিজের আসল পরিচয় লুকোবার জন্য নতুন নামটি নিয়েছিলেন। বসন্তকুমার দায়রা আদালতে স্বীকার করেছিলেন রাসবিহারী তাঁকে লাহেরে নিয়ে এসেছিলেন। লাহোরে একদিন রাসবিহারীর জুতো পরিষ্কার করতে অস্বীকার করায় রাসবিহারী তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি লাহোরে 'পপুলার ডিসপেনসারিতে' কাজ নিয়েছিলেন। মানুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই নতুন কাজটি নিয়েছিলেন। এর পিছনে তাঁর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। বসন্তকুমারের বক্তব্য থেকে আরো জানা যায়, তিনি মামলার রাজসাক্ষী দীননাথকে জানতেন। কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বা হত্যার ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা ছিল না। বসন্তকুমার আরো বলেছিলেন—তিনি মে লিফলেট বা জুলাই লিফলেটের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে বোমা বসানোর ব্যাপারেও তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তাঁকে এই ব্যাপারে মিথ্যে করে জড়ানো হয়েছে।

আপিল আদালত বসন্তকুমারের নাম পরিবর্তনের গল্প বিশ্বাস করেননি। দেরাদুনে বা দিল্লীতে 'হরিদাস' নামে নিজেকে পরিচয় দিলেও লাহোরে 'পপুলার ডিসপেনসারিতে' কাজ নেওয়ার সময় তিনি নিজের আসল নাম বসন্তকুমার বিশ্বাস হিসেবেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। আপিল আদালতের কাছে প্রশ্ন ছিল যদি সত্যি সত্যি তিনি তাঁর আসল নাম লুকতেই চাইবেন তাহলে তিনি পরে নিজের আসল নাম বলতে গেলেন কেন? আপিল আদালত এই প্রসঙ্গে বললেন বিপ্লবীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল যদি বসন্তকুমার লরেন্স গার্ডেনের বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে কোনভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান, তাহলে যেন কেউ বুঝতে না পারেন 'হরিদাসই' আসলে বসন্তকুমার বিশ্বাস। এই ব্যাপারে জানাজানি হলে রাসবিহারীর নামটি ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকার কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। এই সব চিন্তা-ভাবনা করেই বসন্তকুমারের নাম দিল্লী ও দেরাদুনে করা হয়েছিল 'হরিদাস'। আবার লাহোরে এসে তিনি তাঁর আসল নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

দীননাথের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় বসন্তকুমার লাহোরে এসেছিলেন অক্টোবরের মাঝামাঝি। লাহোরে এসেই নতুন কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৫ই অক্টোবর, ১৯১২। আপিল আদালত বললেন এর থেকে বোঝা যায় বসন্তের 'পপুলার ডিসপেনসারির' কাজে যোগ দেওয়ার সময় সম্ভবত রাসবিহারী বোস লাহোরেই ছিলেন। এর পরেও যখন রাসবিহারী লাহোরে এসেছিলেন, বসন্তকুমার তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যদি রাসবিহারী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়েই দেবেন, তাহলে বসন্তকুমার কেনই-বা রাসবিহারীর সাথে আবার দেখা করতে যাবেন?

আপিল আদালত বিশ্বাস করেছিলেন লাহোরে বোমা বিস্ফোরণে বসন্তকুমার বিশ্বাস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে অবোধবিহারী ও বসন্তকুমার বিশ্বাস মিলিত হয়েছিলেন পূর্ব পরিকল্পনামত। অবোধবিহারীর নির্দেশ অনুযায়ী গার্ডেনে বোমা বসিয়েছিলেন বসন্তকুমার। তাঁরা দু-জনেই গার্ডেনে এসেছিলেন সাইকেলে চেপে। দীননাথের সাক্ষ্য এই ব্যাপারে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন আপিল আদালত।

বসন্তকুমার বিশ্বাসকে দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁর দেশের বাড়ী নদীয়া থেকে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণটি ঘটেছিল ঘটনার দিন রাত ৮-৫৫ মিনিটের সময়।

আপিল আদালতও দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন হত্যা ষড়যন্ত্রে বসন্তকুমার বিশ্বাস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রামপদারথকেও হত্যা করেছেন যড়যন্ত্র মাফিক। ঘটনার সময় বসন্তকুমার ছিলেন ২৩ বছরের একজন যুবক। বসন্তকুমারকে আপিল আদালতের সামনে আনা হয়েছিল আদালতের নির্দেশে। আপিল আদালত বসন্তকুমারকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন বসন্তকুমার একজন সুস্থ মস্তিষ্কের দীপ্ত চেহারার যুবক। তাঁর কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজ করা থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত যুবক। হত্যা বা হত্যার ষড়যন্ত্রের ফলাফল বোঝা তাঁর পক্ষে এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সেই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি করুণা দেখানোর কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। দায়রা আদালত এই ধরনের হত্যাকারীকে দয়াপরবশ হয়ে মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন না। বিচার বিবেচনা করে আপিল আদালত বসন্তকুমার বিশ্বাসকে যাবজ্জীবনের বদলে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

হনয়ান্ত সহায় দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় একজন অভিযুক্ত আসামী ছিলেন। তিনি

ছিলেন হরদয়ালের আত্মীয়। থাকতেন দিল্লীতে। হনয়ান্ত, আমীরচাঁদ ও অবোধবিহারীর বন্ধু ছিলেন। হনয়ান্ত সম্বন্ধে মামলায় বলা হয়েছিল ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বালমুকুন্দকে লাহোরের ফজলে করিমের নাম করে তাঁর কাছে 'লিবার্টি' লিফলেট পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। ফজলে করিম ছিলেন সেই সময় লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। ইসলামিয়া কলেজের লিফলেট লাগাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফজলে করিমকে।

ফজলে করিমকে মামলায় সরকার পক্ষ সাক্ষী মেনেছিলেন। ফজলে করিম তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, লিফলেট্ তাঁর হাতে আসার পর তিনি হনয়ান্তের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পান্নালাল মাথুরের বাড়িতে।

সেই সময় পান্নালাল মাথুর ছিলেন ইসলামিয়া কলেজের একজন প্রফেসর। সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় হনযান্তের প্রচেষ্টায় ফজলে করিমকে দিয়ে ইসলামিয়া কলেজে লিফলেট মারার কাজটি করানো হয়েছিল। দীননাথ কিন্তু তাঁর সাক্ষ্যে হনয়ান্তের নাম করেননি। হনয়ান্তকে কোনভাবে ষডযন্ত্রের সাথে যুক্ত করেননি দীননাথ।

আপিল আদালত এই ব্যাপারে বলেছিলেন দীননাথের স্বীকারোক্তিতে বা তাঁর সাক্ষ্যতে হনয়ান্তের নামের উল্লেখ না থাকার কারণ হনয়ান্ত সহায় ছিলেন দিল্লী ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত আর দীননাথ ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। এজন্য দীননাথের সাথে হনয়ান্তের কোন যোগাযোগ ছিল না। সেই কারণেই দীননাথ হনয়ান্তের ব্যাপারে কোন কিছু বলতে পারেন নি।

হনয়ান্তের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল হত্যা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। আপিল আদালত এর উত্তরে বললেন হনয়ান্ত যখন মে লিফলেটের কপি লাহোরে ফজলে করিমের কাছে পাঠাতে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজে সেই ফিলেট লাগাবার জন্য, সেইক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে লিফলেটের বিষয়বস্তু তাঁর জানাই ছিল।

মে লিফলেটের একাংশে লেখা ছিল—

"The special menifestation of the Divine Force at Delhi in December last" etc., attending to the Bomb outrage of 23rd December, 1912.

"God Himself worked in Khudi Ram Bose, Prafulla Chaki, Kanailal Dutta, Madan Lal Dhingra."

৩রা মার্চ ফজলে কবিমের কাছ থেকে নাম জানতে পেরে পুলিশ হনয়ান্ত সহায়কে গ্রেপ্তা করেছিল ৪ঠা মার্চ, ১৯১৪ সালে।

দিল্লীর হনয়ান্তেব বাড়ি তল্লাসী করে পাওয়া গিয়েছিল বহু মে লিফলেটের কপি তাছাড়া আমিরচাঁদের বাড়িতে রাখা অবোধবিহারীর বাক্সটি থেকেও পাওয়া গিয়েছিল হনয়ান্তের লেখা কিছু চিঠিপত্র। আইনগত দিক বিচার-বিবেচনা করে আপিল আদালত যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত আসামী হনয়ান্তের দণ্ডাদেশ কমিয়ে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৫ ধারায়।

অভিযুক্ত আসামী চরণদাস দায়রা আদালতের বিচারে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, সরকার পক্ষ থেকে তাঁর মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল পাঞ্জাবের চিফ্ কোর্টে। চরণ দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি সত্যি নয় বলে আদালতকে জানিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছিলেন পরবর্তীকালে।

কতকগুলি বিষয় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল চরণ দাসের পক্ষে। স্বীকার করা বিষয়গুলির মধ্যে ছিল—

প্রথমত, রাসবিহারী বোসের সাথে তাঁর বেশ কিছুদিন আগে থেকে আলাপ পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয়ত, রাসবিহারীর নেতৃত্বে তিনি বিপ্লবী কাজকর্মের অনুশীলন নিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, রাসবিহারী যখন চিঠিপত্র আসত চরণ দাসের দিল্লীর ঠিকানায়।

চতুর্থত, রাসবিহারী লাহোরে ছিলেন, সেই সময় চরণ দাসের বাড়ীর ঠিকানায় আসা রাসবিহারীর সব চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হত রাসবিহারীর লাহোরের গুপ্ত ঠিকানায়।

পঞ্চমত, গুপ্ত সংকেতের হদিস পাওয়া গিয়েছিল চরণ দাসের বাড়িতে পাওয়া কাগজপত্রে। এই গুপ্ত সংকেত দিয়েই চিঠিপত্র লিখতেন রাসবিহারী বিভিন্ন জায়গায়।

সাক্ষ্য প্রমাণ এবং চরণ দাসের পরবর্তীকালে অস্বীকার করা স্বীকারোক্তি বিচার-বিবেচনা করে আপিল আদালত দায়রা আদালতে দেওয়া মুক্তির আদেশ খারিজ করে চরণ দাসের বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাটি চলাকালীন অবস্থায় লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া' নামক একটি পত্রিকাতে ভারতবর্ষে পুলিশের তদন্ত এবং বিচার ব্যবস্থা নিয়ে নানারকম সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল। আপিল আদালতের কাছে 'ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১টি কপি দিয়ে সরকারপক্ষ থেকে মিঃ ব্রডওয়ে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন। আপিল আদালত এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে লণ্ডন থেকে, কাজেই ভারতবর্ষের আপিল আদালতের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

তবুও আপিল আদালত এই ব্যাপারে পত্রিকাটি সম্বন্ধে নতুন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন যে কোন সত্যিকার পত্রিকার কাছ থেকে শিক্ষিত ও সভ্য মানুষ সবসময় সুস্থ সাংবাদিকতা ও সত্য সংবাদ আশা করেন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষেরও সংবাদপত্রের স্বার্থে এবং সংবাদপত্র পাঠকের স্বার্থে সাংবাদিকতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অভিপ্রেত।

দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সবগুলি আপিলের রায় হয়েছিল একসঙ্গে। কবি নজরুল ইসলাম কি এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদদের উদ্দেশ করেই লিখেছিলেন?—

যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে,
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মর-কবি গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান।

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা
(ক্ষতিপূরণের দাবী)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার বুকে লেগেছিল বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া। ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার নিজেদের প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে। বাংলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙলার তরুণ ও যুবকের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। এই সময় ঢাকা শহরে এসেছিলেন দেশবরেণ্য নেতা শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল এবং তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার পি. মিত্র। এই দুইজন নেতাকে নিয়ে ঢাকা শহরে একটি বিশাল সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভার মঞ্চ থেকে বাংলার তরুণ ও যুবকদের ডাক দেওয়া হয়েছিল দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। আওয়াজ তুলতে বলা হয়েছিল বিদেশী শাসকের স্বার্থান্বেষী নীতির বিরুদ্ধে। মোটামুটি এই সময় থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বাংলার মাটিতে বিপ্লবের আখড়া ও সমিতি গড়ে তুলতে লাগলেন বাংলার তরুণ ও যুবকের দল। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সব তরুণ ও যুবকের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল দেশের মাটি থেকে ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের বিতাড়িত করা।

১৯০৬-০৭ সালে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। শাখা সংগঠন হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে গড়ে উঠতে লাগল একাধিক বিপ্লবী সমিতি। এই সব শাখা সংগঠনগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল নারায়ণগঞ্জের ব্রতী সমিতি, সিরাজগঞ্জের বান্ধব সমিতি, সোনাময়ী সমিতি, মধ্যপাড়া সমিতি, হবিগঞ্জ সমিতি, সতীপাড়া সমিতি প্রভৃতি। অনুশীলন সমিতির পরিচালনায় সমিতির সভ্যদের বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল আধা মিলিটারি কায়দায়। ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সমিতির সভ্যদের পড়তে দেওয়া হত বিপ্লবী বই ও ইস্তেহার। সভ্যদের লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, তরবারী চালানো, বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা বাঁধা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে।

গুপ্তভাবে তৈরি করা চলছিল বিদেশী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্তেহার; প্রকাশ করা হচ্ছিল বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা। ইংরেজ প্রশাসনকে ও তার দালালদের উপর আক্রমণ হানতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে বাংলার বিপ্লবীরা শামিল হয়েছিলেন বেশ কয়েকটি বড় ধরনের ডাকাতিতে। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এইসব ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন স্বদেশী ডাকাতের দল। এদের বলা হ'ত ভদ্রলোক ডাকাত। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরের কাছে নারায়ণগড়ে বাংলার লেঃ গভর্নরের ট্রেনটিকে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও

শরৎচন্দ্র দে যোগজীবনের রিভলভার নিয়ে মেদিনীপুর থেকে উধাও হয়েছিলেন। ইংরেজ প্রশাসনের কাছে গুপ্ত খবর ছিল এই রিভলভার থেকে গুলি করে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে হত্যা করা হবে। রাজেন্দ্রপুরে ট্রেন ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৯ সালের ১১ই অক্টোবর।

একদিকে বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে চলছিল সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি, অপরদিকে দেশে চলছিল স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশীরা বাজারে বাজারে পিকেটিং করছিলেন। স্বদেশীদের কাছ থেকে ডাক এসেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার। বয়কট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার আবেদন রাখা হয়েছিল দেশবাসীর কাছে।

এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দুটি বিপ্লবী পুস্তিকা। পুস্তিকা দুটির মধ্যে ছিল "বর্তমান রণনীতি" (The Art of Modern Warfare) এবং "মুক্তি কোন পথে" (The way of Salvation lies)। মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল "মেদিনী বান্ধব" নামে একটি দৈনিক পত্রিকা। "বর্তমান রণনীতি" এবং "মুক্তি কোন পথে" বই দুখানির দাম করা হয়েছিল বারো আনা।

১৯০৭ সালের ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জেলা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধিবেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী বি. কে. দত্ত। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং অরবিন্দ ঘোষ। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অতিথি হয়ে উঠেছিলেন অধিবেশনের চেয়ারম্যান বি. কে. দত্তর বাড়িতে। কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর দায়িত্ব ছিল অধিবেশনের অতিথিদের দেখাশোনা করার। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে ছিল লাঠি। সত্যেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক। এই সত্যেন্দ্রনাথ বোসই আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ে বীরত্বের সাথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মতই দেশের জন্য সত্যেন্দ্রনাথকেও ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সত্যেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ব্রিটিশ প্রশাসনের নিযুক্ত একজন গুপ্তচরকে হত্যা করেছিলেন।

ফিরে আসা যাক্ কংগ্রেস অধিবেশনে। বি. কে. দত্ত স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে লাঠি থাকা পছন্দ করলেন না। স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠি ফেলে দিতে বললেন। অধিনায়ক সত্যেন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান বি. কে. দত্তের এই নির্দেশ মেনে নিতে পারলেন না। স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দিলেন সন্তোষ দাসের স্কন্ধে।

৭ই ডিসেম্বর অধিবেশনের চেয়ারম্যান বি. কে. দত্ত অধিবেশনের মঞ্চে প্রবেশ করলেন ইউরোপীয়ান সাজসজ্জায়। অন্যান্য অতিথিরা বি. কে. দত্তের এই ইউরোপীয়ান সাজ মোটেই পছন্দ করলেন না। চেয়ারম্যান দত্ত সাহেব অধিবেশন মঞ্চে উঠে প্রথমেই ফরমান দিলেন "স্বরাজ" নিয়ে কোন আলোচনা করা চলবে না। দেশপ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ চেয়ারম্যানের এই নির্দেশ মানতে না পারায় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অধিবেশন স্থান ত্যাগ করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের বলা হ'ল 'কট্টরপন্থী'। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রইলেন মডারেটারদের দলে।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বোমায় মুজাফ্ফরপুরে মৃত্যু ঘটল কেনেডি পরিবারের দুই মহিলার। পরে অবশ্য জানা গেল ভুলবশত বোমা ছোঁড়া হয়েছিল মিসেস ও মিস্ কেনেডির ওপর। ক্ষুদিরাম নিজেও ভুল স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন মহিলা দুই জনের দুঃখজনক মৃত্যুতে। এর পর ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন পুলিশের

হাতে। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হ'ল। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী ও সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে চলল দারুণ আলোড়ন। এইসব বিপ্লবী শহিদদের নিয়ে গ্রামে গঞ্জে বাঁধা হ'ল গান। রচিত হ'ল একাধিক কবিতা। লোকসঙ্গীত, ভাটিয়ালী গানের মাধ্যমে এইসব দেশপ্রেমিক শহিদদের প্রতি প্রকাশ করা হ'ল শ্রদ্ধাপ্রীতি ও ভালোবাসা। এই সময় বাংলার ঘরে ঘরে একটা বিপ্লবের ছোঁয়ার স্পর্শ অনুভব করা যাচ্ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকের দল তাঁদের বিভিন্ন গুপ্ত আখড়ায় ইংরেজ নিধনের জন্য বোমা বাঁধলেন, আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করলেন গুপ্তপথে। নেতৃত্বের নির্দেশে সংগঠনের অনুগত সৈনিক হিসেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে কোন গুপ্ত সংবাদ ও অস্ত্রশস্ত্র পৌছে দিতে লাগলেন নির্দিষ্ট ডেরায়। কর্মসূচী অনুযায়ী ইংরেজ প্রশাসনের উপর আক্রমণ হানতে নিজেদের প্রস্তুত রাখলেন বিপ্লবী দলের সদস্যরা। অহিংসায় বিশ্বাসী দেশব্রতীরা শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। মুজাফ্ফরপুরের ঘটনার পর কিছুদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্র থেকে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'কেশরি' পত্রিকায় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও বাংলার বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের সমর্থনে নিবন্ধ লিখে প্রকাশ করলেন। মহামান্য তিলককে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হ'ল। এই দশকের মাঝামাঝি সময় বরদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ ব্রিটিশ প্রশাসনের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করে চিঠি পাঠাতেন কলকাতায় তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষকে। পথনির্দেশ থাকত এই চিঠিতে কোন্ পথে বিপ্লবকে পরিচালিত করতে হবে।

ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রশাসনও বসে থাকলেন না। জানতে পারলেন বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও নানা ষড়যন্ত্রের কথা। সরকারী প্রশাসন কঠোর মনোভাব নিলেন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ প্রশাসনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল বিপ্লবী কাজকর্মের প্রতি। বিপ্লবীদের গোপন খবর সংগ্রহ করতে গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হল শহরে-গাঁয়ে-গঞ্জে। বাংলার সি. আই. ডি. অফিসাররা সক্রিয় হয়ে উঠলেন বিপ্লবী দমনে। সরকারী প্রশাসনের প্রখর দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কোনভাবেই দমিয়ে রাখা যাচ্ছিল না দেশের কাজে নিবেদিত যুবক ও তরুণদের। বাহ্যিক গর্জন থাকলেও ইংরেজ প্রশাসন ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের ভয় পেয়েছিলেন।

দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছিলেন একাধিক যুবক ও তরুণকে। প্রশাসনের অন্যায় অত্যাচার উপেক্ষা করে দেশের মাটি থেকে ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের বিতাড়িত করার শপথ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন শিক্ষিত যুবক ও তরুণের দল। চারিদিক থেকে উপচে পড়ছিল ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ। সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর দালাল জন্মেছিল ইংরেজ প্রশাসনকে সাহায্য করতে। এদের মধ্যে অনেকে অর্থের প্রলোভনে গুপ্তচরের কাজ নিয়েছিল। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সত্যি-মিথ্যা খবর সরবরাহ করাই ছিল এদের কাজ। এদের দেওয়া মিথ্যা খবরে অনেক সময় বহু নিরীহ যুবককেও পুলিশের হাতে হয়রানি হতে হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছে বিপ্লবীদের। অনেককেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। কারো কারো বা হয়েছে ফাঁসি।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে মেদিনীপুর ছিল অন্যতম। এ ছাড়া ঢাকা, চিটাগাং, বরিশাল, রাজসাহী, মালদা ও নোয়াখালিতে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী দল। কলকাতা ছিল বিপ্লবীদের পীঠস্থান। কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে গুপ্তভাবে ছাপা হত ইস্তেহার, বই,

পোস্টার প্রভৃতি। রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র মামলাগুলিতে অভিযুক্তদের হয়ে মামলা পরিচালনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবীরা। দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে বিপ্লবীদের হয়ে লড়াই করেছেন তদানীন্তনকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীরা। দু-একজন বাদ দিলে বাকিদের নাম অনেকেই জানেন না।

১৯০৮ সালে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নেলসন সাহেবের আদালতে। অভিযোগকারী ছিলেন রাখালচন্দ্র লাহা। অভিযোগপত্রে নাম ছিল ১৫৪ জন অভিযুক্ত আসামীর। এই সময় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন মিঃ ডোনাল্ড ওয়েস্টন, আই. সি. এস.। মৌলভী মজাহারুল হক্ ছিলেন মেদিনীপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট। মেদিনীপুরে পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ছিলেন বেঙ্গল পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। মৌলভী সাহেব ১৯০৭ সালের শেষাশেষি পর্যন্ত ছিলেন সি-আই-ডি পুলিশে। লালমোহন গুহ ছিলেন মেদিনীপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টার।

১৯০৮ সালের ৩রা মে হঠাৎ মেদিনীপুরে পিয়ারীমোহন দাসের বাড়িতে পুলিশের তল্লাসী অভিযান চালানো হ'ল। অবশ্য পুলিশি তল্লাসীতে পিয়ারীমোহনের বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। হঠাৎ কেন পিয়ারীমোহনের বাড়ীতে পুলিশের তল্লাসী অভিযান হ'ল তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ প্রশাসনের কাছ থেকে জানা গেল না। এই সময় আলীপুর ষড়যন্ত্র নিয়ে কলকাতায় বিভিন্ন বাড়ীতে পুলিশের তল্লাসী অভিযান চলছিল। অনুমান করা হ'ল হয়ত আলীপুর ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে কোন গুপ্ত খবরের সূত্রে পিয়ারীমোহনের বাড়িতে পুলিশের তল্লাসী অভিযানটী হয়ে থাকবে।

পিয়ারীমোহন দাস ছিলেন ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত সরকারী অফিসের সাব-রেজিস্টারার। ১৮৮৪ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে পরিবারের লোকজন নিয়ে মেদিনীপুরে বসবাস করছিলেন। মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষের কাছে পিয়ারীমোহন দাস ছিলেন একজন বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। পিয়ারীমোহনের স্ত্রী শ্রীমতি বসন্তকুমারী দেবী ছিলেন তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ রাসবিহারী ঘোষের মাসী। পিয়ারীমোহনের তিন পুত্র আশুতোষ, সন্তোষ এবং পরিতোষ তিনজনই থাকতেন পিয়ারীমোহনের সাথে। তাঁর পরিবারে এই সময়ে থাকতেন নাতি জ্যোতিন্দ্রনাথ সেন (মেয়ের ছেলে)। এ ছাড়া ছিল একজন পাচক, ঝি এবং বনমালী নামে একটি অল্প বয়সের চাকর।

১৯০৮ সালে ১৪ই জানুয়ারী পিয়ারীমোহনের মেজ ছেলে সন্তোষ বেঙ্গল পুলিশের সাব-ইনসপেক্টার পদে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। নিয়োগপত্র পেয়ে সন্তোষ চলে গিয়েছিলেন রাঁচীর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে যোগ দিতে। ছুটি পড়ে যাওয়ায় ১৩ই জুন ছুটি কাটাতে সন্তোষ ফিরে এসেছিলেন মেদিনীপুরে। এই সময় পিয়ারীমোহনের বড় ছেলে আশুতোষ মেদিনীপুরের পোস্ট অফিসে মেল ক্লার্কের পদে চাকরি করতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হঠাৎ আশুতোষ ৩রা জুলাই মেদিনীপুর থেকে মুজাফ্ফরপুর যাওয়ার জন্য বদলীর আদেশ পেলেন। আশুতোষের উপর সরকারী নির্দেশ হল ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাকে মেদিনীপুর ছেড়ে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে।

৭ই জুলাই মৌলভী মজাহারুল হক মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেলসনের আদালতে পিয়ারীমোহনের বাড়ি এবং হনুমানজীর মন্দিরে তল্লাসী করার জন্য তল্লাসী পরোয়ানা ছাড়ার আদেশ প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনামত তল্লাসী পরোয়ানার আদেশ দিয়েছিলেন

নেলসন সাহেব তাঁর বাড়িতে বসে গভীর রাতে। হনুমানজীর মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। তল্লাসী পরোয়ানা বলে ৮ই জুলাই ভোর রাতে দ্বিতীয়বার পিয়ারীমোহনের বাড়িতে পুলিশের তল্লাসী অভিযান হ'ল। এই তল্লাসী অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন মৌলভী সাহেব নিজে। সঙ্গে ছিলেন লালমোহন গুহ সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার। ভোর রাতে তল্লাসীর সময় পিয়ারীমোহনের বাড়ীটি ঘিরে রেখেছিল মিলিটারি পুলিশ। তল্লাসীতে পিয়ারীমোহনের বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে একটি বোমা পাওয়া গেল। এই দিনই পিয়ারীমোহনের বাড়ি থেকে তাঁর মেজ ছেলে সন্তোষকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ মি. ব্রেট সাহেবের পরিচালনায় সমগ্র তল্লাসী অভিযানটি সম্পন্ন হয়েছিল।

পিয়ারীমোহনের বৈঠকখানা থেকে পাওয়া বোমাটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনের কাছে আনা হ'ল। তাঁর সামনেই সিলকরা বোমার প্যাকেটটি খুললেন মেদিনীপুরের সিভিল সার্জেন উইনম্যান। এরপর বোমাটিকে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। পরে বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে জানা গেল বোমাটি ছিল মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি এবং জীবনহানি ঘটানোর মত শক্তিশালী। আরো জানা গেল মৌলভী সাহেব পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তাঁর বালক চাকর বনমালীকে দিয়ে তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানায় বোমাটি রেখেছিলেন। তাঁর ছেলেদের বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যে এই কাজ করা হয়েছিল।

৯ই জুলাই সন্তোষকে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেলসনের কাছে হাজির করানো হয়েছিল। নেলসন সাহেব সন্তোষকে বিচারাধীন আসামী হিসেবে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। ২৩শে জুলাই সন্তোষকে জেল থেকে এনে আবার নেলসনের সামনে হাজির করা হল। পিয়ারীমোহন এই দিন ছেলের ব্যাপারে আদালতে এসেছিলেন। আদালত চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

পিয়ারীমোহন তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ হিসেবে বলেছিলেন, ৯ই জুলাই থেকে ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে তাঁর সাথে পুলিশ অফিসার ও প্রশাসনের অনেক আমলার যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁর ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁকে দিয়ে সন্তোষকে বাধ্য করতে যাতে সন্তোষ আদালতের কাছে স্বীকারোক্তি দিতে রাজী হন। পিয়ারীমোহনকে শাসানো হয়েছিল সন্তোষ যদি স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে পিয়ারীমোহনকে গ্রেপ্তার করা হবে। সন্তোষের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পারায় ২৩শে জুলাই অন্যায়ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২৯শে জুলাই জেল থেকে সন্তোষকে নিয়ে আসা হয় মিঃ ওয়েস্টনের বাংলোয়। বাবার গ্রেপ্তারের কারণ জানতে পেরে সন্তোষ স্বীকারোক্তি দিতে স্বীকার করলেন পিয়ারীমোহনের মুক্তির আশায়। মিঃ ওয়েস্টনের সামনে মিঃ নেলসন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় সন্তোষের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য সন্তোষ তাঁর স্বীকারোক্তি দেওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন, মৌলভী মজাহারুল হক ও লালমোহনের প্ররোচনায় তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তাঁকে বলা হয়েছিল তাঁর স্বীকারোক্তি পেলে পুলিশ তাঁর বাবাকে ছেড়ে দেবে। বাবার মুক্তির আশায় তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তিটি কখনই স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়নি।

২৬শে জুলাই হঠাৎ অপর একটি বোমা পাওয়া গেল মৌলভী সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি একটি ড্রেন থেকে। মেথরানী বোমাটি ড্রেনে দেখতে পেয়ে খবর দিয়েছিল। পুলিশ এসে বোমাটি তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়। এর কিছুদিনের মধ্যে ইনসপেক্টার লালমোহন গুহ

আবিষ্কার করেন তৃতীয় বোমাটি। তৃতীয় বোমাটি পাওয়া গিয়েছিল বরোদা ও সারোদা দত্তের রেকর্ড-রুম থেকে। এ ক্ষেত্রেও আসামীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল পুলিশের কারসাজিতেই বোমাটি পরিকল্পনামাফিক রেকর্ড-রুমে রাখা হয়েছিল।

৩১শে জুলাই সন্দেহবশত পুলিশ গ্রেপ্তার করল বরোদাপ্রসাদ দত্ত, সারোদাপ্রসাদ দত্ত, জ্যোতিন্দ্রমোহন ব্যানার্জী, নিরাপদ মুখার্জী, মধুসূদন দত্ত, শ্যামলাল সাহা, নিকুঞ্জ মাইতি এবং সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীকে। ২৮শে আগস্ট গ্রেপ্তার করা হ'ল অবিনাশ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মাইতি এবং নারাজোলের রাজাকে। ১৩ই আগস্ট সন্তোষকে জেল কাস্টডি থেকে পুলিশ কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছিল। ১৫ই জুলাই সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী পুলিশ কাস্টডিতে থাকাকালীন অবস্থায় স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়েছিল জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নেলসন সাহেবের বাংলোতে। নেলসন সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের তদন্তের পদ্ধতি এবং অভিযুক্ত আসামীদের স্বীকারোক্তি আইনগত পদ্ধতি নিয়ে প্রতিবাদ করে বাংলা সরকারের কাছে টেলিগ্রাফ সহযোগে জানালেন ব্যারিস্টার বি. কে. দত্ত। এই ব্যাপারে ২৭শে আগস্ট আশুতোষ দাস, জ্যোতিন্দ্রনাথ সেন এবং উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর লিখিত প্রতিবাদপত্রও পাঠানো হয়েছিল বাংলার তদানীন্তন সরকারী প্রশাসনের কাছে।

১৯০৮ সালের ৩১শে আগস্ট ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের বিধান মত লোকাল গভর্নমেন্টের অনুমোদন নেওয়া হয় ২৭ জন অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে। এই দিন মামলাটি থেকে রেহাই দেওয়া হয় পিয়ারীমোহন দাস, নিরাপদ মুখার্জী এবং জ্যোতিন্দ্রনাথ সেনকে। এই দিনই সন্তোষ দাস ও সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী লিখিত দরখাস্ত পেশ করে তাদের পূর্বে দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছিলেন। এই অবস্থায় পিয়ারীমোহনের বড় ছেলে আশুতোষকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

১৯০৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম এত্তেলাটি দাখিল করা হয়।

সম্ভবত মামলাটির গুরুত্ব অনুভব করে তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেলকে পাঠানো হয়েছিল মেদিনীপুরে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য। তিনি মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলাটিতে সরকার পক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় ঘটল একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। মামলার প্রথম এত্তেলাকারী (অভিযোগকারী) রাখালচন্দ্র লাহা নিজেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন তিনি পুলিশের প্ররোচনায় প্রশাসনের তৈরি করে দেওয়া অভিযোগপত্রটি প্রথম এত্তেলা হিসাবে পুলিশের কাছে দাখিল করেছিলেন। প্রথম এত্তেলায় (এফ. আই. আর.) বর্ণিত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাখালচন্দ্র লাহার এই সাক্ষ্যের পর মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ সিনহা অভিযুক্ত আসামী সন্তোষচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং যোগজীবন ঘোষ ছাড়া সকলের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিলেন। এই তিনজনকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দায়রা আদালতে সোপর্দ করলেন বিচারের জন্য।

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালতে বিচার হয়েছিল সন্তোষ, সুরেন্দ্রনাথ এবং যোগজীবনের। অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি ছিলেন মিঃ স্মিথার। দায়রা বিচারে এই তিনজনই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল এই তিনজনের বিরুদ্ধে ১৯০৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী।

দণ্ডিত আসামীরা দায়রা আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে আপিলটির শুনানি হয়েছিল প্রধান বিচারপতি এবং স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চে। কলকাতা হাইকোর্ট আপিল মামলাটি শুনে ১৯০৯ সালের ১লা জুন দায়রা আদালতের দণ্ডাদেশ বাতিল করে দিয়ে দণ্ডিত আসামীদের মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় দানের কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার লেঃ গভর্নর বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ ম্যাকফারসনকে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন। তদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে বলেছিলেন তাঁর কাছে। বিভাগীয় তদন্ত হলেও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কখনই সম্পূর্ণ রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়নি।

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় শেষ পর্যন্ত তিনজন আসামী হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি পাওয়ার পর পিয়ারীমোহন দাস ১৯০৯ সালের ১৫ই নভেম্বর সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করলেন। ক্ষতিপূরণ মামলায় ১নং বিবাদী ছিলেন মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ ওয়েস্টন। ২নং বিবাদী করা হয়েছিল মেদিনীপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মৌলভী মজাহারুল হককে। ৩নং বিবাদী ছিলেন মেদিনীপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টার লালমোহন গুহ।

দেওয়ানী মামলার আর্জিতে বাদী পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বাদী পিয়ারীমোহন ও তাঁর ছেলেদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা করে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়েছিল। তাদের এবং মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত আসামীদের পুলিশ ও প্রশাসন ষড়যন্ত্র করে অযথা হয়রানি ও অপদস্থ করেছে। মৌলভী মজাহারুল হক্ বাদীর চাকর বনমালীকে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানায় একটি বোমা রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর পরিবারের লোকদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

মৌলভী মজাহারুল হকের ষড়যন্ত্রে তাঁর নাবালক চাকরকে দিয়ে এই অভিসন্ধিমূলক কাজ করাতে বাধ্য করা হয়েছিল ছলনার আশ্রয় নিয়ে। তাঁর মত একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে বিনাদোষে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁর মেজ ছেলে সন্তোষকে দিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করতে। তাকে এবং তার ছেলেদের গ্রেপ্তার এবং তার পরিবারের লোকজনকে নানাভাবে হয়রানি করায় তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মান সম্ভ্রম নষ্ট করে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাই তিনি আদালতের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন বিবাদীদের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হোক তাঁকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার। বিবাদীদের পক্ষে আলাদা আলাদা ভাবে ক্ষতিপূরণ মামলায় জবাব দাখিল করা হয়েছিল। মিঃ ওয়েস্টন ও মৌলভী মজাহারুল হকের জবাবে পিয়ারীমোহনের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল বিশদভাবে।

মিঃ ওয়েস্টনের জবাবে বলা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৩শে জুলাই মৌলভী সাহেব মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নেলসনের কাছে খবর দিয়েছিলেন পিয়ারীমোহন দাস তাঁর বাড়ীতে বোমা রেখেছেন এবং ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এই বোমা দিয়ে প্রশাসনের আমলাদের আঘাত হানা হবে। মৌলভী সাহেব লিখিত আবেদন করেছিলেন তল্লাসী পরোয়ানা দেওয়ার জন্য। মিঃ ডোনাল্ড-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসাররা মৌলভী সাহেবের প্রার্থনা অনুমোদন করায় বাদীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও তল্লাসী পরোয়ানা দেওয়া হয়েছিল। জবাবে বলা হয়েছিল এই ব্যাপারে মিঃ ওয়েস্টনের কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যদিকে মৌলভী

সাহেবের জবাবে বলা হয়েছিল সরকারের স্বার্থে গুপ্ত খবর পেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনুমোদন নিয়ে তিনি পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় বিধি বহির্ভূতভাবে কিছু করা হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মামলার তৃতীয় বিবাদী লালমোহন গুহ তাঁর জবাবে বলেছিলেন, পিয়ারীমোহন দাসের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ব্যাপারে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। মামলার দ্বিতীয় বিবাদী মৌলভী মজাহারুল হকের নির্দেশ মত তিনি বাদী পিয়ারীমোহন ও তাঁর মেজ ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছিলেন মাত্র। মৌলভী সাহেব এবং লালমোহন উভয় বিবাদীই একটা ব্যাপার স্বীকার করেছিলেন যে-মামলার ১নং বিবাদী মিঃ ওয়েস্টনের অনুমোদন নিয়ে পিয়ারীমোহন দাসের বাড়ী তল্লাসী করা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণ দাবী করে পিয়ারীমোহন দাসের দায়ের করা দেওয়ানী মামলাটির শুনানির সময় মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র, এগ্জিবিটস তলব করা হয়েছিল।

ক্ষতিপূরণের দেওয়ানী মামলাটির শুনানির শুরুতেই মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল মামলার বিবাদীদের পক্ষে আদালতের কাছে বলেছিলেন, মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম এত্তেলা (এফ. আই. আর.) দায়েরকারী রাখালচন্দ্র লাহা মামলার অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে যে সব ঘটনার কথা বর্ণনা করেছিলেন, তাঁর মক্কেল অর্থাৎ মামলার বিবাদীরা সকলেই সরল মনে সেই সব ঘটনা বিশ্বাস করেছিলেন। সেইমত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিলেন প্রশাসন ও পুলিশ। পরে প্রথম এত্তেলা দায়েরকারী রাখালচন্দ্র লাহা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম এত্তেলায় বর্ণিত ঘটনাসমূহকে মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

ক্ষতিপূরণের দেওয়ানী মামলাটির বিচারের সময় আদালতের কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য উঠেছিল।

(১) বিবাদীরা সকলে অথবা বিবাদীদের মধ্যে দুই বা ততোধিক বিবাদী মিলে বাদীর ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধন করার জন্যই কি মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলাটি দায়ের করেছিলেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে?

(২) বিবাদীরা কি ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পনা মাফিক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যায় এবং বে-আইনিভাবে বাদী বা বাদীর পরিবারকে হয়রানি করেছিলেন?

এ ছাড়াও বিচারের সময় দেওয়ানী মামলাটিতে কতকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন উঠেছিল।

(ক) মামলার বাদী পিয়ারীমোহনের বাড়ীতে কি ৮ই জুলাই ১৯০৮ সালে পুলিশের তল্লাসী অভিযান হয়েছিল?

(খ) বাদীর বাড়িতে কি বে-আইনিভাবে পুলিশের প্রবেশ ঘটেছিল?

(গ) বাদীকে কি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল?

(ঘ) বাদীকে কি জেল কাস্টডিতে রাখা হয়েছিল অথবা মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল?

(ঙ) বাদীর বিরুদ্ধে কি কোন পুলিশ গ্রাহ্য ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছিল?

এ ছাড়াও মামলাটির মীমাংসার জন্য আরো কয়েকটি প্রথাগত প্রশ্ন রাখা হয়েছিল।

মেদিনীপুরের কাছে নারায়ণগড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার পর, তদন্তের জন্য জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে নারায়ণগড়ে পাঠানো হয়েছিল মৌলভী মজাহারুল হক, লালমোহন গুহ এবং রামসদয় মুখার্জীকে।

এই সময় নারায়ণগড়ের কাছে রেললাইনে প্লেট বসাবার কাজে নিযুক্ত ছিল বেশ কয়েকজন

কুলি। এই সব কুলিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কুলিকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নারায়ণগড় রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগের দায়ে। গ্রেপ্তারিত কুলিদের মধ্যে শিবু নামে একটি কুলি স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিল পট স্লিপারের তলায় তারা গান পাউডার রেখেছিল। তারা নাকি হেড কুলিকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য পট স্লিপারের তলায় এই গান পাউডার রেখেছিল। কারণ পট স্লিপারের বিস্ফোরণ ঘটলে হেড কুলি উপরওয়ালাদের কাছে শাস্তি পাবে। পরে অবশ্য শিবু গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। অন্যান্য কয়েকজন কুলি প্রথম দিকে স্বীকারোক্তি করলেও পরে সব ঘটনা অস্বীকার করে। যাই হোক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নারায়ণগড়ে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত কুলিরা দায়রা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। হাইকোর্টে আপিলেও দণ্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতের আদেশই বহাল থেকেছিল।

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম এত্তেলায় বলা হয়েছিল ৬ই ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে ট্রেন লাইনে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তকালে পুলিশ গুপ্তচরের দেওয়া খবর থেকে নাকি জানতে পেরেছিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা মেরে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। হাইকোর্ট এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন কিভাবে পুলিশের কাছে এই ধরনের গুপ্ত খবর পৌঁছেছিল তার কোন যথোচিত উত্তর সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। মামলার নথি থেকে দেখা গিয়েছিল মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম এত্তেলা দায়েরকারী রাখালচন্দ্র লাহা ছিলেন পুলিশ ইনফর্মার (গুপ্তচর)। ইনফর্মার হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন ১৯০৮ সালের মে মাসে, অথচ পরে এই রাখালচন্দ্র লাহা তাঁর দেওয়া প্রথম এত্তেলার ঘটনা মিথ্যা বলে স্বীকার করেছিলেন। মৌলভী সাহেবের পরামর্শে তাঁকে মিথ্যা ঘটনা দিয়ে এফ. আই. আর. করতে বাধ্য হতে হয়েছিল বলে তিনি আদালতকে জানিয়েছিলেন। সুতরাং প্রথম এত্তেলায় বর্ণিত ঘটনার উপর নির্ভর করে আদালতের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় বলে মামলার রায়ে মন্তব্য করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে নারায়ণগড় মামলায় দণ্ডিত কুলিদের পরবর্তীকালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আপিলের রায় দান করার পর সরকারী আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ হিসেবে যতদূর জানা যায় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বোঝা গিয়েছিল নারায়ণগড়ে বিস্ফোরণে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাটি ছিল বিপ্লবীদের। দণ্ডিত কুলিরা এই ঘটনায় প্রকৃত দোষী ছিল না। প্রকৃত ঘটনা জানতে পারায় দণ্ডিত কুলিদের মুক্তির আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আদালত সরকারের প্রার্থনা অনুযায়ী।

বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় সন্তোষ সম্বন্ধে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সন্তোষ দাস ছিলেন কট্টরপন্থী। কিন্তু তখনকার সময়ে কট্টরপন্থীদের কখনই বেঙ্গল পুলিশে ঢুকতে দেওয়া হ'ত না। লোকাল পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ করা হ'ত। সন্তোষ কট্টরপন্থী হলে কখনই সাব-ইন্সপেক্টারের পদে চাকরি পেতেন না। হাইকোর্ট সরকারের পক্ষের সাক্ষ্য এই ব্যাপারে বিশ্বাস করেননি।

১৯০৬ সালে মৌলভী মজাহারুল হক মেদিনীপুরে পুলিশ অফিসার হিসেবে কিছুদিনের জন্য চাকরি করেছিলেন। তখন তিনি থাকতেন আব্দুল রহমানের বাড়িতে।

১৯০৮ সালে মৌলভী সাহেব যখন পুনর্বার মেদিনীপুরে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কাজে যোগ দিলেন, সেই সময় তাঁর সাথে আবার আব্দুল রহমানের যোগাযোগ হয়। সেই সময় আব্দুল রহমানকে ইনফর্মার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৯০৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী আব্দুল রহমানের কাছ থেকে মৌলভী সাহেব নাকি গুপ্ত খবর পেয়েছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোস এবং শরৎচন্দ্র দে যোগজীবনের রিভলভার নিয়ে মেদিনীপুর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন কাজের ব্যাপারে ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলেন। পুলিশ গুপ্তচর মারফৎ খবর পেয়েছিল ঝাড়গ্রামে ওয়েস্টন সাহেবকে গুলি করে হত্যা করা হবে। হত্যা ষড়যন্ত্রের নায়ক নাকি ছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোস। ২০শে জানুয়ারী সকালেই মিঃ কর্নিশকে মৌলভী সাহেব এই গুপ্ত খবর পৌছে দিয়েছিলেন। এই গুপ্ত খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিঃ কর্নিশ বোম্বে মেইল ট্রেন ধরে ঝাড়গ্রাম পৌছে গিয়েছিলেন। বোম্বে মেইল সেই সময় ঝাড়গ্রামে দাঁড়াত না। কিন্তু মিঃ কর্নিশকে ঝাড়গ্রামে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ট্রেনটিকে ঝাড়গ্রামে দাঁড় করানো হয়েছিল। মিঃ কর্নিশ ঝাড়গ্রামে এসে মিঃ ওয়েস্টনের সাথে দেখা করে তাঁর পাওয়া গুপ্ত সংবাদটি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি মিথ্যা গল্প ফাঁদা হয়েছিল। আব্দুল রহমানকে নাকি বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ একটি রিভলভার হাতে দিয়ে বলেছিলেন এই রিভলবারের সাহায্যে মিঃ ওয়েস্টনকে গুলি করে হত্যা করতে হবে। মিঃ ওয়েস্টনের কথামত মিঃ কর্নিশ মুসলমানদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আব্দুল রহমানের হাতে সত্যেন্দ্রনাথের রিভলভারটি এসে যাওয়ায় আব্দুল রহমান চুপিসারে এনে রিভলভারটি মৌলভী সাহেবকে দিয়েছিলেন। মৌলভী সাহেব এরপর নাকি রিভলভারটি মিঃ কর্নিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বোমা মামলায় রিভলভারটিকে এগ্‌জিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়েছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার পরে যখন মুজফ্‌ফরপুর হত্যা মামলায় ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল এই রিভলভারটি। এর থেকে হাইকোর্ট অনুমান করেছিলেন ক্ষুদিরামের কাছ থেকে নির্দিষ্ট রিভলভারটি মিঃ কর্নিশের হাতে এসে যাওয়ায় সেইটিকে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় দেখানো হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা একটি গল্প ফেঁদে।

২৪শে জানুয়ারী আব্দুল রহমানকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। পরে হাওড়া রেলওয়ে পুলিশ অফিসে ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ প্লাউডেনের কাছে আব্দুল রহমানকে হাজির করানো হ'ল। এই সময়ে রেলওয়ে পুলিশ অফিসে উপস্থিত ছিলেন মিঃ ওয়েস্টন, মিঃ কর্নিশ এবং মৌলভী মজাহারুল হক। ইনফর্মার আব্দুল রহমানের সাথে মিঃ প্লাউডেনের সাথে কথাবার্তা হয়েছিল। এই কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল আব্দুল রহমান নাকি মানিকতলা বোমা ফ্যাক্টরীর হদিস দিয়েছিলেন। তাঁর গুপ্ত খবরের ভিত্তিতেই নাকি মানিকতলার বোমা কারখানাটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। সাক্ষ্য দিতে উঠে এই ব্যাপারে মিঃ প্লাউডেন বলেছিলেন সম্ভবত বোমার বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আব্দুল রহমানের কথা হয়েছিল। কিন্তু মানিকতলা বোমা তৈরির ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে তাঁর সাথে আব্দুল রহমানের কোন কথা হয়নি। হাইকোর্ট প্লাউডেনের বক্তব্য মেনে নিয়েছিলেন। নথিপত্র থেকে বোঝা গিয়েছিল মানিকতলা বোমা ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে ইনফর্মার আব্দুল রহমানের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যায়নি। মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় মিঃ কর্নিশ আরো ২টি রিভলভার এগ্‌জিবিটস্ হিসেবে আদালতে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে রিভলভার ২টি মিঃ কর্নিশের হাতে এসেছিল তার কোন সঠিক প্রমাণ সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি।

হাইকোর্ট আব্দুল রহমানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করায় তাঁর সাক্ষ্যের উপর মোটেই গুরুত্ব দেননি। ২রা মের রিভলভার উদ্ধারের গল্প হাইকোর্টের কাছে মিথ্যা বলে

মনে হয়েছিল। এই রহমানই তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন ৩রা মে তিনি ছিলেন ময়ূরভঞ্জে। সেখান থেকে ৩রা মে যোগজীবনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাই যদি হয় তাহলে আব্দুল রহমানের পক্ষে ২রা মে মেদিনীপুরে উপস্থিত থাকা কখনই সম্ভব ছিল না।

২রা মে মেদিনীপুরে রিভলভার উদ্ধারের গল্প ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্যেন্দ্রনাথকে জড়িয়ে আব্দুল রহমান যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তার কোন অংশই হাইকোর্টের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি।

অপর আর একটি রিভলভার প্রসঙ্গে আব্দুল রহমান বলেছিলেন তিনি নির্দিষ্ট রিভলভারটি উদ্ধার করার পর পুলিশ অফিসার রামসদয় মুখার্জীকে ২৬শে জানুয়ারী রিভলভারটি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার রামসদয় মুখার্জীকে মামলায় সাক্ষীই মানা হয়নি।

"India Arise" ইস্তেহার এবং "বর্তমান রণনীতি" পুস্তিকাটি তল্লাসীকালে উদ্ধারের যে গল্প আব্দুল রহমান সাক্ষ্য দিয়ে আদালতের কাছে বলেছিলেন, সেই গল্প মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার আপিল শুনানীর সময় হাইকোর্ট অবিশ্বাস করেছিলেন।

আব্দুল রহমান বোমা ষড়যন্ত্র মামালায় একটি চমকপ্রদ গল্প শুনিয়েছিলেন।

একবার কলকাতা যাওয়ার সময় আব্দুল রহমানের পকেট ডায়েরিতে নাকি সত্যেন্দ্রনাথ নিজ হাতে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। চিঠিটি লিখেছিলেন কলকাতার এক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে। আব্দুল রহমানকে নাকি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর লেখা চিঠিটি নিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে তাঁর বন্ধুকে চিঠিটি দেখালে তাঁর হাতে একটি বোমা দিয়ে দেবেন তাঁর বন্ধু। এই ডায়েরিটি বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল। ডায়েরিটির লেখা সম্বন্ধে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের মত একজন শিক্ষিত মানুষ নিজ হাতে অপর কারো ডায়েরিতে এই ধরনের গুপ্ত চিঠি লিখতে পারেন না।

কলকাতা হাইকোর্ট আব্দুল রহমান এবং মৌলভী মজাহারুল হক এই দুইজনের সাক্ষ্যই নির্ভরযোগ্য নয় বলে মনে করেছিলেন। এই দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না বলেও হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন। আব্দুল রহমান তাঁর সাক্ষ্যের এক অংশে বলেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ডাকযোগে মিঃ কিংসফোর্ডকে একটি বোমা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট বিশ্বাস করেননি এই গল্প।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরামের বোমায় মুজফ্‌ফরপুরে কেনেডি পরিবারের দুই মহিলার মৃত্যু ঘটল। সম্ভবত এই দিনই কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ও মানিকতলার বাগান বাড়ীর বিপ্লবীদের আখড়া থেকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল।

এই সময় মেদিনীপুরের উপর ইংরেজ প্রশাসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কারণ বোধ হয় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মেদিনীপুরের মানুষ। এঁদের দুজনেরই ফাঁসি হয়েছিল ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল তাঁর বোমায় দুই মহিলার মৃত্যু ঘটায়। সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয় এক ইনফর্মার (গুপ্তচরকে) হত্যা করায়।

ফাঁসির মঞ্চের এই মহান দুই বিপ্লবীর নাম জানলেও বর্তমান প্রজন্মের মানুষ ক'জনই-বা এই দুই বিপ্লবীর সমগ্র জীবন সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন?

দেওয়ানী মামলায় সাক্ষ্য দিতে এসে পিয়ারীমোহনের নাবালক চাকর বনমালী বলেছিল, জুন মাসের শেষাশেষি একদিন কার্তিক নামে এক পুলিশ কনস্টেবল তাকে নিয়ে গিয়েছিল মৌলভী সাহেবের বাড়িতে। মৌলভী সাহেব তাকে একটি ভাল চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার

প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। ৭ই জুলাই আবার তাকে মৌলভী সাহেবের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তাকে বলা হয় নতুন চাকরি পেতে হলে তাকে একটি কাজ করতে হবে। কাজটি সম্বন্ধে বনমালী জানতে চাইলে মৌলভী সাহেব তার হাতে একটি বোমা দিয়ে বলেছিলেন বোমাটি সন্তোযের ঘরে তাঁর বিছানার তলায় গুপ্ত ভাবে রাখতে হবে। বনমালী যাতে ভয় না পায় তার জন্য তাঁর সঙ্গে একটি কনস্টেবলকে দেওয়া হয়েছিল। বনমালী বাড়িতে এসে দেখল সন্তোষ তাঁর নিজের ঘরে রয়েছেন, তাই তার পক্ষে বোমাটিকে সন্তোযের ঘরে রাখা সম্ভব হ'ল না। বনমালী বোমাটিকে পিয়ারীমোহনের বৈঠকখানা ঘরে দরজার কোণে লুকিয়ে রেখেছিল। সঙ্গের কনস্টেবল বাইরে এসে বৈঠকখানায় বোমাটি লুকিয়ে রাখার খবরটি দিয়ে গিয়েছিল। কনস্টেবলটি এই খবর পৌঁছে দিয়েছিল মৌলভী সাহেবকে। ৮ই জুলাই পুলিশ তল্লাসীতে পিয়ারীমোহনের বৈঠকখানা ঘর থেকে বোমাটি উদ্ধার করার পর মৌলভী সাহেব সকলের অজান্তে লোক দিয়ে বনমালীকে সাঁতরাগাছিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পরে সাঁতরাগাছি থেকে বনমালীকে নিয়ে আসা হয় পোদরাতে। কালীকৃষ্ণ বোস নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বনমালীকে কাজে লাগানো হয়েছিলো। পোদরাতে মাস তিনেক কাজ করার পর পূজার ছুটিতে বনমালী মেদিনীপুরে আবার ফিরে এসেছিলো।

বিবাদীপক্ষ থেকে বনমালীর গল্প সমস্তটাই অস্বীকার করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিবাদীরা বলেছিলেন কার্তিক নামে জুন জুলাই মাসে কোন কনস্টেবল মেদিনীপুরে কর্মরত ছিল না। কিন্তু বনমালী আদালতে কার্তিককে শনাক্ত করতে পেরেছিল। বলেছিল তার শনাক্ত করা কনস্টেবলটিই তাকে মৌলভী সাহেবের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।

বিবাদীপক্ষ থেকে অক্ষয়কুমার পাল নামে এক ভদ্রলোককে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন, তিনি নারাজোলের রাজাকে শহরে বন্দেমাতরম মিছিলে অংশগ্রহণ করতে দেখেছিলেন। হাইকোর্ট অক্ষয় পালের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করলেন। হাইকোর্ট বললেন ভাবতেও আশ্চর্য লাগে নারাজোলের রাজা বন্দেমাতরম মিছিলে থাকবেন শহরের রাস্তায়। এই অক্ষয়কুমার তাঁর সাক্ষ্যতে আরো বলেছিলেন মুজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা ছোঁড়ার ঘটনার ৬/৭ দিন আগে মেদিনীপুরে দেবদাস করণের বাড়ীতে একটি গুপ্ত সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় অক্ষয় পাল নাকি নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি সেই গুপ্তসভায় সন্তোষ দাসকেও উপস্থিত থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু যে দিনটির উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই দিনটিতে সন্তোষ দাস ছিলেন রাঁচীতে তাঁর ট্রেনিং কলেজে। হাইকোর্ট বুঝতে পারলেন অক্ষয় পাল মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন উঠেছিল হাইকোর্টের কাছে। নথিপত্র থেকে দেখা গেল ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই থেকে ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুলিশ সন্দেহজনক অনেকের বাড়ী তল্লাসী করেছে, সন্দেহজনক কাগজপত্র উদ্ধার করেছে, অভিযুক্ত অনেকের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে, অনেককে গ্রেপ্তার করেছে। অথচ ৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে এফ. আই. আর. করে কোন নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়নি। অথচ কলকাতা থেকে তদানীন্তন ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ মোরষেড্ এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ প্লাউডেন ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে এসেছিলেন। এই সময় তাদের নজরে এল মেদিনীপুরে বোমা ষড়যন্ত্র নিয়ে এত হৈ চৈ শুরু হলেও তখনও পর্যন্ত কোন এফ. আই. আর. করা হয়নি। এরপর ইন্সপেক্টার জেনারেল ও ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল কলকাতায় ফিরে এসে সি. আই. ডি-র ঝানু অফিসার রামসদয় মুখার্জীকে এফ.

আই. আর. তৈরি করার ভার অর্পণ করলেন। রামসদয় মুখার্জীর ভালই জানা ছিল কীভাবে অভিযুক্তদের মামলায় গাঁথতে হয়। এফ. আই. আর. হিসেবে দাখিল করার জন্য ড্রাফটি তৈরি করলেন সি. আই. ডি. অফিসার রামসদয় মুখার্জী। পরে ইন্সপেক্টার জেনারেল অ্যাটর্নি উইথলকে দিয়ে ড্রাফটি সেটেল করিয়ে নিলেন। এই সব ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ায় হাইকোর্ট এই ব্যাপারে খুব কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। হাইকোর্ট বলেছিলেন অ্যাটর্নি দিয়ে এফ. আই. আর-এর ড্রাফট সেটেল করানোর ঘটনা নজিরহীন। পুলিশ প্রশাসনের এই ধরনের কার্য ও মনোভাব লজ্জাজনক ও অভিসন্ধিমূলক।

দেওয়ানী মামলাটিতে বাদীর পক্ষে ৩০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। বাদীর সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন মেদিনীপুরের প্রখ্যাত আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ মাইতি, প্লিডার রাধানাথ পতি, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী প্রভৃতি সম্মানীয় ব্যক্তিরা।

ইনফর্মার রাখালচন্দ্র লাহা ওপরওয়ালাদের গুপ্ত খবর দিয়ে বলেছিলেন ৩রা জুলাই মেদিনীপুরে উপেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল এবং বিপ্লবী গান গাওয়া হয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ মাইতি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন ৩রা জুলাই বা তার আগে পরে কোনদিনই তাঁর বাড়িতে কোন সভা হয়নি। সুতরাং সভায় বক্তৃতা করা বা গান বাজনার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। রাধানাথ পতি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তিনি বিপ্লবীদের গুপ্ত সভায় যোগদান করেছিলেন এবং অনেক সময় বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্য করতেন। রাধানাথ পতি আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তিনি কোনদিন কোন সভা সমিতিতে যোগ দেননি বা বিপ্লবীদের কোন সময় আর্থিক সাহায্য করেন নি। এ ছাড়া রাখালের গুপ্ত রিপোর্টে ছিল রাধানাথ পতি, ২৩শে জুন কামিনীর বেশ্যালয়ে যে গুপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাধানাথ পতি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন তিনি তাঁর জীবনে কোনদিন কোন বেশ্যালয়ে যাননি। পরের সাক্ষী অবিনাশচন্দ্র মিত্র ছিলেন মেদিনীপুরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তিনি সাক্ষ্য দিতে উঠে বলেছিলেন, তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন সৈনিক। তিনি স্বদেশী দোকানও খুলেছিলেন। কিন্তু রাখাল লাহার রিপোর্টে তাঁর সম্বন্ধে যা হলা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও তাঁর সাক্ষ্যতে কোন গুপ্ত সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়ার ঘটনা অস্বীকার করেছিলেন। এইসব বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য হাইকোর্ট বিশ্বাস করেছিলেন।

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় রাখাল লাহার গুপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রিয়লাল ঘোষকে জড়ানো হয়েছিল। প্রিয়লাল সম্বন্ধে হাইকোর্ট বলেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের একজন দৃঢ়চেতা সৈনিক। বিদেশী বয়কট আন্দোলনে প্রিয়লাল ছিলেন সক্রিয় কর্মী। এমনকি সত্যেন্দ্রনাথের পরিচালনায় প্রিয়লালের বাড়ীতে তাঁতশাল খোলা হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিয়লালের আত্মীয়।

নারাজোলের রাজাকে রাখাল লাহার গুপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা ছিল নারাজোলের রাজা বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করেন। রাজা সাহেব নাকি ৭ই জুলাই যামিনী মল্লিকের বাড়িতে বোমা তৈরি করা দেখতে গিয়েছিলেন।

নারাজোলের রাজা এই ব্যাপারে বলেছিলেন যে তাঁকে মিথ্যা করে বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে জানতে পেরে তিনি পুলিশকে ৪০,০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে নিজেকে

বাঁচিয়েছিলেন। হাইকোর্ট নারাজোলের রাজার সম্বন্ধে পুলিশ ইনফর্মারের রিপোর্টটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছিলেন। রাখাল লাহা ছিলেন একজন মদাসক্ত ব্যক্তি। তাঁর দেওয়া রিপোর্টগুলি ছিল মিথ্যায় ভরা। আদালতের সন্দেহ ছিল রিপোর্টগুলি রাখাল লাহার নিজ হাতে লেখা না, মৌলভী সাহেবের তৈরি। রাখাল লাহার সাক্ষ্য ছাড়া এই ব্যাপারের সত্যাসত্য বোঝা আদালতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাখালচন্দ্র লাহাকে অবশ্য দেওয়ানী মামলায় বাদী পক্ষ সাক্ষী মানেননি।

হাইকোর্ট ক্ষতিপূরণের মামলায় উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ, মামলায় দাখিল করা এগ্‌জিবিট্‌স থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে—রাখালচন্দ্র লাহার দেওয়া গুপ্ত রিপোর্টগুলিতে সত্য ঘটনা কখনই প্রতিফলিত হয়নি। রিপোর্টগুলি ছিল মিথ্যায় ভরা। মামলার বাদীও প্রমাণ করতে পারেননি তার বৈঠকখানা থেকে প্রাপ্ত বোমাটি মৌলভী মজাহারুল হকের প্ররোচনাতেই রাখা হয়েছিল কিনা!

মামলার ১নং বিবাদী মিঃ ওয়েস্টন সরলভাবে রাখালচন্দ্র লাহার রিপোর্টে বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্বাস করেছিলেন। এ ছাড়াও ২নং এবং ৩নং বিবাদীরা অর্থাৎ মৌলভী মজাহারুল হক এবং লালমোহন গুহ মিঃ ওয়েস্টনকে সব সময় ভুল বুঝিয়েছিলেন এবং রাখালচন্দ্র লাহার রিপোর্টগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে তাঁকে বোঝানো হয়েছিল। নথিপত্র থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে যে মৌলভী মজাহারুল এবং লালমোহন জানতেন রাখাল লাহার রিপোর্টগুলি অসত্য ঘটনা দিয়ে তৈরি করা। এ ছাড়া এই দুইজন বিবাদী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করেছেন, সাক্ষীদের মিথ্য সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছেন। অভিযুক্ত আসামীদের কাছ থেকে নানা ফন্দিতে স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বে-আইনীভাবে বাদীকে গ্রেপ্তার করেছেন। পরিকল্পনা মাফিক অভিযুক্তদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছেন; এই দুইজন বিবাদী পুলিশ অফিসারই ছিলেন মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলাটি মিথ্যা করে তৈরি করার আসল পুরোধা। বাদী পিয়ারীমোহনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সন্তোষের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। পিয়ারীমোহনকে ছেড়ে দেওয়ার মাশুল হিসেবে সন্তোষ স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হবেন এই ছিল এই দুই বিবাদীর মতলব। এই বিবাদী দুইজন ভালভাবেই জানতেন পিয়ারীমোহন কোনভাবেই বিপ্লবী কাজকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন না। গ্রেপ্তারের আগে নানাভাবে পিয়ারীমোহনকে ভয় দেখানো হয়েছিল সন্তোষকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করতে। যখন কোনভাবেই সন্তোষকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করানো যাচ্ছিল না, তখন পিয়ারীমোহনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। নতুবা ২৩শে জুলাই তাঁকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করার যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ ছিল না। অবশ্য মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে প্রমাণিত মিঃ ওয়েস্টনও ২নং এবং ৩নং বিবাদীর কাজকর্মকে অনুমোদন করেছিলেন। মিঃ ওয়েস্টনের জ্ঞাতসারে এবং তাঁর অনুমোদনে মৌলভী সাহেব এবং লালমোহন গুহ বাদীসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছিলেন। ফৌজদারী আইনে এমন কোন বিধান নেই যে আসামীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাপ সৃষ্টি করা হবে নানাভাবে। হাইকোর্ট বিভিন্ন মামলার নজীর বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে তাঁর ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দাবি করে দেওয়ানী মামলা করতে পারেন। আইনের নিরিখে বাদী পিয়ারীমোহনের ক্ষতিপূরণের দাবী সঠিক বলে হাইকোর্ট মেনে নিয়েছিলেন। হাইকোর্ট আরো বলেছিলেন বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি না হলেও বাদীকে মিথ্যা ফৌজদারী মামলাটির জন্য বেশ কিছু পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

মিথ্যা মামলায় বাদীকে এবং তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করায় বাদীর সমগ্র পরিবারের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল বিরাট একটা ঝড়।

সব দিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্ট ক্ষতিপূরণ মামলায় ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। বিবাদীদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল ক্ষতিপূরণের টাকাটা যেন বাদীকে দিয়ে দেওয়া হয়।

বাদী পিয়ারীমোহন দাস ক্ষতিপূরণের মামলাটি দায়ের করেছিলেন প্রথমে মেদিনীপুরের সাব-জজের আদালতে। সাব-জজের আদালতের এই ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবীর মামলা শোনার অধিকার না থাকায় মামলাটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ১৯১০ সালে।

মামলাটির শুনানি হয়েছিল মাননীয় বিচারপতি ফ্লেচার সাহেবের কাছে।

কলকাতা হাইকোর্ট মামলাটিতে রায় দান করেছিলেন ১৯১১ সালের ৭ই আগস্ট।

বাদীর পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী ছিলেন মিঃ কে. বি. দত্ত, মিঃ এইচ. ডি. বোস, মিঃ এ. এন. চৌধুরী, মিঃ এস. সি. রায়, মিঃ বি. মিত্র, মিঃ পি. কে. সেন, মিঃ এ. সি. দত্ত, ডঃ এ. সুরাবর্দি এবং মিঃ এ. দত্ত।

বিবাদীদের পক্ষে ছিলেন জি. এইচ. বি. কেনরিক, অ্যাডভোকেট জেনারেল, মিঃ গার্থ, আলী ইমাম, মিঃ পি. এম. দত্ত ও আমেদ সরফুদ্দিন।

বাদীর অ্যাটর্নি ছিলেন জে. সি. দত্ত। বিবাদীদের অ্যাটর্নি ছিল অর. ডিগনাম অ্যান্ড কোম্পানী।

হাইকোর্টে মামলাটির শুনানির সময় মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং তাঁর সহকারী মিঃ নরটন খুবই অপমানসূচক ব্যবহার করেছিলেন বাদীর আইনজীবীদের প্রতি।

মাননীয় বিচারপতি মামলার রায়ে বিরক্তি প্রকাশ করে এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন রায়ের উপসংহারে।

মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলা

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে ঢাকার মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলাটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল বিশেষ চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যে একাধিক বিপ্লবীদল ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে বিভিন্ন ডাকাতিতে শামিল হয়েছিল। বিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত ডাকাতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বরা ডাকাতি, নরিয়া ডাকাতি, রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি, দরিয়াপুর ডাকাতি, শিবপুর ডাকাতি, বিঘাটি ডাকাতি, মড়িহাল ডাকাতি, মুসাপুর ডাকাতি, নেত্রা ডাকাতি, মহারাজপুর ডাকাতি, হলুদবাড়ি ডাকাতি।

ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করলেন। এই সময় থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। বিপ্লবী মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বাংলার কিশোর ও যুবকদের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বিপ্লবী দল গড়তে এগিয়ে এসেছিলেন ঢাকায় পুলিনবিহারী দাস, কলকাতায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতারা।

ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশ সরকারকে অপসারণ করার সংকল্প নিয়েছিল একাধিক বিপ্লবী সমিতি ও বিপ্লবী সংগঠন। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আওয়াজ তোলা হয়েছিল।

১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একাধিক বিপ্লবী সংগঠন। দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করার দীক্ষা নিয়েছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্যরা।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১০ সাল বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে এক স্মরণীয় কাল। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

বরা ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২রা জুন। এই ডাকাতিটি হয়েছিল বরার শশীশেখরের বাড়িতে। ১৯০৮ সালের ১৪ই আগস্ট সতীপাড়ায় বিপ্লবীরা নৌকো চুরি করেছিলেন ডাকাতির উদ্দেশ্যে। রাজেন্দ্রপুরে ট্রেন ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯০৯ সালের ১১ই অক্টোবর। ট্রেনে ডাকাতি করার সময় একজন খুন হয়েছিল। এর কিছুদিন পর এক রাতে নরিয়ার বাজারে এবং নরিয়ার একাধিক বাড়ীতে ডাকাতি করেছিলেন বিপ্লবী সদস্যরা। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্বদেশীরা ডাকাতি করেছিলেন চিংড়িপোতায়। ১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল ডাকাতি করা হয়েছিল হাওড়ার শিবপুরে। বিঘাটির ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। মড়িহাল ডাকাতির তারিখ ছিল ২রা ডিসেম্বর, ১৯০৮। মুসাপুরের ডাকাতিটি হয় ১৯০৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। নেত্রায় ডাকাতি করা হয়েছিল ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৮। ১৯০৯ সালের ২৭শে জুলাই হয়েছিল মহারাজপুরের ডাকাতি। হলুদবাড়ির ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৮শে অক্টোবর।

বিপ্লবী সংগঠনগুলির গুপ্ত ঘাঁটিগুলি ছিল কলকাতা, ঢাকা, শিবপুর, খিদিরপুর, নাটোর,

হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোর প্রভৃতি শহরে। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা তৈরি করার মশলা (বিস্ফোরক পদার্থ), মিলিটারি কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাদি, ইস্তাহার ছাপানো, বিপ্লবী বই প্রকাশনে বিপ্লবী দলগুলির প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। এই অর্থ সংগ্রহ করতেই বিপ্লবী দলের নির্দেশে দলের সদস্যরা একাধিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে গুপ্ত খবর পৌঁছে গিয়েছিল বিপ্লবী সংগঠনের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্বন্ধে। গুপ্ত সমিতির অনেক কাজকর্মের হদিস পেয়ে গিয়েছিলেন পুলিশ প্রশাসন। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বাংলার লেঃ গভর্নরের বিশেষ ট্রেনটিকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন গুপ্ত খবরের সত্যতা। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসন বিশেষ গুরুত্বের সাথে জাল বিস্তার করেছিলেন বিপ্লবীদের প্রতিটি কাজকর্ম ও তাঁদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য। গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশের আনাচে কানাচে। পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ খোলা হয়েছিল। বিপ্লবীদের খোঁজ-খবর রাখতে বিশেষ একশ্রেণীর মানুষকে নিয়োগ করেছিলেন গুপ্তভাবে। ব্রিটিশ প্রশাসন দ্বারা নিয়োজিত এই সব দালালরা বিপ্লবীদের বন্ধু সেজে সত্যমিথ্যা খবর সংগ্রহ করে গুপ্তভাবে সেই সব খবর পৌঁছে দিত নির্দিষ্ট সরকারী প্রশাসনিক আমলাদের।

১৯০৮ সালের ১১ই মার্চ চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ির নির্দিষ্ট কামরায় বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত বোমাটি থেকে কোন বিস্ফোরণ না ঘটায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন চন্দননগরের মেয়র বা তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা। ২০শে এপ্রিল, ১৯০৮ বিশেষ একটি গুপ্ত খবর পৌঁছে গিয়েছিল সরকারী প্রশাসনের কাছে। গুপ্ত খবরটি ছিল কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের জীবননাশ করার। এই খবর পাওয়ার পর যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল প্রশাসনিক স্তরে। কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মুজাফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে বোমা বিস্ফোরণে মারা গেলেন কেনেডি পরিবারের দুই মহিলা। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকি। এই হত্যা দুটিকে কেন্দ্র করে মামলা হ'ল। ক্ষুদিরাম বোসকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। মামলায় ফাঁসির হুকুম হয়েছিল ক্ষুদিরামের। হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তার হওয়ার আগের মুহূর্তে আত্মহত্যা করেছিলেন সায়েনায়েড খেয়ে। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। যুগান্তর দলের সম্বন্ধে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে খবর ছিল। ১৯০৮ সালের ২রা মে পুলিশের উচ্চাসনের অফিসাররা পুলিশবাহিনী সমেত তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে তল্লাসী অভিযান চালিয়েছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কলকাতায় মানিকতলার বাগানবাড়িতে এবং বিপ্লবীদের আরো অন্যান্য গুপ্ত ডেরায়। তল্লাসীতে পাওয়া গিয়েছিল বহু সন্দেহজনক কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র।

বাগানবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শিশিরকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র মল্লিক এবং বিভূতিভূষণ সরকারকে। ৩৮/৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার হলেন হেমচন্দ্র দাস, ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে ধরা পড়লেন নিরাপদ রায়। ৪৮, গ্রে স্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার করা হ'ল অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শৈলেন্দ্রনাথ বোসকে। খুলনা থেকে ধরা হ'ল সুধীরকুমার সরকারকে ১৯০৮ সালের ১০ই মে। একই দিনে ছাত্রা থেকে গ্রেপ্তার হলেন হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল। সিলেট থেকে ১৫ই

মে ধরা পড়লেন বরেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং সুশীলকুমার সেন। কৃষ্ণজীবন সান্যাল কনসাঁটে ধরা পড়লেন ১৬ই মে। ৩৭ নম্বর কলেজ স্ট্রীট থেকে ২৩শে জুন গ্রেপ্তার করা হ'ল ইন্দ্রনাথ নন্দীকে। ৩০শে জুলাই নাগপুর থেকে গ্রেপ্তার করাহল কৃষ্ণহরি কানিকে।

রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র মামলায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা আদালত। এই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯০৯ সালের ৬ই মে। পরে আপিলে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাতিল করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

১৯০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মনোমোহন ঘোষ তাঁর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের একটি চিঠি ছাপিয়ে রাজরোষে পড়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের লেখা প্রবন্ধটির শীর্ষক ছিল—"দেশবাসীর প্রতি' (ইংরেজী অনুবাদ ছিল "To My Countrymen")। কর্মযোগিনের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের লেখা প্রবন্ধটি ছাপায় মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(এ) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। কলকাতার শ্রীনারায়ণ প্রেস থেকে ছাপা হ'ত "কর্মযোগিন" পত্রিকাটি। অরবিন্দর লেখা প্রবন্ধটিকে রাজদ্রোহিতামূলক মনে করায় পুলিশ 'শ্রীনারায়ণ" প্রেসে তল্লাসী চালিয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মনোমোহন ঘোষকে। পরে কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ১৯১০ সালের ১৮ই জুন মনোমোহন ঘোষের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। পরে তিনি হাইকোর্ট থেকে আপিলে ছাড়া পেয়েছিলেন।

এবার আসা যাক্ মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলায়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সাথে মুন্সিগঞ্জের ললিতচন্দ্র চন্দ্রচৌধুরীর যোগাযোগ ছিল। গোয়েন্দা পুলিশের প্রখর দৃষ্টি ছিল ললিতচন্দ্রের প্রতি।

১৯১০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় হঠাৎ পুলিশ ললিতচন্দ্রের মুন্সিগঞ্জের বাড়ীতে তল্লাসী করল। পুলিশের কাছে খবর ছিল ললিতচন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে বিস্ফোরক পদার্থে তৈরি বোমা সঙ্গে নিয়ে ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তল্লাসীতে ১৩টি বোমা পাওয়া গিয়েছিল ললিতের বাড়ি থেকে। বোমাগুলি রাখা ছিল ঘরের মধ্যে একটি টিনের বাক্সে। এ ছাড়া ললিতচন্দ্রের বাড়ি থেকে তল্লাসী অভিযানের সময় পাওয়া গেল একাধিক লেখা পোস্টকার্ড, নানা চিঠিপত্র, বোমা বানাবার ফর্মুলা, সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা কিছু কাগজপত্র, বাড়ীর ৩টি নক্শা। ১৩ জনের নাম লেখা একটি তালিকা, ৪টি নতুন টর্চ লাইট এবং ৪টি তরবারী। তল্লাসীর সময় ললিতচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতীন্দ্র এবং হরকুমার। সেইদিনই ললিতচন্দ্র সহ জ্যোতীন্দ্র এবং হরকুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৩টি বোমা সমেত অন্যান্য সন্দেহজনক মালপত্র পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল ফৌজদারী কার্যবিধির আইন মোতাবেক। ললিতচন্দ্রের বাড়ি থেকে পাওয়া বোমাগুলি পরীক্ষার জন্য বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বোমা বিশেষজ্ঞ বোমাগুলি পরীক্ষা করে তাঁর অভিমত জানিয়ে বলেছিলেন বোমাগুলি ছিল মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই বোমা বিস্ফোরণে মানুষের জীবনহানি ঘটতে পারে। ৫ই সেপ্টেম্বর পুলিশ তল্লাসীর পর সেই রাতেই কিংবা ৬ই সেপ্টেম্বর ভোরে প্রথম এত্তেলা (এফ্-আই-আর) দেওয়া হয়েছিল পুলিশের পক্ষে। প্রথম এত্তেলা-বলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল ললিতচন্দ্র, জ্যোতীন্দ্র এবং হরকুমারের বিরুদ্ধে। প্রথম এত্তেলা-বলে নিছক ডাকাতি করার প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছিল। বিস্ফোরক পদার্থ আইনের কোন দণ্ডনীয় ধারা সন্নিবেশ করা হয়নি প্রথম এত্তেলায়, যদিও বোমা পাওয়ার ঘটনার উল্লেখ ছিল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্ভবত ৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল কেবলমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ ধারায়। অভিযোগপত্রে তল্লাসী করে পাওয়া বোমার কথা পরিষ্কার করে বলা থাকলেও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪(বি) ধারা যোগ করা হয়নি। বিস্ফোরক পদার্থ আইনে অভিযুক্ত করতে গেলে আইন মোতাবেক প্রয়োজন ছিল লোকাল গভর্নমেন্টের অনুমোদনপত্র। বোধহয় ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এসে না পৌছানর জন্যে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের নির্দিষ্ট দণ্ডনীয় ধারাটি অভিযোগপত্রে যুক্ত করা যায়নি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ই সেপ্টেম্বর ঢাকার তদানীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন। এইবার যুক্ত করা হয়েছিল বিস্ফোরক পদার্থ আইনের দণ্ডনীয় ধারাটি। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সরকারী অনুমোদনপত্র।

পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের দাখিল-করা অভিযোগপত্র বলেই মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলাটির বিচারপর্ব চলেছিল।

পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত ৩ জন আসামীকেই ঢাকার দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল দায়রা আদালতে বিচারের জন্য। ঢাকার দায়রা বিচারপতি সঙ্গে দুজন অ্যাসেসর নিয়ে মামলাটি শুনেছিলেন। মামলার শুনানী শেষ হলে অ্যাসেসর দুজনই অভিযুক্ত আসামীরা সবাই নির্দোষ বলে তাঁদের অভিমত বা সিদ্ধান্ত দায়রা বিচারপতিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অভিযুক্ত আসামী জ্যোতীন্দ্র এবং হরকুমারের ক্ষেত্রে অ্যাসেসরদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও ললিতচন্দ্রের ক্ষেত্রে দায়রা বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। দায়রা বিচারপতি ১৯১১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ললিতচন্দ্র চন্দ্রচৌধুরীকে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রায় দান করেছিলেন। জ্যোতীন্দ্র এবং হরকুমারকে দিয়েছিলেন মুক্তির আদেশ। ললিতচন্দ্রকে দেওয়া হয়েছিল ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

দণ্ডিত আসামী ললিতচন্দ্র চন্দ্রচৌধুরী তাঁর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টে ললিতচন্দ্রের আপিলটির শুনানী হয়েছিল ১৯১১ সালের আগস্ট মাসে। আপিল মামলাটি শুনেছিলেন বিচারপতি ক্যাপরেজ এবং বিচারপতি সরফুদ্দীনকে নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ।

দণ্ডিত আসামী ললিতচন্দ্রের হয়ে হাইকোর্টে সওয়াল করেছিলেন তদানীন্তনকালের দুজন আইনজীবী। এই দুজন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন শ্রীমন্মথনাথ মুখার্জী এবং শ্রীনরেন্দ্রকুমার বোস। সরকার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তদানীন্তন কালের অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ কেনরিক।

শুনানির সময় হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নথিপত্র থেকে দেখতে পেলেন দায়রা আদালত অ্যাসেসরদের অভিমত বা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রথাবহির্ভূতভাবে। পেন্সিলে লিখে অ্যাসেসররা দায়রা আদালতকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন।

আসামীপক্ষ থেকে প্রথমেই সওয়াল করা হয়েছিল ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মামলাটির অভিযোগপত্র গ্রহণ করার কোন এক্তিয়ারই ছিল না। ঘটনাস্থল ছিল মুন্সিগঞ্জে। তাছাড়া মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পূর্বেই একটি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বে-আইনীভাবে অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন এবং অভিযুক্তদের বিচারের জন্য দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছিলেন। অথচ

সাব-ইন্সপেক্টারের দাখিল-করা অভিযোগপত্রটি রয়ে গেল মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

আসামীপক্ষের আইনজীবীদের এই সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট একাধিক নজিরের উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের পেশ-করা অভিযোগপত্রটি সম্পূর্ণ আইনগ্রাহ্য এবং ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করে কিছুমাত্র ভুল করেন নি। এই অভিযোগপত্রের উপর নির্ভর করেই পরবর্তী সময়ে মূল মামলাটির বিচারপর্ব চলেছিল। তাছাড়া বিস্ফোরক পদার্থ আইনে বিচারের জন্য সরকারী অনুমোদনপত্রটি দাখিল করা হয়েছিল ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কোন সরকারী অনুমোদনপত্র দাখিল করাই হয়নি। সরকারি অনুমোদন ব্যতিরেকে মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে বিচার করার জন্য দায়রা আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের সোপর্দ করার কোন আইনগত ক্ষমতা ছিল না।

হাইকোর্টের কাছে এইবার মূল প্রশ্ন উঠল—ললিতচন্দ্র তাঁর বাড়িতে বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরি বোমাগুলি রেখেছিলেন কিনা?

এই মূল প্রশ্নটির সমাধানে হাইকোর্ট দায়রা আদালতের নথিপত্র সাক্ষ্যসাবুদ আলোচনা করলেন। নথিপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, ১৯১০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের আগে থেকেই ললিতচন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট বাড়িটিতেই থাকতেন। তাঁর লেখা একাধিক চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছিল তাঁর বাড়ি থেকে। একটি চিঠিতে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সাথে যে তাঁর যোগাযোগ ছিল তা অনুমান করতে আদালতের কাছে কোন অসুবিধা হয়নি।

ঢাকার দায়রা আদালতে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ডঃ অযোধ্যারাম দেব, পণ্ডিত মুকুন্দানন্দ শিবরত্ন, শ্রীমনোমোহন দে প্রভৃতি সাক্ষীরা।

ডঃ অযোধ্যারাম দেব তাঁর সাক্ষ্যতে দায়রা আদালতকে বলেছিলেন, তিনি ললিতচন্দ্রকে লিখতে দেখেছিলেন। তাই ললিতচন্দ্রের লেখা তিনি চেনেন। তিনি আরো বলেছিলেন, তিনি তাঁর সহপাঠী মনসার বাড়িতে বহুবার গিয়েছেন। মনসা ছিলেন অমূল্যকৃষ্ণদেবের শ্যালক। অমূল্যকৃষ্ণর সাথে ললিতচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। চিঠির আদান-প্রদানও ছিল। তিনি পুলিশের নেওয়া চিঠির লেখা দেখে সেই লেখা ললিতচন্দ্রের বলে শনাক্ত করেছিলেন। হাইকোর্ট অবশ্য এই ধরনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন নি।

হাইকোর্ট বিশ্বাস করেছিলেন, পণ্ডিত মুকুন্দানন্দ শিবরত্নের সাক্ষ্যকে। ললিতচন্দ্র চন্দ্রচৌধুরী ছাত্রাবস্থায় যে স্কুলে পড়েছিলেন, পণ্ডিত শিবরত্ন ছিলেন সেই স্কুলের হেড্ পণ্ডিত। অর্থাৎ পণ্ডিত মশাইয়ের একসময় ছাত্র ছিলেন ললিতচন্দ্র। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন—ললিতচন্দ্রের বাংলা হস্তাক্ষর তিনি চেনেন। তাঁকে দেখানো চিঠিপত্র থেকে তিনি ললিতচন্দ্রের বাংলা হস্তাক্ষর শনাক্ত করেছিলেন। বোমা রাখার টিনের বাক্সটির উপর যে লেবেলটি লাগানো ছিল, সেই লেবেলের লেখা ললিতচন্দ্রের বলে চিনিয়ে দিয়েছিলেন পণ্ডিতমশাই। চিঠিপত্র থেকেও তাঁর ছাত্র ললিতের হাতের লেখা চিনতে পেরেছিলেন পণ্ডিত শিবরত্ন। সরকার পক্ষের সাক্ষী মনোমোহন দে ছিলেন একজন তালুকদার। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন—তিনি ললিতচন্দ্রকে অনেকবার হরিচরণ ঘোষের বাড়িতে বসে লিখতে দেখেছেন। তাই তিনি ললিতচন্দ্রের হস্তাক্ষর চেনেন। হাইকোর্ট অবশ্য ডঃ অযোধ্যারাম দেবের মতই এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকেও বিশ্বাস করেন নি।

ললিতের বাড়ি থেকে পাওয়া ১৩টি বোমাই ছিল একটি কেনেস্তারায়। লেবেলটি লাগানো

ছিল কেনেস্তারার গায়ে। লেবেলের উপর লেখা ছিল অমূল্যর ঠিকানা। অমূল্য ছিলেন ললিতচন্দ্রের সহপাঠী। মামলাটির বিচারের পূর্বে অমূল্যর মৃত্যু হয়েছিল। সেই জন্যে তাঁকে সাক্ষী মানা যায় নি। লেবেলটিতে প্রেরকের নাম ছিল—"কামিনী"। বোমাভর্তি বাক্সটির পাঠানোর স্থান হিসেবে লেখা ছিল—"ঢাকা"। মুন্সিগঞ্জের নামের কোন উল্লেখ ছিল না।

হাইকোর্ট এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন—মনে হয় কোনভাবে মাঝপথে বোমার বাক্সটি ধরা পড়ে গেলে যাতে না বোঝা যায় যে মুন্সিগঞ্জ থেকে বোমার বাক্সটি পার্শেল করা হয়েছে এবং ললিতচন্দ্র পার্শেলটির প্রেরক সেই উদ্দেশ্যেই লেবেলের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মুন্সিগঞ্জের জায়গায় 'ঢাকা' এবং প্রেরকের নামের জায়গায় 'কামিনী' লেখা হয়েছিল।

ললিতের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা একটি বিশেষ চিঠিকে মামলায় এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল, চিঠিটি ললিত চৌধুরীর লেখা। চিঠিটি লেখা হয়েছিল মনোমোহন সূত্রধর নামে এক ব্যক্তিকে। খুব সতর্কতার সাথে সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠিটি লেখা হয়েছিল। চিঠিটি মামলার স্বার্থে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। চিঠির ইংরেজী অনুবাদ ছিল এই রকম—

"I will shortly join the work of which I told you. See that you do not waver. Moreover, procure, if you can a few articles for yourselves which you will carry in your own hands. The Procession will be out on the 13th–14th."

সিমুলিয়া পোস্ট অফিসের সাব-পোস্টমাস্টার তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, ললিতের পোস্ট করা কতকগুলি চিঠি তাঁর কাছে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তিনি চিঠিগুলির নকল রেখেছিলেন। পরে চিঠিগুলির নকল এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল। বোমার ফর্মুলার সাথে বোমার আকৃতি কি রকম হবে তার ছবি আঁকা ছিল একটি সাদা কাগজে, কাগজটি ললিতের বাড়ি থেকে তল্লাসীর সময় পাওয়া গিয়েছিল। মামলায় এই বিশেষ কাগজটিকে এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল।

রাজদ্রোহিতামূলক লেখা কবিতা পাওয়া গিয়েছিল ললিতের বাড়ি থেকে। পণ্ডিত মুকুন্দানন্দ শিবরত্ন এই কবিতা ললিতের হাতের লেখা বলে শনাক্ত করেছিলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

জীবনকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি থেকে ললিতের লেখা তিনখানি চিঠি পুলিশ উদ্ধার করেছিল। এই চিঠিগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল মুন্সিগঞ্জে ললিতের বাড়িটি বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত আখড়া হিসেবে ব্যবহার করা হত।

ললিতের বিভিন্ন জায়গায় লেখা চিঠিগুলির তলায় প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা থাকত "চৌধুরী"। ললিতের লেখা ৫/৬ খানা চিঠি পাওয়া গিয়েছিল ললিতের ঘরের চৌকির উপর বিছানো মাদুরের তলা থেকে। পোস্ট করার আগেই পুলিশ পেয়ে গিয়েছিল চিঠিগুলি। চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল গোপালকৃষ্ণ বসু, মনসাচরণ বিশ্বাস, রমণীমোহন ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ ভদ্র এবং বিমলাচরণ দেবকে। চিঠিগুলিতে তারিখ লেখা ছিল ৫-৯-১৯১০। সময় বেলা ১২টা। মুন্সিগঞ্জ। চিঠিগুলি থেকে বোঝা গিয়েছিল তল্লাসীর দিন বেলা অনুমান ১২টার সময় মুন্সিগঞ্জের নিজের ঘরে বসে ললিতচন্দ্র চিঠিগুলি লিখেছিলেন। অবশ্য সেই দিনই চিঠিগুলি পোস্ট করা হয়নি।

উদ্ধার করা ৫টি চিঠির বয়ান মোটামুটি একই রকম ছিল। চিঠিগুলির বয়ান ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছিল।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে ইংরেজী অনুবাদ তুলে ধরা হ'ল—

"I have told everything at interview. I have fixed Monday next for our

auspicious work. You will, therefore, oblige me by coming to my place before evening on that day and joining in the auspicious work and giving encouragement. To write to you in detail is but to waste time.

Yours

"Choudhuri"

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্টও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ললিতচন্দ্র জেনেশুনে এবং জ্ঞানতই তাঁর হেফাজাত বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরি উদ্ধার করা বোমাগুলি রেখেছিলেন। তাঁর বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের গুপ্ত সেন্টার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ললিতচন্দ্রের বাড়িটি ছিল মুন্সিগঞ্জ থানার পাশে। তাই সওয়াল করা হয়েছিল থানার পাশে একটি বাড়িতে এই ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরি বোমা রাখা বা ডাকাতি করার প্রস্তুতি নেওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কলকাতা হাইকোর্ট এই সওয়ালের পর একটি বিশেষ মন্তব্য করে বলেছিলেন, "প্রদীপের তলায় থাকে অন্ধকার।" "It is always darkest under the lamp." সুতরাং জনবহুল স্থলে কোন অপরাধের প্রস্তুতি নেওয়া যাবে না, এই ধরনের যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না বলে হাইকোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

একাধিক মামলা থেকে দেখা গিয়েছে বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিগুলি ছিল কলকাতার জনবহুল অঞ্চলে। কোন কোন কেন্দ্র ছিল কলকাতারই আশেপাশে। সুতরাং মুন্সিগঞ্জ থানার পাশে অবস্থিত কোন বাড়িতে বসে ডাকাতির প্রস্তুতি বা বোমা বানানো কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বরং থানার পাশে কোন বাড়িতে এই ধরনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশের সন্দেহের অবকাশ কম থাকে।

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামী ললিতচন্দ্র চন্দ্রচৌধুরীর আপিল খারিজ করে দিয়ে ঢাকা দায়রা আদালতের দণ্ডাদেশই বহাল রেখেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের রায় হয়েছিল ১৯১১ সালের ৮ই আগস্ট।

বিংশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশী ডাকাতি

হাওড়া গ্যাং কেস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছিল হাওড়া গ্যাং কেসের অভিযুক্ত আসামীদের বিচার হয়েছিল ১৯১০-১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। ১৯১০ সালের ২০শে জুলাই ৪৬ জন অভিযুক্ত আসামীকে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে সোপর্দ করেছিলেন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ), ১২২ এবং ১২৩ ধারায়। পরে অবশ্য স্পেশাল ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ আইনগত কারণে ১২৩ ধারাটি মামলা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্ত আসামীরা প্রায় সবাই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী দলের সদস্য। বিপ্লবী দলের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন অভিযুক্ত আসামীরা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দলের কাজকর্ম চালাবার জন্য আর্থিক প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপ্লবীরা একাধিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় বিপ্লবীদের দ্বারা ডাকাতিগুলেকে বলা হ'ত স্বদেশী ডাকাতি। স্বদেশী ডাকাতদের বলা হ'ত ভদ্রলোক ডাকাত। হাওড়া গ্যাং কেসের অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে অনেককেই ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বিভিন্ন মামলায়। কয়েকজনকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ রাখার অভিযোগে। অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডিত হয়েছিলেন বিভিন্ন ডাকাতি মামলায়।

হাওড়া গ্যাং কেসে কলকাতা হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইবুনাল রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র মামলার রায় দান করেছিলেন ১৯শে এপ্রিল, ১৯১১। তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনাল। বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন স্যার লরেন্স জেনকিনস্ (তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি ব্রেট এবং বিচারপতি ডি. চ্যাটার্জী।

হাওড়া গ্যাং কেসের ঐতিহাসিক রায়টি থেকে জানা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকের কথা। জানা যায় বিভিন্ন স্বদেশী ডাকাতির কথা। অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে কে কোন্ গ্রুপে ছিলেন তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় হাওড়া গ্যাং কেসের রায়টিতে।

হাওড়া গ্যাং কেসে ৪৬ জন অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ছিলেন—(১) ননীগোপাল সেনগুপ্ত (২) বিষ্টুপদ চ্যাটার্জী (৩) নরেন্দ্রনাথ বোস (৪) নিবারণচন্দ্র মজুমদার (৫) সুরেশচন্দ্র মজুমদার (৬) জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখার্জী (৭) পবিত্রকুমার দত্ত (৮) শরৎচন্দ্র মিত্র (৯) শিবু হাজরা (১০) সুরেশচন্দ্র মিত্র (১১) সতীশচন্দ্র মিত্র (১২) হরিপদ অধিকারী (১৩) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪) অন্নদাপ্রসন্ন রায় (১৫) বিমলাচরণ দেব (১৬) কালীপদ চক্রবর্তী (১৭) পুলিনবিহারী সরকার (১৮) হরেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী (১৯) ভূটান মুখার্জী (২০) চারুচন্দ্র ঘোষ (২১) চুনালাল

নন্দী (২২) ভূষণচন্দ্র মিত্র (২৩) রামপদ মুখার্জী (২৪) অতুল পাল (২৫) যোগেশ মিত্র (২৬) গণেশ দাস (২৭) মন্মথ বিশ্বাস (২৮) শ্রীশচন্দ্র সরকার (২৯) শৈলেন দাস (৩০) রজনী ভট্টচার্য (৩১) নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (৩২) বিধুভূষণ বিশ্বাস (৩৩) বিজয় চক্রবর্তী (৩৪) দাশরথি চ্যাটার্জী (৩৫) শৈলেন চ্যাটার্জী (৩৬) ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী (৩৭) কার্তিক দত্ত (৩৮) তারানাথ রায়চৌধুরী (৩৯) মন্মথ চৌধুরী (৪০) সুশীলকুমার বিশ্বাস (৪১) অতুল মুখার্জী (৪২) উপেন্দ্রনাথ দে (৪৩) ভুবন মুখার্জী (৪৪) কিরণ রায় প্রভৃতি।

স্বদেশী ডাকাতিগুলির মধ্যে ছিল চাংড়িপোতা রেলওয়ে স্টেশনে ডাকাতি। চাংড়িপোতায় ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর। যতদূর জানা যায় স্বদেশী ডাকাতিগুলির মধ্যে চাংড়িপোতার ডাকাতিটি বোধহয় ছিল সর্বপ্রথম বিপ্লবীদের দ্বারা ডাকাতি। এরপর ১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল শিবপুরের ডাকাতিটি হয়েছিল। বরা ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২রা জুন। বিঘাটি ডাকাতির দিন ছিল ১৯০৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। প্রতাপচকে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১৪ই অক্টোবর। রতিয়াতে ডাকাতি হয়েছিল ২৯শে নভেম্বর, ১৯০৮। মরিহালের ডাকাতির তারিখ ছিল ২রা ডিসেম্বর, ১৯০৮। ১৯০৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডাকাতি করা হয়েছিল মুসাপুরে। নেত্রায় ডাকাতির দিন ছিল ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৯। মহারাজপুরে ডাকাতি হয়েছিল ২৭শে জুলাই, ১৯০৯। হলুদবাড়ীর ডাকাতিটির তারিখ ছিল ২৮শে অক্টোবর, ১৯০৯।

চাংড়িপোতার ডাকাতিব অভিযুক্ত আসামী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ভূষণচন্দ্র মিত্র। এই ডাকাতিটিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ এবং ভূষণচন্দ্রকে। গ্রেপ্তারের দায়রা আদালতে সোপর্দ করার আগে আইন মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তদন্ত (কমিটাল প্রোসিডিং) হয়েছিল। এই দুজন অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকেই নরেন্দ্রনাথ এবং ভূষণচন্দ্র দুজনই চাংড়িপোতা ডাকাতি মামলা থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। চাংড়িপোতা ডাকাতি মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার বছর তিনেক পর এই দুজনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র মামলায় (হাওড়া গ্যাং কেসে) আবার একই অভিযোগ আনা হয়েছিল। অবশ্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল চাংড়িপোতা ডাকাতির ফলাফল এবং এই দুজনের বিরুদ্ধে অন্যান্য সাক্ষ্য সাবুদ বিচার-বিবেচনা করে চাংড়িপোতা ডাকাতিতে নরেন্দ্রনাথ এবং ভূষণচন্দ্রের যুক্ত থাকার অভিযোগ বিশ্বাস করেননি।

শিবপুর ডাকাতিতে জড়ানো হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে। শিবপুর ডাকাতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ৪ঠা কিংবা ৫ই এপ্রিল। পুলিশি তদন্তে নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না আসায় পুলিশ তার বিরুদ্ধে শিবপুর ডাকাতি মামলায় চার্জশীট দাখিল করতে পারেনি। স্বভাবতই নবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে শিবপুর ডাকাতি মামলা থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাওড়া গ্যাং কেসে নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে শিবপুর ডাকাতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগটি পুনর্বার আনা হয়েছিল প্রথম বার ডাকাতিটির অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু প্রমাণযোগ্য সাক্ষ্য না আসায় নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে শিবপুর ডাকাতির অভিযোগ স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

বরা ডাকাতিতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল কার্তিক দত্ত, পবিত্রচরণ দত্ত এবং বিমলা চরণ দেবকে। বরা ডাকাতি মামলায় আদালতের বিচারে কার্তিক দত্ত খালাস পেয়েছিলেন। ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে পবিত্র দত্ত এবং বিমলা চরণ দেবকে জড়ানো

হয়েছিল বরা ডাকাতিতে। সরকার পক্ষের আইনজীবী নিজেই স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে বলেছিলেন, সরকারপক্ষ ললিতের স্বীকারোক্তি পবিত্র ও বিমলার ক্ষেত্রে নির্ভর করছেন না। সরকার পক্ষের এই বক্তব্যের পর পবিত্র ও বিমলা স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে বরা ডাকাতির ব্যাপারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।

বিঘাটি ডাকাতি মামলায় কার্তিক দত্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দণ্ডিত হয়েছিলেন আদালতের বিচারে।

প্রতাপচকের ডাকাতির চেষ্টায় হাওড়া গ্যাং কেসের অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে কারোকে জড়ানো যায়নি। এমনকি প্রতাপচকে ডাকাতির চেষ্টা স্বদেশীদের দ্বারা হয়েছিল তাও সঠিকভাবে প্রমাণ করা যায়নি।

রায়তা ডাকাতিটিতে ষড়যন্ত্র মামলার কোন অভিযুক্ত আসামীকেই নির্দিষ্টভাবে ডাকাতিটির সাথে যুক্ত করা যায়নি। রায়তা ডাকাতিতে মন্মথ, বামাপদ এবং ভূপেনের যুক্ত থাকার উল্লেখ ছিল সুশীল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিতে। এই স্বীকারোক্তি সুশীল বিশ্বাস নিজেই পরবর্তীকালে অস্বীকার করেছিলেন। সুতরাং সুশীল বিশ্বাসের এই ধরনের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে মন্মথ, বামাপদ এবং ভূপেনের বিরুদ্ধে রায়তা ডাকাতির অভিযোগ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি স্পেশাল ট্রাইবুনালের।

মরিহাল ডাকাতি মামলায় মন্মথনাথ রায়চৌধুরী দণ্ডিত হয়েছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবুনালে কিন্তু মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর সাথে মরিহাল ডাকাতিতে দাশরথি চ্যাটার্জী এবং শিবু হাজরাকেও জড়ানো হয়েছিল। রাজসাক্ষী যতীন দাশরথি এবং শিবুকে মরিহাল ডাকাতিতে জড়িয়েছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবুনাল রাজসাক্ষী যতীনের সাক্ষ্য বিশ্বাস করতে পারেননি। নথি থেকে দেখা যায় মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মরিহাল ডাকাতি মামলায় নিজেই নিজেকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তিতে কিন্তু দাশরথি চ্যাটার্জী বা শিবু হাজরার নাম ছিল না। এসব দিক বিচার-বিবেচনা করে স্পেশাল ট্রাইবুনাল মরিহাল ডাকাতির ব্যাপারে দাশরথি চ্যাটার্জী এবং শিবু হাজরাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন।

ষড়যন্ত্র মামলার (হাওড়া গ্যাং কেস) অভিযুক্তদের মধ্য থেকে কারোকেই জড়ানো যায়নি মুসাপুর ডাকাতিতে। ললিতের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মুসাপুরে ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে। মুসাপুর ডাকাতি মামলার নথিপত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছিল মুসাপুরে ডাকাতি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ললিতের স্বীকারোক্তিতে নির্ভর করে ষড়যন্ত্র মামলার কোন অভিযুক্তকেই যুক্ত করা সম্ভব হয়নি মুসাপুর ডাকাতির সঙ্গে।

নেত্রা ডাকাতিতে ললিত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই ললিত চক্রবর্তী একাধিকবার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

নেত্রা ডাকাতি মামলার নথি থেকে জানা গিয়েছিল রামতাড়ন মিত্র ডাকাতির অভিযোগ করে থানায় প্রথম এত্তেলা দিয়েছিলেন। নেত্রায় ডাকাতিটি হয়েছিল রামতাড়ন মিত্রর বাড়ীতে ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৮। প্রথম এত্তোলাটিতে বলা হয়েছিল, ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন সব ভদ্রলোক। ডাকাতি করে যাওয়ার সময় ডাকাতরা বলেছিলেন, দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে তাঁদের অর্থের প্রয়োজন। দেশের স্বাধীনতার পর ডাকাতি করা গয়নাগাঁটি, টাকাপয়সা তাঁরা সব ফেরৎ দিয়ে যাবেন। এই সব কথাবার্তা এবং ডাকাতদের চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখে রামতাড়নের মনে হয়েছিল ডাকাতরা ছিলেন সব হিন্দু এবং ভদ্রলোকের সন্তান।

ললিতের স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছিল, নেত্রা ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ২১ জন

দলের সদস্য। কিন্তু রামতাড়নের দেওয়া প্রথম এত্তেলায় প্রকাশ ডাকাতরা ছিল ৭/৮ জন। সবাই ছিলেন যুবক। ললিতের স্বীকারোক্তি থেকে প্রকাশ ননীগোপাল সেনগুপ্তের নির্দেশ মত ললিত অন্যান্য কয়েকজন দলের সদস্যর সাথে ডাকাতির দিন ট্রেনে করে দেওলায় পৌছেছিলেন। তখন সময় অনুমান ৫-৪০ মিঃ কিংবা ৬-৪০ মিঃ। একটি মাঠের মধ্যে এসে সবাই জমায়েত হয়েছিলেন। সেই মাঠেই জয়নগর এবং মজিলপুর গ্রুপের ৫ জন এসে তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ডায়মন্ডহারবার থেকে রাতের শেষ ট্রেনটি চলে যাওয়ার পর মধ্যরাতে তাঁরা রামতাড়নের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। ললিত নিজে ডাকাতিটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রামতাড়ন মিত্রের বাড়ির সামনে পৌছলে কালী চক্রবর্তী এবং মাধারু বাড়ির দেওয়াল বেয়ে দেওয়ালের উপর উঠেছিলেন। এই সময় ললিত নিজে রামতাড়নের বাড়ি সংলগ্ন একটি ড্রেনের ভিতর গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। দলের দুজন সদস্য বাইরে থেকে বাড়ীটির প্রতি নজর রাখছিলেন। অন্যান্যরা রামতাড়নের বাড়ীতে ঢুকে ডাকাতি করছিলেন। ডাকাতি করে ফিরে আসার সময় সবাই আবার পূর্বের সেই মাঠটিতে এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। ২/৩ মাইল হাঁটার পর সবাই একটি গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। গাছের তলায় বসে ডাকাতি করা টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটির একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। ডাকাতির টাকাকড়ি এবং গয়নাগাঁটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল জয়নগর এবং মজিলপুর গ্রুপের হাতে। এর পর দলের সদস্যরা কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপে নিজেদের ভাগ করে নিলেন। দলের ছোট ছোট ৩টি গ্রুপ সংগ্রামপুরের মাঠে এসে উপস্থিত হ'ল। ললিতের গ্রুপে ছিলেন শৈলেন দাস, বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জী, অতুল মুখার্জী এবং সম্ভবত উপেন দে। এই গ্রুপটি এরপর এসে পৌছলেন মগড়াহাট স্টেশনে। তখন ভোরের আলো দেখা যাচ্ছিল। এরপর তাঁরা ডায়মন্ডহারবার থেকে ছাড়া দিনের তৃতীয় ট্রেনটিতে উঠে কলকাতায় পৌছেছিলেন। নেত্রা ডাকাতির এই কাহিনী পাওয়া গিয়েছিল ললিত চক্রবর্তীর দেওয়া স্বীকারোক্তি থেকে। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে আরো জানা যায়, ললিত কলকাতায় এসে দেখা করেছিলেন দলের নেতা ননীগোপাল চক্রবর্তী এবং শরৎ মিত্রের সাথে। এরপর ননীগোপালের নির্দেশে তাঁকে যেতে হয়েছিল মজিলপুরে। তিনি কলকাতায় পরের দিন আবার ফিরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন চুনীলাল নন্দী এবং রজনী ভট্টাচার্য।

মহারাজপুরে ডাকাতি হয়েছিল ২৭শে জুলাই, ১৯০৯। রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র মামলার (হাওড়া গ্যাং কেসের) কোন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মহারাজপুর ডাকাতিতে যুক্ত থাকার কোন সাক্ষ্য না আসায় কারোকেই এই ডাকাতির ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি।

হলুদবাড়ি ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৮শে অক্টোবর। হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলায় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন শৈলেন দাস, সুশীল বিশ্বাস, অতুল মুখার্জী, কিরণ রায়, গণেশ দাস, শৈলেন্দ্র চ্যাটার্জী এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে বিধুভূষণ বিশ্বাস এবং মন্মথনাথ বিশ্বাসও ছিলেন। কিন্তু এই দুজনের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই দুজনকেই খালাস দেওয়া হয়েছিল হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলা থেকে।

১০নং জাঠ রেজিমেন্টের কয়েকজন সিপাহীদের সাথে স্বদেশীদের যোগাযোগ হয়েছিল। এইসব সিপাহীদের সাথে গুপ্তভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন নরেন চ্যাটার্জী, শরৎ মিত্র (ডাঃ শরৎ), ভূটান মুখার্জী এবং ননীগোপাল সেনগুপ্ত। ১০নং জাঠ রেজিমেন্টের সিপাহীদের মধ্যে

যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরজান সিং, চুনী হাবিলদার এবং তৃতীয় জন সম্ভবত রামগোপাল। সুরজান সিং গুপ্তসভায় শিবপুরে ভূটানের বাড়িতে যোগ দিয়েছিলেন। রামগোপালকে ভূটানের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন নরেন চ্যাটার্জী। ১০নং জাঠ রেজিমেন্টের এই তিন সিপাহী শরতের বাড়িতেও গিয়েছিলেন এবং নরেন চ্যাটার্জীর সাথে তাঁরা সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ১০নং জাঠ রেজিমেন্টের সিপাহীদের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই যোগাযোগের পিছনে নিশ্চয়ই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্রে এই তিন সিপাহী যুক্ত ছিলেন কিনা সেই ব্যাপারে স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে কোন সাক্ষ্য আসেনি।

আগেই বলা হয়েছে ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা বিভিন্ন গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই গ্রুপগুলির মধ্যে ছিল শিবপুর গ্রুপ, কুরচি গ্রুপ, খিদিরপুর গ্রুপ, চাংড়িপোতা গ্রুপ, মজিলপুর গ্রুপ, হলুদবাড়ী গ্রুপ, নাটোর গ্রুপ, ঝাউগাছা গ্রুপ, রাজসাহী গ্রুপ প্রভৃতি। হাওড়া গ্যাং কেসের নথিপত্র থেকে দেখা যায়।

সরকারী পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল শিবপুর গ্রুপে ছিলেন নরেন চ্যাটার্জী, ডাঃ শরৎ, ভূটান মুখার্জী, ভুবন মুখার্জী-সহ আরো কয়েকজন।

কুরচি গ্রুপে ছিলেন শিবু হাজরা, অতুল পাল, দাশরথি চ্যাটার্জী এবং মন্মথ রায়চৌধুরী। এঁদের সবাইকে জড়ানো হয়েছিল মোরহাল ডাকাতির সাথে। এঁদের বিরুদ্ধে অবশ্য আরো অভিযোগ ছিল যে, এঁরা সব প্রতাপচককেও ডাকাতির চেষ্টা করেছিলেন। মোরহাল ডাকাতিতে অতুল পালের নাম এসেছিল যতীন হাজরার স্বীকারোক্তি থেকে। মোরহাল ডাকাতিতে মন্মথ রায়চৌধুরী ধরা পড়েছিলেন হাতেনাতে। তিনি পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। সেই জবানবন্দিতে ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে অতুল পালের নাম ছিল না। মন্মথ রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মোরহাল ডাকাতিতে তাঁর ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। স্পেশাল ট্রাইবুনাল মোরহাল ডাকাতিতে অতুল পালের অংশগ্রহণ করার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি।

শিবু হাজরা ছিলেন কুরচি গ্রুপের নেতা। যতীনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল একাধিকবার শিবু হাজরাকে ননীগোপালের বাড়ীতে দেখেছিলেন। কিন্তু মোরহাল ডাকাতিতে শিবুর অংশগ্রহণ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ আসেনি। মোরহাল ডাকাতিতে শিবু হাজরাকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ না পাওয়ায় তাঁকে মোরহাল ডাকাতি মামলা থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

খিদিরপুর গ্রুপে ছিলেন শরৎ মিত্র, সুরেশ মিত্র, চারুচরণ ঘোষ। শরত মিত্রকে বলা হ'ত ডাঃ শরৎ। শরৎ মিত্রের ছিল একটি ডাক্তারখানা এবং একটি মুদির দোকান। এই শরৎ মিত্র সম্বন্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল—তিনি নাকি ১০নং জাঠ রেজিমেন্টের সিপাহীদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কানি দিতেন। স্পেশাল ট্রাইবুনাল সরকার পক্ষের এই অভিযোগ বিশ্বাস করেননি।

ললিত একসময় শরতের কাছে কাজ করতেন। সম্ভবত শরতের কাছে তাঁর কার্যকাল ছিল ১৯০৯ সালের শুরু থেকে ১৯০৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। শরতের বাড়ীতে পুলিশি তল্লাসী হয়েছিল। তল্লাসীতে পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কিছু পায়নি। ললিত তাঁর স্বীকারোক্তির এক জায়গায় বলেছিলেন, ডাঃ শরৎ মিত্র স্বদেশী ডাকাতদের বিষযুক্ত পিল সরবরাহ করতেন। বিষযুক্ত পিল সরবরাহ করার গল্পটিও স্পেশাল ট্রাইবুনাল অবিশ্বাস করেছিলেন।

চাংড়িপোতা গ্রুপে ছিলেন ভূষণ মিত্র ওরফে গুলে এবং নরেন ভট্টাচার্য। ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী চাংড়িপোতা এবং নেত্রা দুটি ডাকাতিতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন ভূষণ মিত্র। নরেন ভট্টাচার্য ছিলেন চাংড়িপোতা ডাকাতিটিতে। প্রমাণযোগ্য সাক্ষ্য না আসায় নরেন ভট্টাচার্যকে চাংড়িপোতা ডাকাতি মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। ষড়যন্ত্র মামলায়ও এই দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। অবশ্য নরেনের বাড়ি তল্লাসীকালে পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকে পেয়েছিলেন দুখানি সন্দেহজনক পুস্তিকা। এই পুস্তিকা দুটি ছিল—"বর্তমান রণনীতি" এবং "মায়ের ডাক"। "মায়ের ডাক" ছিল হাতে লেখা একটি পুস্তিকা। "মায়ের ডাক" নরেনের নিজের হাতে লেখা কিনা সরকার পক্ষ তার কোন প্রমাণ দিতে পারেননি। হারানচন্দ্র ঢাল নামে একজন সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, তিনি ভূষণ মিত্র এবং নরেন ভট্টাচার্যকে দোকানে বসে বিলাতি কাপড়ের উপর স্ট্যাম্প মারতে দেখেছিলেন।

মজিলপুর গ্রুপে ছিলেন রজনী ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দাস এবং চুনীলাল নন্দী। ইন্দুকিরণ ছিলেন মজিলপুর ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। স্পেশাল ট্রাইবুনাল ইন্দুকিরণকে জড়িয়ে ললিতের স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনকড়ি দাসকে ললিত নেত্রা ডাকাতির সাথে জড়িয়েছিলেন। অথচ সাক্ষী কুমুদকুমার রায় নেত্রা ডাকাতির পরের দিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল সকালে শরতের বাড়ীতে বেদম জ্বরে শয্যাশায়ী দেখেছিলেন। চুনীলাল বা রজনীর বিরুদ্ধে নেত্রা ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। যতীন এবং হেমচন্দ্র মণ্ডলের দেওয়া স্বীকারোক্তির গল্পের সাথে ললিতের দেওয়া স্বীকারোক্তির কোন মিল ছিল না।

আলিপুর বোমা মামলায় নরেন গোঁসাই তাঁর স্বীকারোক্তিতে পবিত্র দত্তকে জড়িয়েছিলেন। অনুমান করা হয়েছিল, আলিপুর বোমা মামলায় জড়ানোর খবর পেয়ে পবিত্র এবং চুনীলাল গা ঢাকা দিতে বেনারস চলে গিয়েছিলেন। এই সময় মজিলপুরে চুনীর বাড়ি তল্লাসী করে কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র এবং দুখানি বই পাওয়া গিয়েছিল। বই দুটি ছিল। "দেশের কথা" এবং "শিবাজী"। বই দুখানির লেখক ছিলেন এস. জি. দেওসকর। কিন্তু এসব কাগজপত্র বই থেকে নেত্রা ডাকাতিতে চুনীর যুক্ত থাকার কথা প্রমাণিত হয়নি।

হলুদবাড়ি গ্রুপে ছিলেন বিধুভূষণ বিশ্বাস, মন্মথ বিশ্বাস, শৈলেন দাস, সুশীল বিশ্বাস, অতুল মুখার্জী, কিরণ রায়, গণেশ দাস, শৈলেন্দ্র চ্যাটার্জী এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। বিধু এবং মন্মথ বাদে বাকিদের হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। হলুদবাড়ি ডাকাতি মামলায় শৈলেন দাস এবং সুশীল বিশ্বাসের হয়েছিল ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতুল মুখার্জী, কিরণ রায়, গণেশ দাস, শৈলেন চ্যাটার্জী এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হয়েছিল ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

কৃষ্ণনগর গ্রুপে ছিলেন সুরেশ মজুমদার ওরফে পরাণ। সুরেশ মজুমদার আর্য ক্যামিকেল ওয়ার্কসের সাথে যুক্ত ছিলেন। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তল্লাসী হয়েছিল সুরেশের বাড়ী এবং আর্য ক্যামিকেল ওয়ার্কসের অফিস। কোন জায়গা থেকেই সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। সুরেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগও প্রমাণিত হয়নি।

নাটোর গ্রুপে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র সরকার এবং বিজয় চক্রবর্তী। শ্রীশ ছিলেন নাটোরের ডাঃ গিরীশ সরকারের ছেলে। ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি-বলে শ্রীশকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল একটি স্বর্ণালঙ্কার চুরির দায়ে। ললিত বলেছিলেন, তিনি এবং শ্রীশ দুজন মিলে

ভুবনেশ্বরে গিয়ে সাময়িকভাবে ভুবনেশ্বর সিং নামে এক ব্যক্তির কাছে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ৩১শে মে, ১৯০৯। ললিত ১০ই জুলাই ভুবনেশ্বর সিংয়ের কাছ থেকে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ললিত তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন, তাঁর ভুবনেশ্বরের কাজ ছেড়ে দেওয়ার কদিন বাদে শ্রীশ পাটনায় চলে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর ভুবনেশ্বরে ফিরে এসে শ্রীশ একটি আধা গলা স্বর্ণালঙ্কার (সোনার তাল) এনে ললিতকে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, পাটনার উকীল কেদারনাথ ব্যানার্জীর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে এনেছিলেন শ্রীশ—ললিতের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেই সরকার পক্ষ শ্রীশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন। অথচ ললিতের স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছিল ললিত ভুবনেশ্বরে এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন জুন মাসে। তারপরে শ্রীশ পাটনায় গিয়েছিলেন। পাটনায় হেমাঙ্গিনী দেবীর স্বর্ণালঙ্কার চুরি গিয়েছিল ১৮ই মে-র আগে। এই ব্যাপারে ললিতের স্বীকারোক্তিতে যে সত্য প্রকাশ পায়নি স্পেশাল ট্রাইবুনাল তা বুঝতে পেরেছিলেন।

ঝাউগাছা গ্রুপে ছিলেন কালীপদ চক্রবর্তী এবং পুলিন সরকার। এঁদের বিরুদ্ধে কোন ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

বিঘাটি গ্রুপের কার্তিক দত্তের শাস্তি হয়েছিল বিঘাটি ডাকাতি মামলায়। কিন্তু রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি।

ছাত্রভাণ্ডার গ্রুপে ছিলেন পবিত্র দত্ত, অন্নদা রায়, হরেন্দ্র ব্যানার্জী এবং নরেন্দ্রনাথ বোস।

রাজসাহী গ্রুপে ছিলেন মন্মথনাথ বিশ্বাস, বিধুভূষণ বিশ্বাস, রামপদ মুখার্জী এবং ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। মন্মথনাথ বিশ্বাস এবং বিধুভূষণ বিশ্বাসকে হলুদবাড়ি গ্রুপেও রাখা হয়েছিল ষড়যন্ত্র মামলায়।

এ ছাড়াও বর্তমান শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী ডাকাতি হয়েছিল সতীপাড়ায়, রাজেন্দ্রপুরে এবং আরো অন্যান্য জায়গায়। মুন্সিগঞ্জে ডাকাতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ললিতচন্দ্র চন্দচৌধুরী এবং তাঁর গ্রুপের অন্যান্য ছেলেরা। সরকারের পক্ষের অভিযোগ ছিল, ললিতচন্দ্র চন্দচৌধুরী ডাকাতির উদ্দেশ্যে বোমা বানিয়েছিলেন। পরে ঢাকার দায়রা আদালতে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে বোমা রাখার অভিযোগে ললিতচন্দ্রর শাস্তি হয়েছিল। এ ছাড়াও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যরা বেশ কয়েকটি ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে মামলার নথিপত্র থেকে খোঁজ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন মামলার নথিপত্র থেকে জানা যায়, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একাধিক ডাকাতিতে শামিল হওয়ায় ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় কেউ কেউ বা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, আবার প্রমাণাভাবে কেউ কেউ বা ছাড়া পেয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট ডাকাতি মামলায়।

প্রথম দশকের অনেকগুলি ডাকাতি মামলার ঘটনা হাওড়া গ্যাং কেসে যুক্ত করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজদ্রোহিতার অভিযোগে দোষী প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে। ইতিপূর্বে হাওড়া গ্যাং কেস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী ডাকাতিগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়নি।

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে দেখলে নিশ্চয়ই বলা যাবে, হাওড়া গ্যাং কেসে স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়টি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক দলিল।

রাজাবাজার বোমা মামলা

রাজাবাজার বোমা মামলার অভিযুক্ত আসামীদের দায়রা আদালতে বিচার হয়েছিল ১৯১৪ সালে। বিচার হয়েছিল ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে। রাজাবাজার বোমা মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে ছিলেন শশাঙ্কশেখর হাজরা ও অমৃতলাল হাজরা, দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে, সারদাচরণ গুহ, কালীপদ ঘোষ, উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী এবং হিরণ্ময় ব্যানার্জী।

২১শে নভেম্বর, ১৯১৩ সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের জারি করা তল্লাসী পরোয়ানা-বলে খুব ভোরের দিকে পুলিশ তল্লাসী অভিযান চালালো কলকাতার পূর্বপ্রান্তে ২৯৬/১, আপার সার্কুলার রোডে। এই সময় শশাঙ্কশেখর হাজরা ২৯৬/১, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ির একটি ঘরে ভাড়া থাকতেন। শশাঙ্কশেখরের ঘর তল্লাসী করার পরোয়ানাটি এসেছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে। সরকারী প্রশাসনের কাছে গুপ্ত খবর ছিল শশাঙ্কশেখরের আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে বে-আইনি বিস্ফোরক পদার্থ এবং সন্দেহজনক জিনিসপত্র আছে। তল্লাসী পরোয়ানাটি জারি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল ১৯১৩ সালের ২৭শে মার্চ সিলেটের মৌলভী বাজারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার পুলিশ অফিসার জে. এন. ঘোষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তল্লাসী অভিযানটি পরিচালনা করার। পুলিশ ২৯৬/১, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি তল্লাসী করার সময় গ্রেপ্তার করল শশাঙ্কশেখর হাজরাকে তাঁর ভাড়া করা ঘরটি থেকে ২১শে নভেম্বরের ভোর রাতে। সেই সময় শশাঙ্কশেখরের ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে এবং সারদাচরণ গুহ। তাঁদের ৩ জনকেও ঘুম থেকে তুলে গ্রেপ্তার করা হ'ল। পুলিশি তল্লাসীতে শশাঙ্কশেখরের ঘর থেকে পাওয়া গেল না সন্দেহজনক জিনিস ও কাগজপত্র। জিনিসপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল কয়েকটি তামাকের টিনের কৌটা, সিগারেটের টিনের কৌটা, ৪টি লোহার ক্লাম্পর্স, ১টি টিন, কতকগুলি লোহার ডিস্ক প্রভৃতি। ১টি তামাকের টিনের কৌটার সাথে ৩টি লোহার ডিস্ক লাগানো ছিল। ২টি ডিস্ক ছিল কৌটাটির ভিতরের দিকে, ১টি ছিল বাইরের দিকে। খালি টিনটির সাথে ৪টি ক্লাম্পর্স লাগানোর ব্যবস্থা রাখা ছিল। পুলিশের বক্তব্য ছিল ডিস্ক ও ক্লাম্পস লাগানো কৌটাগুলিকে বিশেষ ধরনের বোমা তৈরির খোল হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত।

শশাঙ্ক, দীনেশ, চন্দ্রশেখর এবং সারদাকে গ্রেপ্তার করার পরের পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বর ১৯১৩ তল্লাসী অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার জে. এন. ঘোষের দেওয়া প্রথম এত্তেলা-বলে রাজাবাজার বোমা মামলাটি রুজু করা হয়েছিল বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ ও ৫ ধারায়। ২৬শে নভেম্বর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বোমা মামলাটির নথি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ভিচের আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৬ই ডিসেম্বর মামলাটির ঘটনার সাথে যুক্ত

থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হ'ল কলেজ স্ট্রীট থেকে কালীপদ ঘোষ ও উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীকে। গ্রেপ্তারের সময় কালীপদ ঘোষের জামার পকেট থেকে পাওয়া গেল ১০ কপি লিবার্টি লিফলেটস্ (ইস্তাহার)। ১০ কপি লিফলেটস্য়ের মধ্যে ২ কপি ছিল পিংক রঙের। বাকী ৮ কপি ছিল সাদা রঙের। ১৯১৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী বরানগর থেকে গ্রেপ্তার করা হ'ল খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে। এর পর তল্লাসী পরোয়ানা-বলে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী অভিযান হয়েছিল পুলিশের। এ ছাড়া গ্রেপ্তারিত অভিযুক্তদের পূর্ব গতিবিধি সম্বন্ধেও নানা খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্ত শেষে মাননীয় পাবলিক প্রোসিকিউটর আইনগত কিছু অসুবিধা থাকায় ২৩শে নভেম্বরে রুজু করা রাজাবাজার বোমা মামলাটি তুলে নেওয়ার প্রার্থনা করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সরকার পক্ষের প্রার্থনা মঞ্জুর করায় মামলাটি তুলে নেওয়া হয়েছিল ১৯শে জানুয়ারী, ১৯১৪। একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন অভিযোগপত্র দায়ের করা হ'ল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪, ৫ এবং ৬ ধারায়। নতুন অভিযোগপত্রটিতে অভিযুক্ত আসামী হিসেবে নাম ছিল শশাঙ্কশেখর হাজরা, দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সারদাচরণ গুহ, চন্দ্রশেখর দে, কালীপদ ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং হিরণ্ময় ব্যানার্জীকে। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় অভিযুক্ত আসামীদের দায়রা আদালতে সোপর্দ করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকেই হিরণ্ময় ব্যানার্জীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বাকি ৬ জন অভিযুক্ত আসামীকে ২৪ পরগনার দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। নতুন দায়ের করা অভিযুক্ত পত্রটির সাথে সরকারী অনুমোদন পত্রটিও আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। ২৪ পরগনার দায়রা জজের আদেশে আসামীদের বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে।

দায়রা আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে দুই কিস্তির চার্জ গঠন করা হয়।

প্রথম অভিযোগটিতে বলা হ'ল শশাঙ্ক, দীনেশ, সারদা এবং চন্দ্রশেখর—এই ৪ জন ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর ২৯৬/১, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থ তাঁদের হেফাজতে রেখেছিলেন বে-আইনীভাবে এবং তাঁরা বিস্ফোরক পদার্থ রেখেছিলেন বোমা তৈরি করে তা দিয়ে জীবনহানি ঘটাবার জন্য। তাঁদের ৪ জনের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জটি গঠন করা হ'ল বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ (বি) ধারায়। অভিযুক্ত আসামীরা ৪ জনই তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে গঠন করা চার্জটি অস্বীকার করে নিজেদের নির্দোষ বললেন।

দ্বিতীয় চার্জটি গঠন করা হ'ল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারায় শশাঙ্কশেখর হাজরা, দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সারদাচরণ গুহ, চন্দ্রশেখর দে, কালীপদ ঘোষ এবং খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় চার্জটিতে বলা হ'ল অভিযুক্ত আসামীরা ৬ জন ১৯১১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বরের মধ্যে বিরজা, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ সেন, প্রফুল্লরঞ্জন গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, নির্মলকান্ত রায় ও অন্যান্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা তৈরি করে তা দিয়ে জীবনহানি ঘটাবার।

৬ জন অভিযুক্ত আসামী প্রত্যেকেই অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং নিজেদের নির্দোষ বলে বিচার চাইলেন।

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ অ্যাসেসরদের নিয়ে রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলাটি শুনেছিলেন।

মামলার সাক্ষ্যসবুদ সওয়াল জবাব শোনার পর অ্যাসেসররা অভিযুক্ত আসামীদের সবাই নির্দোষ বলে তাঁদের অভিমত জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত দায়রা জজ সাহেবকে। খগেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অ্যাসেসরদের সাথে একমত হতে না পারায় দায়রা আদালত দোষী সাব্যস্ত করলেন শশাঙ্ক, সারদা, চন্দ্রশেখর এবং দীনেশকে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ (বি) ধারায়। এ ছাড়াও ভারতীয় ১২০ (বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করলেন শশাঙ্ক, সারদা, চন্দ্রশেখর, দীনেশ ও কালিপদকে। দায়রা আদালতের আদেশে বিস্ফোরক পদার্থ আইনে শশাঙ্কশেখর হাজরাকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল। দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদাচরণ গুহ এবং চন্দ্রশেখর দে-কে দেওয়া হ'ল ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড। এ ছাড়াও ভারতীয় দন্ডবিধির আইনের ১২০ ধারায় কালীপদ ঘোষ সহ ৫ জন অভিযুক্ত আসামীকেই দেওয়া হ'ল ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। অবশ্য দায়রা আদালতের আদেশে বলা হয়েছিল উভয় দণ্ডই একসাথে চলবে। খগেন্দ্রনাথের ব্যাপারে অ্যাসেসরদের সাথে একমত হওয়ায় দায়রা আদালত খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত দায়রা আদালতে রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলার রায় হয়েছিল ১৯১৪ সালের ৪ঠা জুন তারিখে।

মামলাটির রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিত ৫ জন আসামী আলাদা আলাদা ভাবে ৫টি আপিল দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে ১৯১৪ সালে। সরকারপক্ষ থেকেও খগেন্দ্রনাথের মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে ১টি আপিল দায়ের করা হয়েছিল! কলকাতা হাইকোর্ট রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় একটি রুল জারি করে আসামীদের কারণ দর্শাতে বলেছিলেন এই মর্মে কেন দণ্ডিত আসামীদের দণ্ডাদেশের পরিমাণ বাড়ানো হবে না?

হাইকোর্টে ৬টি আপিল এবং রুলের শুনানি চলেছিল একনাগাড়ে ৩২ দিন। শুনানির সময় উভয় পক্ষ থেকে একাধিক আইনগত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল হাইকোর্টে।

আসামীদের পক্ষ থেকে প্রথমেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন সঠিকভাবে হয়নি। ত্রুটিপূর্ণ চার্জটির উপর নির্ভর করে আসামীদের শাস্তি দেওয়া উচিত হয়নি। ত্রুটিপূর্ণ চার্জের উপর নির্ভর করায় দায়রা আদালতের রায় বাতিল করে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত বলে সওয়াল করা হয়েছিল হাইকোর্টের আপীল বেঞ্চের কাছে। হাইকোর্ট আসামীপক্ষের সওয়ালের উত্তরে অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন, আসামীদের বিরুদ্ধে গঠন করা চার্জে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও বিচারের ক্ষেত্রে এই ত্রুটির জন্য দায়রা আদালতের রায়টিকে কোনমতেই বাতিল করা যায় না। এই ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি মামলাটিকে কোনভাবেই কলুষিত করেনি বা আসামীদের তাদের বিরুদ্ধে গঠন করা চার্জ বুঝতে কোন অসুবিধা ঘটায়নি।

দ্বিতীয় চার্জটিতে বলা হয়েছিল আসামীরা সকলে আরো অন্যান্যদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ থেকে ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত। অথচ ভারতীয় দন্ডবিধিতে ১২০ (বি) এবং ১২০ (এ) ধারা দুটি যুক্ত করা হয়েছিল ১৯১১ সালের ২৭শে মার্চ। সুতরাং ১১ই মার্চ, ১৯১১ সালে ১২০ (বি) ধারাটির জন্মই হয়নি। ষড়যন্ত্রের ধারাটিরই যখন জন্ম হয়নি ২৭শে মার্চের আগে, তখন ১১ই মার্চ থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার প্রশ্নই আসতে পারে না। হাইকোর্ট আসামীপক্ষের সওয়াল ও প্রশ্নের উত্তরে বললেন, সরকার পক্ষের অবশ্যই আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দায়রা আদালতে আসামীদের পক্ষে এই ব্যাপারে কখনই কোন প্রশ্ন তোলা

হয়নি। আসামীদের পক্ষে নিম্ন আদালতে এমন কোন বক্তব্যও রাখা হয়নি যে ২৭শে মার্চের পরে তারা চার্জে উল্লেখিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু ২৭শে মার্চের আগে তারা ষড়যন্ত্রটির সাথে যুক্ত ছিলেন না। বরং মামলার নথি থেকে প্রকাশ দায়রা আদালতে আসামীদের বক্তব্য ছিল উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের সাথে তাদের কোনদিন কোনভাবে সম্পর্ক ছিল না। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চার্জ গঠনে কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় অভিযুক্ত আসামীরা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হননি। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে আরো পরিষ্কার করে বললেন, মামলাটির ষড়যন্ত্রের সময় সীমা ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ থেকেই শুরু হোক্ কিংবা ২৭শে মার্চ থেকেই শুরু হোক, ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে তা একই ব্যাপার। আসামীরা ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি স্বীকার করলে হাইকোর্টে সর্বপ্রথম তোলা প্রশ্নটির নিশ্চয়ই কিছু মূল্য ছিল। নিম্ন আদালতে ষড়যন্ত্রের সময়সীমা নিয়ে কোন প্রশ্ন না তোলায় বোঝা যাচ্ছে চার্জে সামান্য ভুলত্রুটির জন্য আসামীরা মামলার দিক থেকে কোনভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হননি।

ষড়যন্ত্রের চার্জটিতে বলা ছিল দণ্ডিত আসামীরা ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ থেকে ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বরের মধ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। দণ্ডিত আসামীরা ছাড়াও ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন বিরজা, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ সেন, প্রফুল্লরঞ্জন গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, নির্মলকান্ত রায় এবং আরো অনেকে। এই ব্যাপারে হাইকোর্টের কাছে আসামী পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হ'ল এইসব ষড়যন্ত্রকারীদের নাম-ঠিকানা জানা সত্ত্বেও তাদের অভিযুক্ত না করার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সরকার পক্ষ দিতে পারেননি। এমনকি এদের সাক্ষী হিসেবেও আনা হয়নি। এই কারণে ষড়যন্ত্রের চার্জটি বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। হাইকোর্ট আসামী পক্ষের এই যুক্তিটিও মানলেন না। এর পর বিশেষ একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল হাইকোর্টের কাছে। প্রশ্নটি ছিল মামলার ঘটনা প্রবাহ দিয়ে সরকার পক্ষ থেকে বোঝাবার প্রচেষ্টা হয়েছে অভিযুক্ত আসামীরা সকলেই রাজদ্রোহিতার অপরাধে যুক্ত ছিলেন। অথচ রাজদ্রোহিতার কোন প্রত্যক্ষ অভিযোগ [ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ (এ) ধারা] আসামীদের বিরুদ্ধে আনা হয়নি। প্রশ্নের উত্তরে হাইকোর্ট মন্তব্য করলেন, রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনতে গেলে নির্দিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। যে কারণেই হোক সেই অনুমোদন না থাকায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ (এ) ধারায় অভিযোগটি আনা যায়নি।

রাজাবাজার বোমা মামলার নথিটি থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ, এগ্‌জিবিটস্, সওয়াল জবাব বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে হাইকোর্ট দেখলেন দণ্ডিত আসামী শশাঙ্কশেখর হাজরার আপার সার্কুলার রোডের ভাড়াবাড়ি থেকে পুলিশি তল্লাসীতে পাওয়া গিয়েছিল নানা ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ এবং বোমা রাখার ডিম্ব লাগানো টিনের কৌটার খোল। সরকার পক্ষে এই প্রসঙ্গে বলে হয়েছিল উদ্ধার করা বিস্ফোরক পদার্থ রাখা হয়েছিল বোমা তৈরি করার উদ্দেশ্যে।

সরকারপক্ষের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আসামী পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল উদ্ধার করা মালামাল রাখা হয়েছিল একসিটিলিন জেনারেটর তৈরি করার জন্য এবং সেই জেনারেটর সহযোগে গ্যাস ল্যাম্প বানিয়ে পরীক্ষা করা। সাধারণ মানুষ কুপির বদলে এই গ্যাস ল্যাম্প ব্যবহার করতে পারলে অনেক সুবিধা হবে। উদ্ধার করা পদার্থ দিয়ে বোমা তৈরি করার কোন অভিসন্ধি ছিল না।

আসামী পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে সরকারপক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন বোমা মামলায় উদ্ধারিত বিস্ফোরিত বোমার বারুদ ও খোল এবং বিস্ফোরিত না করা বোমা নমুনা হিসেবে

রাজাবাজার বোমা মামলায় দায়রা আদালতের কাছে এনে দেখালেন। এইসব বোমার নমুনা নেওয়া হয়েছিল বিশেষ কয়েকটি বোমা মামলায় উদ্ধারিত বিস্ফোরক পদার্থ থেকে। এই মামলাগুলির মধ্যে ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলা, ঘটনার তারিখটি ছিল ২রা মার্চ, ১৯১১। মেদিনীপুর বোমা মামলা, ঘটনার তারিখ ছিল ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২২। দিল্লী বোমা মামলা, দিল্লী বোমা মামলাটি ছিল ভাইসরয়কে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণের কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি ঘটেছিল ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২। মৌলভী বাজার বোমা মামলা, মৌলভী বাজারের ঘটনাটি ছিল ২৭শে মার্চ ১৯১৩। ময়মনসিং বোমা মামলা, তারিখ ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। লাহোর বোমা মামলা, লাহোর বোমা মামলার ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭ই মে, ১৯১৩। ভদ্রেশ্বর বোমা মামলা. ঘটনার তারিখ ছিল ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৩।

উপরোক্ত বোমা মামলায় উদ্ধারপ্রাপ্ত বোমা থেকে কয়েকটি বোমা নমুনা হিসেবে রাজাবাজার বোমা মামলায় দাখিল করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাজাবাজার বোমা মামলায় শশাঙ্কশেখরের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা বোমার চরিত্র নিরূপণ করা। তাছাড়া নমুনা হিসেবে দাখিল করা বোমার সাথে বর্তমান মামলাটিতে উদ্ধার করা বোমা এবং বোমার টিনের কৌটার খোলের সাথে মিল খুঁজে বার করা। বোমা বিশেষজ্ঞরা সব মামলায় উদ্ধার করা বোমা এবং বিস্ফোরক পদার্থ পরীক্ষা করে অভিমত দিয়েছিলেন, বোমাগুলি মারাত্মক ধরনের এবং জীবনহানিকর ছিল। রাজাবাজার মামলায় উদ্ধার করা বোমার চরিত্রও ছিল একই ধরনের। সব মামলার বোমাগুলির তৈরির কায়দা কানুন ছিল একই রকমের। বিভিন্ন মামলায় উদ্ধার করা বোমা বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হলেও বোমা বানানোর পদ্ধতিটি দেওয়া হয়েছিল বিশেষ কোন সেণ্টার থেকে। হয়তো বিশেষ কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকে এই নতুন ধরনের বোমা তৈরি করা পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ কর্নেল মুসপ্রাট এবং মেজর টার্নার দুজনেই তাঁদের সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, এই ধরনের বোমা পরীক্ষা করার জন্য তাঁদের হাতে আগে কখনও পড়েনি। বোমাগুলির আকৃতি প্রকৃতি দেখে তাঁদের মনে হয়েছে বোমাগুলি তৈরি হয়েছিল বিশেষ পারদর্শিতার সাথে অভিজ্ঞ হাতে। হয়ত একাধিক অভিজ্ঞ হাত এই বিশেষ ধরনের বোমাগুলি তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছিলেন, ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলা থেকে ভদ্রেশ্বর বোমা মামলা পর্যন্ত বিভিন্ন মামলায় উদ্ধার করা বোমাগুলি তৈরি করেছে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি গ্রুপ। বোমাগুলির খোল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল সিগারেট, টোবাকো এবং কনডেন্সড মিল্কের কৌটা। সব বোমার কৌটাতেই লাগানো ছিল ডিস্ক এবং আংটা।

আসামী পক্ষের বক্তব্য ছিল কৌটাগুলিতে ডিস্ক, হুক এবং আংটা দেখেই বিশেষ ধরনের বোমা তৈরির প্রচেষ্টা বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। বোমা বিশেষজ্ঞ মুসপ্রাট সাহেব ডিস্কযুক্ত টিনের কৌটাগুলি প্রদর্শন করে আদালতকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। অর্থাৎ আদালত কক্ষে বোমা বিস্ফোরণের ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছিল।

শশাঙ্কর ঘর থেকে পাওয়া টিনের খোলগুলির সাথে অন্যান্য মামলায় উদ্ধার করা বোমার খোলের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল।

দায়রা আদালত সাক্ষ্যসবুদ বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ডিস্ক লাগানো টিনের কৌটাগুলি প্রকৃতপক্ষে বোমার সেল হিসেবে রাখা হয়েছিল। হাইকোর্টও এই ব্যাপারে দায়রা আদালতের সাথে একমত হয়েছিলেন।

হাইকোর্টের কাছে এবার প্রশ্ন দাঁড়াল শশাঙ্কর ঘরে বোমা বানাবার সেলগুলি কি কোন অভিসন্ধি নিয়ে রাখা হয়েছিল? না নির্দোষ মনোভাব নিয়ে রাখা হয়েছিল?

আসামীপক্ষের আদালতের কাছে বক্তব্য ছিল যোগেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় শশাঙ্কশেখর হাজরা একসিটিলিন গ্যাস ল্যাম্প তৈরি করার জন্য টিনের কৌটায় ডিস্ক ও হুক লাগিয়েছিলেন। কারণ এই গ্যাস ল্যাম্প কুপির আলো থেকে বেশি আলো দেবে কম খরচে।

দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়েই আসামীপক্ষের এই গল্প মেনে নিতে পারেননি। গ্যাস ল্যাম্প জেনেরেটর দিয়ে জ্বালাতে গেলে টিউব ছাড়া তা সম্ভব নয়। শশাঙ্কর ঘরে পাওয়া টিনের কৌটার সাথে টিউব সংযোগ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। গ্যাস ল্যাম্পের কৌটাতে রাখতে হবে একাধিক ছিদ্র। কিন্তু টিনের গায়ে কোন ছিদ্র পাওয়া যায়নি। গ্যাস ল্যাম্প তৈরি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার গল্পটি মামলার প্রয়োজনে পরে বানানো হয়েছে বলে আদালতের ধারণা হয়েছিল।

মামলার নথি থেকে দেখা গেল মিঃ লোম্যান শশাঙ্কর আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি তল্লাসীর সময় উপস্থিত ছিলেন। তল্লাসীর পর ডিস্কযুক্ত কৌটা তাঁর হাতে আসায় তিনি শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই ডিস্ক লাগানো কৌটা দিয়ে কি করা হয়। উত্তরে শশাঙ্ক মিঃ লোম্যানকে বলেছিলেন, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ সাহেব, বুঝতে পারবে কি করা হয়। একই প্রশ্ন মিঃ টেগার্ট ও মিঃ ডেনহামও তাঁকে করেছিলেন। কিন্তু তখন শশাঙ্ক তাঁদের প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

দায়রা আদালতে রাজাবাজার বোমা মামলার শুনানী শুরু হয়েছিল ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯১৩। একনাগাড়ে মামলা চলেছিল দীর্ঘদিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ মামলার প্রায় শেষদিকে সর্বপ্রথম গ্যাস ল্যাম্প তৈরি করার গল্পটি বলা হয়েছিল আদালতের কাছে। এর আগে গ্যাস ল্যাম্প সম্বন্ধে কোন সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি আসামীদের তরফে। এই ব্যাপারে ৬ই এপ্রিল, ১৯১৪ কর্নেল মুসপ্রাট উইলিয়ামস্‌কে প্রশ্ন করা হয়েছিল গ্যাস ল্যাম্প তৈরির পদ্ধতি নিয়ে। এর থেকে বোঝা যায় মামলা চলাকালীন অবস্থায় গ্যাস ল্যাম্প নিয়ে নতুন একটি গল্প বানানো হয়েছিল আসামীদের নির্দোষ প্রমাণ করতে। লিন্ড আইস্‌ ফ্যাক্টরীতে মিঃ ক্রেগের কাছে একসময় কাজ করতেন শশাঙ্কশেখর। তিনি কাজ করতেন অক্সি-একীসটিলেন বিভাগে। মিঃ ক্রেগের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৪। তাঁকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল কৌটার মধ্যে ডিস্ক লাগিয়ে জেনারেটর দিয়ে গ্যাস ল্যাম্প তৈরি করা যায় কিনা! উত্তরে মিঃ ক্রেগ বলেছিলেন গ্যাস ল্যাম্প তৈরি করা অবাস্তব কল্পনা।

১৬ই এপ্রিল, ১৯১৪ মামলা চলাকালীন অবস্থায় কামারকে দিয়ে একটি মডেল তৈরি করিয়েছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক তাঁর আইনজীবীকে দিয়ে মডেলটি আদালতের কাছে পেশ করেছিলেন। আদালতের অনুমতি নিয়ে শশাঙ্ক নিজেই মডেলটি প্রদর্শন করে আদালতকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে গ্যাস ল্যাম্প কাজ করে। দায়রা আদালত এই ব্যাপারে ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া সত্ত্বেও গ্যাস ল্যাম্প তৈরি করার গল্প বিশ্বাস করলেন না।

দায়রা আদালত বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন শশাঙ্ক ডিস্ক লাগানো টিনের

কৌটা বোমা তৈরি করার জন্যই রেখেছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। হাইকোর্টও দায়রা আদালতের সাথে এই ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

শশাঙ্কশেখরের ঘরে পাওয়া গিয়েছিল বিপ্লবী কাগজপত্র। হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন, এইসব কাগজপত্র প্রমাণ করে দেশের মুক্তিসংগ্রামে সামিল হয়ে শশাঙ্করা চেয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা। এই মনোভাব নিয়েই তৈরি করা হচ্ছিল বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে জীবনহানিকর বোমা। বিভিন্ন মামলায় একই ধরনের বোমার আকৃতি দেখে বোঝা যায় বিপ্লবীরা বোমা তৈরির একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

এরপর হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার বিবেচনা করলেন।

রাজাবাজার বোমা মামলার প্রধান চরিত্রে ছিলেন শশাঙ্কশেখর হাজরা। আপিল শুনানির পর হাইকোর্ট দায়রা আদালতের সাথে একমত হয়ে শশাঙ্কর বিরুদ্ধে দেওয়া শাস্তির আদেশ বহাল রাখলেন। হাইকোর্টও বললেন, বোমা তৈরি করার জন্য পুলিশের উদ্ধার করা মালামাল রেখেছিলেন তাঁর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। শশাঙ্কর বিরুদ্ধে দুটি চার্জই প্রমাণিত হয়েছে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। চার্জ দুটি ছিল বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ (বি) ধারায় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারায়।

আগেই বলা হয়েছে ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর ২৯৬/১, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ির শশাঙ্কর ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় ভোর রাতে পাওয়া গিয়েছিল চন্দ্রশেখর দে, দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং সারদাচরণ গুহকে।

মামলার নথি থেকে প্রকাশ, চন্দ্রশেখরের সাথে শশাঙ্কর প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল ১৯০৮ সালে ঢাকায়। এরপর থেকে ২১শে নভেম্বরের মধ্যে শশাঙ্কর সাথে চন্দ্রশেখরের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা তার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। চন্দ্রশেখর গ্রেপ্তার হওয়ার আগে কাজ করতেন কোহিনুর প্রিন্টিং প্রেসে। প্রেসটি ছিল চিটাগাং শহরে। প্রেসের কাজে ১৫ই নভেম্বর ১৯১৩ চিটাগাং থেকে রওনা দিয়ে ১৬ই নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। ১৬ই রাতে ছিলেন তাঁর পরিচিত শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র সেনের বাড়িতে। পরের দিন চলে গিয়েছিলেন খুড়তুত ভাই সারদাচরণ দের বাড়ীতে। ২০শে নভেম্বর বিকেল পর্যন্ত সারদাচরণের সাথেই ছিলেন। কলকাতায় এসে চিটাগাং মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপার ব্যাপারে তিনি এস. কে. লাহিড়ী কোম্পানীতেও গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে হঠাৎ একদিন রামকৃষ্ণ বুক ডিপোতে শশাঙ্কর দেখা হয়ে গিয়েছিল। শশাঙ্ক তাঁর পূর্বপরিচিত ছিলেন। দেখা হয়ে যেতে শশাঙ্ক তাঁকে একদিন তাঁর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে আসতে বলেছিলেন। ২০শে নভেম্বর রাতের দিকে তিনি শশাঙ্কর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শশাঙ্কর বাড়ীতে বেশী রাত হয়ে যাওয়ায় তিনি ফিরে আসতে পারেননি রাতে, থেকে গিয়েছিলেন শশাঙ্কর বাড়ীতে। ২১শে নভেম্বর সন্দেহবশত পুলিশ তাঁকে ঘুম থেকে তুলে গ্রেপ্তার করেছিল। চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র ১০টি টাকা সঙ্গে নিয়ে চিটাগাং থেকে রওনা দিয়েছিলেন। ১০ টাকার মধ্যে ৫ টাকা শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনের কাছে জমা রেখেছিলেন চিটাগাং ফিরে যাওয়ার পথ খরচের জন্য।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন তাঁর সাক্ষ্যে চন্দ্রশেখরের বক্তব্য সঠিক বলে আদালতকে জানিয়েছিলেন। অন্যান্য সাক্ষ্যসবূদ থেকে চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে বোমা বানানো বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোন প্রমাণ আদালতের কাছে আসেনি। ২১শে নভেম্বর ভোর রাতে তাঁকে শশাঙ্কর ঘর থেকে গ্রেপ্তার করার যথাযথ ব্যাখ্যা চন্দ্রশেখর আদালতের কাছে দিয়েছিলেন।

হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে এলেন, চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে দায়রা আদালতের দেওয়া শাস্তির আদেশ বাতিল করে দিলেন হাইকোর্ট। চন্দ্রশেখর দে হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি পেলেন।

সারদাচরণ গুহ ছিলেন ফরিদপুর জেলার মুলগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। সারদারা ছিলেন ৪ ভাই। ভাইদের মধ্যে সারদা ছিলেন সেজ। মেজ ভাই তারাচরণের ছিল মস্তিষ্ক বৈকল্য। তাঁকে রাখা হয়েছিল পাগলা গারদে। ছোটভাই দেবেন্দ্র ছিলেন বাবার ত্যাজ্যপুত্র। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি নিম্নজাত মেয়েকে বিয়ে করায় দেবেন্দ্রর সাথে পরিবারের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। সারদা তাঁর স্ত্রীর কথামত চলতেন বলে আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর বাবা সারদার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাছাড়া নানা ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সাথে সারদার বিবাদ ছিল। পরিবারের কিছু টাকা-পয়সা সারদা আত্মসাৎ করেছিলেন বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছিল। ১৬ই নভেম্বর, ১৯১৩ সারদা গ্রাম ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। ১৭ই নভেম্বর ভোরের দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন। আত্মীয়-পরিজন কয়েকজন কলকাতায় থাকলেও তাঁদের কাছে না উঠে একজন পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে উঠেছিলেন। পরিচিত ব্যক্তিটি থাকতেন ৮৮নং আপার সার্কুলার রোডে। শশাঙ্কর সঙ্গে তাঁর আগে থাকতেই জানাশোনা ছিল। শশাঙ্কর বাড়ি কাছেই ছিল। পরের দিন শশাঙ্কর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন সারদা।

শশাঙ্কর সাথে সারদার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯০৮ সালে। সেই সময় ফরিদপুরের গোঁসাইহাটে সারদার একটি দোকান ছিল। ১৯০৮ সালে শশাঙ্ক বাজিৎপুরে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। জমিদারি সেরেস্তার কাজে মাঝে মধ্যে শশাঙ্ককে গোঁসাইহাটে আসতে হ'ত। গোঁসাইহাটে শশাঙ্কর যাতায়াতের ফলে সারদার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ১৯১০ সালে জমিদারী সেরেস্তার কাজ ছেড়ে দিয়ে শশাঙ্ক চলে গিয়েছিলেন। এরপর বছর তিনেক তাঁদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। সারদা শশাঙ্কর সাথে দেখা করে তাঁর পারিবারিক কলহের কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। তাঁর অর্থাভাবের কথাও জানতে পেরেছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্কর সাথে দেখা করার দিন অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর সারদার গায়ে ছিল প্রচণ্ড জ্বর। সারদার অবস্থা দেখে জ্বর না কমা পর্যন্ত তাঁকে শশাঙ্ক তাঁর কাছে থাকতে দিয়েছিলেন। ২০শে নভেম্বর রাতে সারদা জ্বর গায়ে শশাঙ্কর ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। ২১শে ভোর রাতে অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তখনও তাঁর গায়ে ছিল প্রচণ্ড জ্বর। গ্রেপ্তার করে তাঁকে রাখা হয়েছিল জেলে। তাঁর অসুস্থতা দেখে ২৫শে নভেম্বর তাঁকে জেলের ডাক্তার পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়েছিলেন। জেলের ডাক্তার ছিলেন মাখনলাল মণ্ডল। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মামলায়। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে স্বীকার করেছিলেন জ্বরগ্রস্থ অবস্থায় সারদাকে জেলে আনা হয়েছিল। সারদাকে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর বিছানার তলায় তাঁর লেখা ৫টি চিঠি পাওয়া গিয়েছিল।

চিঠিগুলি লেখা হলেও পোস্ট করা হয়নি। একটি চিঠি ছিল কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রকে লেখা। অপর একটি চিঠি ছিল কাকা বিপিনচন্দ্র গুহকে লেখা। দুটি চিঠি লেখা হয়েছিল দুই শ্যালিকা সরোজিনী ও হেমাঙ্গিনীকে। পঞ্চম চিঠিটি লিখেছিলেন নিজের স্ত্রী চারুহাসিনীকে। চিঠিগুলিতে লেখা ছিল বেশ কিছুদিন তিনি দেশে ফিরতে পারবেন না। যোগসাধনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। স্ত্রীপুত্রের জন্যে তিনি খুবই চিন্তার মধ্যে থাকবেন তাও জানানো হয়েছিল শ্যালিকাদের।

সারদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোন সাক্ষ্য-সবুদ আসেনি। বোমা তৈরির ব্যাপারেও তাঁর কোন ভূমিকা ছিল কি না সেই সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হাইকোর্ট সারদাচরণ গুহ-র বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ নাকচ করে তাঁকে মুক্তির আদেশ দিলেন।

দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন ১৯১০ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র। শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় তিনি ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে কলেজ ছেড়ে দিয়ে বাবা মায়ের কাছে ফরিদপুরে চলে গিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি বহরমপুরে এসে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। বহরমপুরে দীনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন ১৯১৩ সালের জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত। এরপর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন রিপন কলেজে। রিপন কলেজে ভর্তি হলেও কলেজ হোস্টেলে জায়গা না পাওয়ায় দীনেশ উঠেছিলেন ৮৬/২, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে এক বন্ধুর মেস বাড়িতে। কিছুদিনের মধ্যেই চলে এসেছিলেন ৭৪নং সুখিয়া স্ট্রীটে। মেছুয়াবাজার মেসে দীনেশের সাথে পরিচয় হয়েছিল যোগেশচন্দ্র রায়ের। এই যোগেশের মারফৎ দীনেশের পরিচয় হয়েছিল শশাঙ্কর সাথে। ২০শে নভেম্বর শশাঙ্ক এসেছিলেন দীনেশের মেসে। এসে দেখলেন দীনেশ ভীষণভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। দীনেশের এই অবস্থা দেখে শশাঙ্ক তাঁকে সেইদিনই নিয়ে এসে তুলেছিলেন নিজের বাড়ীতে। ২১শে নভেম্বর দীনেশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শশাঙ্কর ঘর থেকে।

দীনেশ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। বোমা তৈরির সাথেও যে দীনেশের কোন সংশ্রব ছিল সেই ব্যাপারেও কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। চন্দ্রশেখর এবং সারদার মত দীনেশকেও মুক্তি দিলেন হাইকোর্ট।

কালীপদ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলেজ স্ট্রীট থেকে। তারিখটি ছিল ৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৩। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল কিছু লিফলেটস্। লিফলেটে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু প্ররোচনামূলক উক্তি ছিল। কালিপদ ঘোষের আসল নাম ছিল উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী। কালিপদ কম্পোজিটর হিসেবে কলকাতার লোকনাথ প্রেসে কাজ করতেন। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কালিপদ রাজাবাজার বোমা মামলায় জড়িত। কালিপদ ঘোষের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কালিপদকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম করেন। সুরেশ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সুরেশের সাথে একই বছর খগেন্দ্রনাথ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সুরেশ ভালভাবে পাশ করে গেলেও খগেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। সুরেশ নামে পরিচয় দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা প্রার্থী হিসেবে হুগলি জেলার বাসতাড়া স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরির জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন। চাকুরিটি পেয়ে বাসতাড়া স্কুলে

যোগ দিয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথ। খগেন্দ্রনাথের সাথে শশাঙ্ক এবং কালিপদর বন্ধুত্ব ছিল। একাধিকবার হুগলি থেকে কলকাতায় এসে খগেন্দ্রনাথ শশাঙ্কর বাড়ীতে থেকেছেন। দায়রা আদালতের বিচারে খগেন্দ্রনাথ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ থেকে আপিল দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রকৃতপক্ষে খগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণই ছিল না মামলায়। বিচার বিবেচনা করে দায়রা আদালতের আদেশ বহাল রাখলেন হাইকোর্ট। অর্থাৎ খগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুক্তির আদেশ হাইকোর্ট সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে সরকার পক্ষের আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হ'ল।

শশাঙ্কশেখর হাজরার বিরুদ্ধে দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছিল হাইকোর্টে। তাঁর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে দন্ডের মেয়াদ কমালেন না হাইকোর্ট। দায়রা আদালতের দেওয়া ১৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশই বহাল রাখলেন হাইকোর্ট।

কলকাতা হাইকোর্ট এই বিখ্যাত মামলাটির রায় দিয়েছিলেন ১৯১৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। সবকটি আপিল মামলার শুনানী হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চে। বেঞ্চটি গঠন করা হয়েছিল স্যার আশুতোষ এবং বিচারপতি রিচার্ডসনকে নিয়ে।

রাজাবাজার বোমা মামলাটি নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র দেশে। সাধারণ মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকতেন মামলাটির ফলাফল জানার জন্য। রাজাবাজার বোমা মামলাটি ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্থান পাবে।

হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩০ সালের ঘটনা। এই সময় ভবানন্দ ব্যানার্জী এবং মনমোহন অধিকারী নামে দুইজন যুবক থাকতেন হাওড়ার কালী ব্যানার্জী লেনে। মনমোহন অধিকারী নিজের এলাকার মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন 'নব' নামে। ভবানন্দের ২৪ এবং নবর বয়স ছিল ২০। ভবানন্দ ব্যানার্জী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে টাইপিস্টের কাজ করতেন। নব অধিকারী ছিলেন বেকার।

হাওড়ার শিবপুর থানার সাব-ইনস্‌পেক্টার ফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত বাস করতেন ৫১নং বাজে শিবপুর রোডে। ১৬ই মে, ১৯৩০ সকাল অনুমান ৩-৪৫ মিনিটের সময় তাঁর বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে একটি বোমা (বিস্ফোরক পদার্থে তৈরি) ছোঁড়া হয়েছিল বাইরে থেকে। দুষ্কৃতকারী বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কেউ দেখতে পায়নি। তখনও রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফোটেনি। সাব-ইনস্‌পেক্টার ফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে ১৬ই মে শিবপুর থানায় একটি মামলা রুজু করা হ'ল ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৩/৪-বি/৬ ধারায়। মামলাটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে সন্দেহবশত বেশ কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে ভবানন্দ ব্যানার্জী এবং মনমোহন অধিকারী ওরফে নবকে রেখে বাদ বাকি অভিযুক্তদের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায়। ভবানন্দ ও নবর বিচার হয়েছিল একটি ট্রাইবুনালে।

ভবানন্দ ব্যানার্জীকে হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৭ই মে সকালে। এই দিনই সকালের দিকে শচীন্দ্রনাথ খাঁ সমেত আরো কয়েকজনকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বোমা ষড়যন্ত্র মামলায়। ১৮ই মে সকাল ১০টায় গ্রেপ্তারিত অভিযুক্তদের হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ বাদে অন্যান্য অভিযুক্তদের হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে। শচীন্দ্রকে শুধু রেখে দেওয়া হয়েছিল পুলিশের হেফাজাতে। মনমোহন ওরফে নব অধিকারী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন ১৯শে মে সন্ধ্যাবেলা।

হাওডা বোমা ষড়যন্ত্র মামলাটিতে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন ভবানন্দ ব্যানার্জী, মনমোহন অধিকারী ওরফে নব এবং শচীন্দ্রনাথ খাঁ। অভিযুক্ত আসামীদের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছিলেন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশের দাখিল করা চার্জশিটের ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল বিচারাধীন আসামী ভবানন্দ ও নবর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বলেছিলেন, অভিযুক্ত আসামীদ্বয় হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত বাজে শিবপুরে পুলিশ সাব-ইনস্‌পেক্টার ফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের বাড়ীর একটি ঘরে সকাল অনুমান ৩-৪৫ মিনিটের সময় খোলা জানালা দিয়ে বোমা (বিস্ফোরক পদার্থে তৈরি) ছুঁড়েছিলেন।

আসামীদ্বয় অভিযোগ অস্বীকার করায় ট্রাইবুনালে তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণ করা হয়েছিল। সাক্ষ্যসাবুদের ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল উভয় অভিযুক্ত আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। মনমোহন ওরফে নবর শাস্তি হয়েছিল বিস্ফোরক আইনের ৩ ও ৪ (বি) ধারায় আর ভবানন্দের শাস্তি হয়েছিল বিস্ফোরক আইনের ৬ ধারায়। ট্রাইবুনাল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন নব অধিকারী পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টার ফণীন্দ্রমোহনের ঘরে বোমা ছুঁড়ে ছিলেন। অপর আসামী ভবানন্দ বোমা তৈরি করার জন্য বারুদ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের যোগান দিয়েছিলেন। পূর্ব ষড়যন্ত্র মত পুলিশ খতম করার জন্য মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা তৈরি করা হয়েছিল।

ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডিত আসামীরা পৃথকভাবে আপিল দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে ১৯৩০ সালে। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে আপিল দুটির শুনানি হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে। স্পেশাল বেঞ্চের ৩ জন বিচারপতি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি র‍্যানকিনস্, বিচারপতি সি সি ঘোষ এবং বিচারপতি বাকল্যান্ড।

হাইকোর্টে দন্ডিত আসামীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীসন্তোষকুমার বাসু।

ট্রাইবুনালের নথিপত্র থেকে দেখা গেল দণ্ডিত আসামী নব অধিকারী হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন ১৯মে, ১৯৩০। শচীন্দ্রনাথ খাঁনেরও স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। শচীন্দ্রনাথ পরে অবশ্য সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলায়। পুলিশের প্রার্থনা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ২১শে মে ভবানন্দকে জেল হাজত থেকে পুলিশের হেফাজাতে নেওয়া হয়েছিল। ২২শে মে ভবানন্দ হাওড়ার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। গ্রেপ্তারের ৪/৫ দিন পর জেল হাজত থেকে ভবানন্দকে পুলিশ হাজতে নেওয়ার কারণ হিসেবে পুলিশের তরফে বলা হয়েছিল ভবানন্দ বোমা তৈরির জন্য একটি দোকান থেকে রেড্ আরসেনিক কিনেছিলেন। ভবানন্দ নির্দিষ্ট দোকানটি দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁকে পুলিশ হেফাজতে রাখা তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। পুলিশ হেফাজতে আনার পর ভবানন্দ নির্দিষ্ট দোকানটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন পুলিশকে। কিন্তু দোকানটিতে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ কোনরকমের বিস্ফোরক পদার্থ পায়নি। এমনকি নির্দিষ্ট দোকানটির বিস্ফোরক পদার্থ বেচাকেনার লাইসেন্স পর্যন্ত ছিল না। মামলার নথি থেকে দেখা গিয়েছিল ভবানন্দকে ২১শে মে-র সকাল থেকে স্বীকারোক্তি দেওয়া পর্যন্ত রাখা হয়েছিল পুলিশ হেফাজতে। ২২শে মে স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর ভবানন্দকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জেল হাজতে। হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাথমিক স্তরে শচীন্দ্রনাথ খাঁনকে অভিযুক্ত আসামী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হলেও পরবর্তী সময়ে সরকার পক্ষ তাঁকে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ ছিলেন ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষের ১৪নং সাক্ষী। সরকার পক্ষের সাক্ষী হওয়ায় শচীন্দ্রনাথের দেওয়া স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়নি।

হাইকোর্টে আপিলের শুনানি উঠলে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল এই মর্মে যে ভবানন্দ ব্যানার্জী এবং নব অধিকারী স্বীকারোক্তি কখনই স্বেচ্ছায় দেননি। পুলিশের প্ররোচনায় এবং অত্যাচারে ভবানন্দ এবং নব দুজনই মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া এই দুজন আসামীর স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট মামলায় নথিভুক্ত করেছিলেন

বে-আইনিভাবে। এই দুজনের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে ট্রাইবুনালের পক্ষে মামলাটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হয়নি। দণ্ডিত আসামীদের আইনজীবীর এই সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বললেন, ট্রাইবুনালের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য এবং মামলার নথি থেকে দেখা যাচ্ছে ভবানন্দ এবং নবর স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করার আগে হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট যথাসম্ভব তাদের সচেতন করে দিয়ে বলেছিলেন আইনত অভিযুক্তদ্বয় স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য নন। এ ছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন স্বেচ্ছায় এবং পুলিশের বিনা প্ররোচনায় তাঁরা স্বীকারোক্তি করতে আগ্রহী হয়েছেন, না তাঁদের বাধ্য করা হয়েছে মিথ্যা স্বীকারোক্তি করতে। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে দুজন অভিযুক্তই বলেছিলেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করতে আগ্রহী এবং পুলিশের কথায় তাঁরা স্বীকারোক্তি করতে আসেননি। প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট আইনের বিধান অনুসরণ করে ভবানন্দ এবং নবর স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছিলেন।

হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদ্বয়ের স্বীকারোক্তি আইনগ্রাহ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য মামলার নথি থেকে প্রকাশ ট্রাইবুনালে বিচার চলাকালীন অবস্থায় ভবানন্দ এবং নব দুজনই বলেছিলেন তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেননি। পুলিশের নির্যাতন থেকে বাঁচতে তাঁরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তাঁদের স্বীকারোক্তি কখনই স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। হাইকোর্ট বা ট্রাইবুনাল আসামীদ্বয়ের এই বক্তব্য মানতে পারেননি।

ট্রাইবুনালে বিচারের সময় নব অধিকারী একটি নতুন গল্পের অবতারণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পুলিশ তাঁকে বলেছিল, তাঁদের শেখানো মত স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দিলে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। পুলিশের কথায় বিশ্বাস করে মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন পুলিশের শেখানোমত। তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তিতে সত্য প্রতিফলিত হয়নি। আসামী নব অধিকারীর এই নতুন গল্প ট্রাইবুনাল বিশ্বাস করতে পারেননি। এই ব্যাপারে ট্রাইবুনালের সাথে হাইকোর্টও একমত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট নব অধিকারীর দেওয়া স্বীকারোক্তি পর্যালোচনা করেছিলেন। নবর স্বীকারোক্তি থেকে দেখা গেল তিনি ছিলেন একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন এবং কংগ্রেস পার্টি পরিচালিত পিকেটিংয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাওড়া ময়দানে পুলিশের কাজকর্মের বিরুদ্ধে হৃষিকেশ দত্তের সাথে তাঁর একাধিকবার শলাপরামর্শ হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে কর্মসূচী নিয়ে শচীন্দ্রনাথের সাথেও তাঁর হাওড়া ময়দানে কথাবার্তা হয়েছে। যেদিন ভোর রাতে পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর ফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের বাজে শিবপুরের বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে বোমা মারা হয়েছিল, তার আগের মঙ্গলবার হৃষিকেশ দত্ত তাঁকে বলেছিলেন, তিনি এক নতুন ধরনের বোমা তৈরি করেছেন। তাঁর তৈরি বোমা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এই বোমা পরীক্ষা করতে হবে কাঠ বা টিনের উপর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। এই আলোচনার দুদিন বাদে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার একটি সিলিন্ডারে ভরে একটি বোমা হৃষিকেশ তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। বোমাটির আকৃতি ছিল একটি টেনিস্ বলের মত। বোমার মুখটিতে ছিল পাট জড়ানো। বোমাসমেত সিলিন্ডারটি নিয়ে তিনি যতীন দত্তের বাড়ির পিছনে ইঁটের গাদার ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাতের অন্ধকারে। সেই রাতে তিনি যতীন দত্তের বাড়িতেই শুয়েছিলেন। রাত অনুমান সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠে ইটের ফাঁক থেকে বোমাটি বার

করে নিয়ে তিনি বাজে শিবপুর এসেছিলেন। পরিকল্পনা মত ৩-৪৫ মিনিটের সময় পুলিশ সাব্-ইনস্পেক্টর ফণীন্দ্রমোহনের বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে রাস্তা থেকে তিনি বোমাটি ফেলেছিলেন ঘরের মধ্যে। বোমাটি ফেলেই পালিয়ে এসেছিলেন বাজে শিবপুর থেকে। সকলের অজান্তে আবার তিনি যতীন দত্তের বাড়ীতে এসে শুয়ে পড়েছিলেন। শুক্রবার সারাদিন রাত নিজের বাড়িতেই কেটেছিল নবর। পুলিশ অফিসারের বাড়িতে বোমা ফেলার ঘটনা নিয়ে হইচই শুরু হতে তিনি পরদিন খুব ভোরে কালী ব্যানার্জী লেনের বাড়ি ছেড়ে চন্দননগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। চন্দননগরে তাঁর এক স্কুলের সহপাঠী থাকতেন। চন্দননগরে পৌঁছে সহপাঠীকে তার বাড়ীতে না পাওয়ায় স্টেশনের রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন তিনি। এমন সময় নিজের পাড়ার এক চেনা বৃদ্ধা মহিলার সাথে তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল চন্দননগর স্টেশনের কাছে। বৃদ্ধা মহিলার সাথে কথাবার্তায় নব জানতে পেরেছিলেন বৃদ্ধা মহিলা পালপাড়ায় তাঁর জামাতার বাড়ীতে এসেছিলেন। বৃদ্ধা মহিলাটিকে তার আশ্রয়হীনতার কথা জানালে তিনি নবকে পালপাড়ায় তাঁর জামাতার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আশ্রয় না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত নবকে ফিরে আসতে হয়েছিল হাওড়ায় নিজের বাড়িতে। পরের দিন অর্থাৎ ১৮ই মে বিকালের দিকে পুলিশ তাঁকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ১৯শে মে তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়।

সরকারপক্ষের ১২নং সাক্ষী ছিলেন মহেশমোহন চন্দ্র। তিনি ট্রাইবুনালের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে নবকে শনাক্ত করে বলেছিলেন, এই যুবকটির সাথে ১৭ই মে বিকেল অনুমান ৪টার সময় তাঁর দিদিমার সাথে চন্দননগর স্টেশনের পথে দেখা হয়েছিল। মহেশ তাঁর বৃদ্ধা দিদিমাকে নিয়ে এই সময় হাওড়া যাওয়ার জন্য স্টেশনের দিকে আসছিলেন। সরকারপক্ষের ১২নং সাক্ষী ছিলেন বারীন্দ্র অধিকারী। চন্দননগরে থাকতেন বারীন্দ্র অধিকারী। তাঁর বাবা যতীন অধিকারী ছিলেন স্টেশনের পথে দেখা হওয়া সেই বৃদ্ধা মহিলার জামাতা। বারীন্দ্র তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, ১৭ই মে বিকেলের দিকে একটি যুবক তাঁদের বাড়িতে এসে বলেছিলেন, কংগ্রেস পরিচালিত লবণ আইন ভাঙার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় পুলিশ তাকে খুঁজছে। তাই তাঁর গুপ্ত আশ্রয় প্রয়োজন। বারীন্দ্র যুবকটির মুখে সব শোনার পর তাঁকে হাওড়ায় ফিরে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়ায় যুবকটি তাঁদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, বারীন্দ্র অবশ্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো নবকে চিনতে পারেননি।

মামলার নথি থেকে প্রকাশ, গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে ১৭ই মে সকালবেলা পুলিশ যতীন দত্তের বাড়ি তল্লাসী করেছিল। পুলিশের কাছে খবর ছিল নব অধিকারী সাময়িকভাবে যতীন দত্তের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিলেন। তল্লাসীতে কিছু বই ও কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। পরে প্রমাণিত হয়েছিল বইগুলি সবই ছিল নব অধিকারীর। তাছাড়া নবর দেওয়া নতুন তৈরি বোমার আকৃতির সাথে বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষজ্ঞের দেওয়া মতামতের মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

হাইকোর্ট আপিল মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, পরবর্তীকালে আসামীর অস্বীকার করা স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আদালতকে অবশ্যই বিশেষ সচেতন হতে হবে। তাই বলে পরবর্তীকালে অস্বীকার করা স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে আইনগত কোন বাধা নেই।

সবদিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্ট ট্রাইবুনালের সাথে একমত হয়ে মনমোহন অধিকারী ওরফে নবর বিরুদ্ধে দেওয়া দণ্ডাদেশ বহাল রেখে তাঁর আপিলটি খারিজ করে দিয়েছিলেন।

ভবানন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচনা করে হাইকোর্ট বললেন, ভবানন্দের স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে ১০ই মে হৃষি এবং অপর অচেনা একটি যুবকের সাথে নিজের বাড়িতে বসে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাটি ছিল বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা তৈরি করা নিয়ে। সেই বোমা পুলিশের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবহার করা হবে সেই ব্যাপারেও কথা হয়েছিল। হৃষি তাঁকে কিছু রেড আরসেনিক্ এবং বুলেট সংগ্রহ করে দিতে বলেছিলেন। তিনি হৃষির নির্দেশ মত রেড আরসেনিক্ এবং বুলেট যোগাড় করে গণেশ নামে এক যুবকের হাতে দিয়েছিলেন। গণেশ সেইগুলি পৌঁছে দিয়েছিলেন হৃষির কাছে। বোমা তৈরি করার পর হৃষি একটি বোমা দিয়েছিলেন নবকে। উদ্দেশ্য, বোমাটি পরীক্ষা করা।

মামলায় ভবানন্দের বয়ানের এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ ছিল এইরকম—

Our intention was to try the bomb first at the Ganges Ghat but then I cannot say why they threw the bomb in Shibpur"

হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় ভবানন্দের বাড়ি তল্লাসী করা হয়েছিল ২০শে মে, ১৯৩০। পুলিশি তল্লাসীতে ভবানন্দের বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি বন্দুক, কিছু গান পাউডার এবং পারকার্শন ক্যাপস্। অবশ্য তাঁর বাড়ি থেকে বন্দুকের বুলেট পাওয়া গেল না। পুলিশি তল্লাসীতে পাওয়া বন্দুকটি ছিল ভবানন্দের বাবার।

ভবানন্দের স্বীকারোক্তির সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য সাবুদের মিল খুঁজে পাওয়ায় হাইকোর্ট ভবানন্দের আপিল মামলাটিও খারিজ করে দিয়ে ট্রাইবুনালের রায়ই বহাল রেখেছিলেন।

দুই দণ্ডিত আসামীর আপিল দুটি খারিজ হয়েছিল ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী।

রায়ের উপসংহারে হাইকোর্ট বলেছিলেন, দন্ডিত আসামীদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছিল মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে নতুন ধরনের বোমা তৈরি করে সেই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুলিশ খতম করা। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করলে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড মোটেই গুরুদণ্ড নয়। বরং বলা যায় লঘুদণ্ড হয়েছে।

ভবানন্দ এবং নবর মত বিপ্লবী যুবকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা থেকে আজ হারিয়ে গিয়েছেন। হয়ত এলাকার সাধারণ মানুষও জানেন না এইসব যুবকদের সংগ্রামী জীবনের কথা। কালের প্রবাহে একদিন সবই মুছে যায়। এইসব যুবকের দল হয়ত সেইভাবেই মুছে গিয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

"বন্দেমাতরম" পত্রিকার মুদ্রাকর দণ্ডিত

'বন্দেমাতরম' পত্রিকা কলকাতা থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হত। প্রেস্ আইন অনুযায়ী 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটি দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মুদ্রাকর ছিলেন শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোস। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রাজদ্রোহিতা-মূলক নিবন্ধ ছাপা হওয়ায় কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া হয়েছিল শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়ার জন্য চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদন করেছিলেন বাংলার গোয়েন্দা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ অ্যালিশ। মিঃ অ্যালিশের দাখিল করা আবেদন পত্রটির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল চিফ্ সেক্রেটারীর স্বাক্ষর করা একটি অনুমোদন পত্র। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বলে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধারায়। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা। মুদ্রাকর শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের সাথে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজারকে একই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় ছাপা একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে মামলাটির অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মিঃ অ্যালিশ।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় মুদ্রিত নিবন্ধটির নাম ছিল "ভারতবাসীর রাজনীতি" (Politics for Indians)। নিবন্ধটি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার শহর ও ডাক উভয় সংকলনেই মুদ্রিত হয়েছিল ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন তারিখে। ইতিপূর্বে নিবন্ধটি যুগান্তর সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হওয়ায় রাজদ্রোহিতার অভিযোগে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক দণ্ডিত হয়েছিলেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধারায়।

রাজদ্রোহিতার মামলাটিতে বাংলা সরকারের চিফ্ সেক্রেটারীর স্বাক্ষর করা তিনবার তিনটি অনুমোদন পত্র (Sanction) দাখিল করা হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে। অনুমোদন পত্রে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেওয়ায় একাধিকবার অনুমোদনপত্র দাখিল করতে হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে।

মামলাটিতে সাক্ষ্য নেওয়ার পর প্রমাণাভাবে ১৯০৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজারকে। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় পত্রিকার মুদ্রাকর শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোস চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক আইনগত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল হাইকোর্টের কাছে।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের পক্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী এ. এন. চৌধুরী, শ্রীমন্মথনাথ মুখার্জী, নরেন্দ্রকুমার বাসু প্রভৃতি। সরকার পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল করেছিলেন মিঃ বাগরাম।

বাংলা সরকারের পক্ষে তদানীন্তন চিফ্ সেক্রেটারীর স্বাক্ষর করা অনুমোদন পত্রের তারিখ ছিল ৬ই আগস্ট, ১৯০৭। এই ৬ই আগস্টের স্বাক্ষর করা অনুমোদন পত্রটি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল ১৭ই আগস্ট। আদালতে অনুমোদন পত্রটি দাখিল করেছিলেন মিঃ অ্যালিশ্ (Mr. Ellis)। সরকারী অনুমোদন পত্রটিতে অভিযুক্ত আসামী হিসেবে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মুদ্রাকর শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের নাম ছিল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়ার আবেদনটির সাথে প্রথম বারের চীফ্ সেক্রেটারীর স্বাক্ষর করা অনুমোদনপত্রটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকারী অনুমোদনপত্রে দুই কিস্তির অভিযোগ ছিল। প্রথম কিস্তির অভিযোগে বলা হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় "ভারতবর্ষ ভারতবাসীর" নিবন্ধটি মুদ্রিত করে সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তিতে বলা হয়েছিল যুগান্তর সাপ্তাহিকে পূর্বে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্ররোচনামূলক নিবন্ধ পুনরায় ছাপা হয়েছে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায়। এইসব নিবন্ধ ছাপা হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মানোর উদ্দেশ্যে। নিবন্ধগুলির মধ্যে একটির জন্য ইতিপূর্বেই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকের শাস্তি হয়েছিল।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-বলে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২১শে আগস্ট, ১৯০৭। কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার শুরু হয়েছিল ২৬শে আগস্ট ১৯০৭। অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর। বিচার শেষে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসকে দোষী সাব্যস্ত করে দন্ডিত করা হয়েছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর।

বর্তমান মামলাটির অভিযোগপত্রের সাথে যে অনুমোদনপত্রটি দাখিল করা হয়েছিল, সেই সরকারী অনুমোদনপত্রে নিবন্ধটির নাম দেওয়া হয়েছিল "ভারতবর্ষ ভারতবাসীর" (India for Indians)। পরে আবার একটি সরকারী অনুমোদন পত্র দাখিল করে বলা হল 'ভারতবর্ষ ভারতবাসীর' জায়গায় নিবন্ধটির নাম হবে 'ভারতবাসীর রাজনীতি'। অনুমোদন পত্রগুলি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল তদানীন্তন পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে। বিচিত্র ব্যাপার, চিফ্ সেক্রেটারী মিঃ ই. এ. গ্যাট্ সাহেবের স্বাক্ষর করা অনুমোদন পত্রগুলিতে অভিযুক্ত আসামীর নামের জায়গাটি ছিল ফাঁকা। অনুমোদনপত্রে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের নাম লেখা ছিল না। অথচ গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আবেদনটির সাথে জুড়ে দেওয়া প্রথম অনুমোদন পত্রটিতে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের নাম লেখা ছিল।

হাইকোর্টের কাছে দণ্ডিত আসামী অপূর্বকৃষ্ণের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল এই ধরনের অনুমোদন পত্র আইনগ্রাহ্য নয়। মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা না করে চিফ্ সেক্রেটারী একাধিক অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। সরকারী অনুমোদন পত্রই যদি আইনগ্রাহ্য না হয়, তাহলে নিম্ন আদালতের সমগ্র বিচার ও আসামীর দণ্ডাদেশটি বানচাল হওয়া উচিত। হাইকোর্ট আসামীপক্ষের সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করে বললেন, ভুলবশত পরবর্তী অনুমোদনপত্রে অভিযুক্ত আসামীর নামের ঘরটি ফাঁকা রয়ে গিয়েছিল। গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সাথে জুড়ে দেওয়া অনুমোদন পত্রটিতে অভিযুক্ত আসামীর নাম দেওয়া ছিল সঠিকভাবে এবং ১৭ই আগস্ট সেইটি দাখিল করা হয়েছিল আদালতের কাছে। সুতরাং পরবর্তী অনুমোদনপত্রে অভিযুক্ত আসামীর নামের যায়গাটি ফাঁকা থাকলেও বুঝতে অসুবিধে ছিল না শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসই ছিলেন অভিযুক্ত আসামী। এই ব্যাপারটি অভিযুক্ত আসামীর পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধার কারণ ছিল না।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বোসের পক্ষে হাইকোর্টে একাধিক প্রশ্ন তুলে সওয়াল করা হয়েছিল।

সওয়াল করা হয়েছিল অনুমোদনপত্রের গোলমালের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষের উচিত ছিল মিঃ গ্যাট এবং মিঃ অ্যালিশ্‌কে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলা। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুইজনকে সাক্ষী মানা হয়নি।

এরপর সওয়াল করা হয়েছিল নির্দিষ্ট নিবন্ধটির নাম কোন জায়গায় বলা হয়েছে, "ভারতবর্ষ ভারতবাসীর", আবার কোন যায়গায় বলা হয়েছে নিবন্ধটির নাম "ভারতবাসীর রাজনীতি"। এই ধরনের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে কোন রাজদ্রোহিতার মামলা চলতে পারে না।

একই অভিযোগে বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক ও ম্যানেজারকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তখন কেবলমাত্র মুদ্রাকরকে দণ্ডিত করা সম্পূর্ণ বে-আইনি হয়েছে।

হাইকোর্ট আসামী পক্ষের কোন সওয়ালই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না। এর পর নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি বিবেচনা করে হাইকোর্ট বললেন, ভারতবাসীর রাজনীতি নিবন্ধটি পড়লে পাঠকের মনে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মানো স্বাভাবিক। নিবন্ধটি ছাপাবার দায়-দায়িত্ব বন্দেমাতরম দৈনিকের মুদ্রাকর কখনই অস্বীকার করতে পারেন না। এই ধরনের রাজদ্রোহিতামূলক নিবন্ধ ছাপাবার আগে মুদ্রাকরের বিবেচনা করে দেখা উচিত নির্দিষ্ট নিবন্ধটি ছাপা হলে জনসাধারণের মনে সরকারের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

তাছাড়া বন্দেমাতরম পত্রিকায় যে সময় এই ধরনের নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল তখন দেশময় চলছিল একটা ডামাডোল। সাধারণ মানুষ নানা ব্যাপারে সরকারের উপর উত্তপ্ত হয়েছিলেন। এই উত্তাপের উপর আবার এই ধরনের নিবন্ধ ছাপিয়ে মানুষের মনে আরো উত্তাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বাংলা বিভাজন নিয়ে দেশের মানুষ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। "ভারতবাসীর রাজনীতি" নিবন্ধটি এই অবস্থায় "বন্দেমাতরমের" মুদ্রাকরের ছাপানো নিশ্চয়ই প্ররোচনামূলক অভিসন্ধি।

এরপর হাইকোর্টের কাছে দণ্ডিত আসামীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আসামীর ইংরেজী জ্ঞান অল্প থাকার জন্য নিবন্ধটির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। তাঁর উপর যেমন নির্দেশ ছিল, ভাল-মন্দ না বুঝে তিনি নিবন্ধটি সেইভাবেই ছেপেছিলেন। এই ব্যাপারে পত্রিকার মুদ্রাকরের কোন জ্ঞানত অপরাধ ছিল না। হাইকোর্ট আসামীপক্ষের এই যুক্তিও মেনে নিতে পারলেন না। দণ্ডিত আসামীর দণ্ড হ্রাসেরও কোন যৌক্তিকতা খুঁজে না পাওয়ায় চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশই বহাল রাখলেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটির নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিদ্বয় ছিলেন ক্যাশপার্জ এবং চিট্টি।

বন্দেমাতরম ছিল এইসময় বাঙালীর কাছে উদ্দীপক সংবাদপত্র। এই কারণে ভারতবর্ষের বিদেশী প্রশাসনের শ্যেন দৃষ্টি ছিল পত্রিকাটির উপর।

পরবর্তীকালে বন্দেমাতরম পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে পত্রিকাটির অবদান সত্যিই কি ভোলা যায়?

"ইয়ং ইন্ডিয়ায়" চিঠি প্রকাশ করায় গান্ধীজী সতর্কিত

১৯১৯ সাল। এই সময় আমেদাবাদের জেলা জজসাহেব ছিলেন মিঃ বি. সি. কেনেডি। ২২শে এপ্রিল মিঃ কেনেডি একটি চিঠি লিখেছিলেন বোম্বে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারারের কাছে। চিঠিটিতে অভিযোগ ছিল কয়েকজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে। মিঃ কেনেডির লেখা চিঠিটিকে কেন্দ্র করে বোম্বে হাইকোর্ট ১৯১৯ সালের ১২ই জুলাই কয়েকজন আইনজীবীর উপর নোটিশ জারি করেছিলেন। নোটিশে উল্লেখিত অভিযোগ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট আইনজীবীদের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল। মিঃ কেনেডির চিঠিটিতে বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট আইনজীবীরা আইন পেশার সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গীকারপত্রে নিজেদের নাম সই করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই ধরনের অঙ্গীকারপত্রে সই করে নির্দিষ্ট আইনজীবীরা পেশাগত বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছেন। নির্দিষ্ট আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার জে. ভি. দেশাই, ব্যারিস্টার ভি জে. প্যাটেল, প্লীডার কে. এন. দেশাই, শ্রীগোপাল রাও, রামচন্দ্র দাবোলকর, শ্রী এম. ভি কোঠারী এবং শ্রীকালিদাস জাসকরণ জাভেরি।

আমেদাবাদের জেলা জজ সাহেব মিঃ কেনেডির হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারারকে লেখা চিঠিটির বয়ান ছিল—

"I have the Honour to submit for the determination of their Lordships the question of the Pleaders of this court who have signed what is Known as the Satyagrahi Pledge. The following are the Pleaders practising here who have given their names as members of the Satyagrahi League.

Mr. Gopalrao Ram Ghandra Dabholkar.

Mr. Krishnalal Narsilal Desai, High Court Pleader.

Mr. Manilal Vallavbhram Kothari.

Mr. Kalidas Jaskaran Jhaveri.

আইনগত অসুবিধার জন্য ব্যারিস্টার দুজনের নাম চিঠিটিতে উল্লেখ করেননি মিঃ কেনেডি। চিঠিতে উল্লেখিত ৪ জন আইনজীবীর সাথে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অঙ্গীকারপত্রে তাঁদের সই করা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল মিঃ কেনেডির। আইনজীবী ৪ জনের কাছে আলোচনার সময় জেলা জজ সাহেব তাঁর নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি উল্লেখিত আইনজীবীদের কাছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অঙ্গীকার পত্রে তাঁদের সই করার কারণ বিশ্লেষণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু আইনজীবীদের জবাব ও বিশ্লেষণ জেলা জজ সাহেবের মনঃপূত হয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি হাইকোর্টকে লিখেছিলেন—

I had an interview with the above gentlemen on the 16th and expressed

my sentiments elicited theirs. I asked for some sort of satisfactory explanation of the sense in which they took the Satyagrahi Oath. They have furnished an explanation which I do not think is satisfactory. I, therefore, submit the case for orders, as I suppose the question is general to all Districts.

হাইকোর্টের প্লীডারদের সাথে আলোচনায় প্লীডাররা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গীকারপত্রে তাঁদের সই করা নিয়ে যে সব যুক্তি দিয়েছিলেন, মিঃ কেনেডির কাছে সেই সব যুক্তি গ্রহণীয় নয় বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন—

As I understand the Satyagrahi Oath, it binds the signatories not only to oppose the Rowlatt Bills and Cognate legislation, but to break all laws of whatever kind which a committee may decide should be broken. I gather also from the papers that some illegal acts have been already ordained. I cannot myself see that the public adherence to a body which has that rule binding on it, is consistent with the duty of a Pleader and the terms of his Sanad, and I think the explanation furnished by the Pleaders bear matters much where they are.

মিঃ কেনেডি তাঁর নিজস্ব মনোভাব জানিয়ে বোম্বে হাইকোর্টকে লিখেছিলেন—

I am of the belief that the above gentlemen are sincerely and conscientiously under impression that the Rowlatt Bill Legisla tion is a Crime, and as they have that impression, I would not blame them for going to the edge of the law to oppose it. They are all men for whom I have considerable esteem, and I have known them and appreciated them for some years, and it very painful for me to raise their case, but I am of opinion that they are unfit to practise until they have Severd their connection with this league in the same public way in which they have joined it"

চিঠির এই অংশের বাংলা ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়—এইসব ভদ্রলোকেরা ধারণা পোষণ করেন রাওলাট বিল আইনগত ভাবে চালু হওয়া এক কথায় সরকারের পক্ষে যেন একটা অপরাধ ও অন্যায়। রাওলাট বিলের আইনগত সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে সমালোচনা করলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু এই সব ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও এই সব মানুষদের সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা ছিল, কারণ এঁদের আমি বহুদিন ধরে জানি। কিন্তু আমার কাছে খুবই বেদনার ব্যাপার যে আমাকেই বলতে হচ্ছে এই সব ভদ্রগণেরা এর পর আইন পেশায় নিযুক্ত থাকার যোগ্য নন, যদি না তাঁরা সত্যাগ্রহীদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সব আইনজীবীদের খোলাখুলিভাবে জনসাধারণকে জানানো উচিত, তাঁরা ভুল করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গীকার পত্রে সই করে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এর পরের অংশে মিঃ কেনেডি লিখেছিলেন—

"But I have no power to deal with them and very likely recent events in Ahmedabad may make it unnecessary to proceed against them. I enclose a copy of the Satyagrahi Oath and of the explanation and covering letter of three of the Pleaders concerned. No one would be more pleased than

myself if it could be found that the explanation as satisfactory. But personally I am of the opinion it is no."

এই অংশের বাংলা ভাবার্থ করলে এইভাবে বলা যায়—"কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার এক্তিয়ার আমার নেই। আমেদাবাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে এই সব আইনজীবীদের বিরুদ্ধে এখানে বর্তমান অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। আমি আমার চিঠির সাথে সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার পত্রটির একটি নকল এবং তিনজন প্লীডারের লিখিত বক্তব্য জুড়ে দিলাম। যদি তাঁদের এই লিখিত বক্তব্য গ্রহণীয় বলে মনে হয় তাহলে আমার থেকে বেশি কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু তিনজনের বক্তব্য গ্রহণীয় হবে না বলেই আমার মনে হয়।"

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আমেদাবাদে মার্চ মাসের প্রথম থেকে এপ্রিলের ১০ তারিখের মধ্যে একাধিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রস্তুতির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য চিঠিতে উল্লেখিত আইনজীবীরা সেই সব সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মিঃ কেনেডির প্রথম চিঠিটিকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত আইনজীবীদের উপর যে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তার জবাব দেওয়ার জন্য সেই নোটিশের নকল চেয়েছিলেন নির্দিষ্ট আইনজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ। প্রার্থনা অনুযায়ী মিঃ কেনেডির হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারারকে লেখা চিঠির নকল দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট কয়েকজন আইনজীবীকে। অবশ্য চিঠির নকল দেওয়ার সময় উল্লেখিত আইনজীবীদের বলে দেওয়া হয়নি যে এই চিঠিটি কোনভাবে যেন সাধারণ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া না হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট আইনজীবীদের বোঝা উচিত ছিল মিঃ কেনেডির ব্যক্তিগতভাবে লেখা চিঠিটির নকল তাদের দেওয়া হয়েছিল নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য তাঁদের চিঠিটির নকল দেওয়া হয়নি।

আমেদাবাদের প্লীডার কালিদাস জাসকরণ জাভেরি জেলা জজ সাহেব মিঃ কেনেডির চিঠির একটি নকল গান্ধীজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কালিদাস জাভেরি নিজেই আদালতের কাছে স্বীকার করেছিলেন তিনিই মিঃ কেনেডির চিঠির নকল দিয়েছিলেন গান্ধীজীকে। হাইকোর্ট কালিদাস জাভেরির এই ধরনের কাজের সমালোচনা করে তাঁকে সতর্কিত করে আদেশ দিয়েছিলেন ১৯১৯ সালের ১০ই নভেম্বর। অবশ্য হাইকোর্ট কালিদাস জাভেরিকে প্রশংসাও করেছিলেন তাঁর সত্য স্বীকারের সৎ সাহসের জন্য।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই সময় ছিলেন 'ইয়ং ইন্ডিয়া' সংবাদপত্রের সম্পাদক। মহাদেব হরিভাই দেশাই ছিলেন 'ইয়ং ইন্ডিয়ার' প্রকাশক। 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' ১৯১৯ সালের ৬ই আগস্ট মিঃ কেনেডির লেখা ২২শে এপ্রিলের চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল। কেবলমাত্র জেলা জজ সাহেবের চিঠিটি প্রকাশ করেই গান্ধীজী থেমে থাকেননি। চিঠিটির সমালোচনা করে মন্তব্যও প্রকাশ করা হয়েছিল 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়'। চিঠিটিকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে বিষয়টি বোম্বে হাইকোর্টে বিচারাধীন ছিল সেই সময়। সমালোচনা ও মন্তব্য সহ চিঠিটি 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' প্রকাশ করায় গান্ধীজী এবং মহাদেব হরিভাই দেশাইকে আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হয়েছিল।

গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে মিঃ কেনেডির লেখা ব্যক্তিগত চিঠিটি (যে চিঠিটিকে কেন্দ্র করে কতিপয় আইনজীবীর বিরুদ্ধে প্রোসিডিং করা হয়েছে) সেই বিষয়টির বিচারধীন অবস্থায় মন্তব্য ও সমালোচনা সহ 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়'

৬ই আগস্ট প্রকাশ করে আদালত অবমাননা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, আইনজীবীদের বিরুদ্ধে রুজু করা প্রোসিডিংয়ের নিষ্পত্তি হয়েছিল বোম্বে হাইকোর্টে ১৯১৯ সালের ১৫ই অক্টোবর। প্রোসিডিংয়ে মূল প্রশ্ন ছিল পেশায় রত আইনজীবীরা রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গীকার পত্রে সই করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করতে পারেন কিনা?

আদালত অবমাননা মামলায় বিভিন্ন নথিপত্র থেকে দেখা গেল, আমেদাবাদের জেলা জজের অফিস মিঃ কেনেডির লেখা ২২শে এপ্রিলের চিঠির নকল দিয়েছিল কালিদাস জাসকরণ জাভেরিকে। কালিদাস জাভেরি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা 'ইয়ং ইন্ডিয়ার' সম্পাদক গান্ধীজীকে দিয়েছিলেন চিঠিটির নকল।

'ইয়ং ইন্ডিয়ার' প্রথম পাতায় নিবন্ধটির শিরোনামা ছিল—'O' Dwyerism in Ahmedabad', শিরোনামার তলায় মিঃ কেনেডির চিঠিটি মন্তব্য ও সমালোচনা-সহ ছেপে দেওয়া হয়েছিল ৬ই এপ্রিল, ১৯১৯।

হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারার গান্ধীজী ও হরিভাই দেশাইকে চিঠিটি প্রকাশ করার কারণ দর্শাতে বললেন ১৮ই অক্টোবর, ১৯১৯। বিষয়টি নিয়ে গান্ধীজী এবং হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারারের মধ্যে একাধিক চিঠি চালাচালি হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর ২২শে অক্টোবরের চিঠিতে হাইকোর্টকে বলেছিলেন—

"In my humble opinion, I was within the rights of a Journalist in publishing the letter in question and making comments thereon, I believed the letter to be a great public importance and one that called for public criticism."

গান্ধীজীর ২২শে এপ্রিলের চিঠির উত্তরে হাইকোর্ট থেকে ৩১শে অক্টোবর তাঁকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল মিঃ কেনেডির চিঠিটি প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর উত্তর মোটেই সন্তোষজনক নয়। তবুও প্রধান বিচারপতি মনে করছেন গান্ধীজীর উচিত 'ইয়ং ইন্ডিয়ার' মাধ্যমে চিঠিটি প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। কারণ সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিচারাধীন বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য সহ চিঠিটি প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি সাংবাদিকের দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন।

গান্ধীজী ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করায় বোম্বে হাইকোর্ট গান্ধীজী ও হরিভাই দেশাইয়ের বিরুদ্ধে একটি রুল ইস্যু করেছিলেন। রুলের উত্তরে ১৯২০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী লিখিতভাবে বলেছিলেন—

With reference to the rule nisi issued against me, I beg to state as follows :—

Before the issue of the rule certain correspondence passed between the Registrarar of the Honourable Court and myself the 11th December I addressed to the Registrarar letter which sufficiently explains my conduct. I, therefore, attach a copy of the same letter. I regret, that I have not found it possible to accept the advise given by His Lordship the Chief Justice. Moreover, I have been unable to accept the advise because I do not consider that I have committed either a legal or a moral breach by publishing Mr. Kennedy's letter of by commenting on the content's thereof. I am sure that

this Honourable court would not want me to tender an apology unless it be sincere and express regret for an action which I have held to be the privilege and duty of a Journalist. I shall, therefore, cheerfully and respectfully accept the punishment that this Honourable Court may be pleased to impose upon me for the vindication of the majesty of law.

I wish to say, with reference to the notice served on Mr. Mahadeb Desai, the Publisher, that he published it simply upon my request and advise."

মহাদেব হরিভাই দেশাই তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেছিলেন—

"With reference to rule nisi served upon me, I beg to state that I have read the statements made by the Editor of "Young India" and associate myself, with the reasoning adopted by him in justification of his action. I shall, therefore, cheerfully and respectfully abide by any penalty this Honourable Court may be pleased to inflict on me."

শুনানির সময় হাইকোর্টে গান্ধীজী এবং মহাদেব হরিভাই দেশাই দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী হাইকোর্টকে বলেছিলেন, তাঁর দাখিল করা লিখিত বক্তব্যের বাইরে তাঁর পক্ষে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে ভাল মনে করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, সেই সিদ্ধান্ত তিনি মাথা পেতে নেবেন। মহাদেব হরিভাই দেশাইও বলেছিলেন, গান্ধীজীর বক্তব্যের সাথে তিনিও একমত। সুতরাং মাননীয় বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর মতই তিনিও মেনে নিতে প্রস্তুত।

হাইকোর্ট গান্ধীজীর বক্তব্য শোনার পর বিভিন্ন মামলার নজির টেনে বললেন, বিচারাধীন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মিঃ কেনেডির লেখা চিঠি মন্তব্য সহ ইয়ং ইন্ডিয়ায় প্রকাশ করে গান্ধীজী এবং মহাদেব হরিভাই দেশাই দুজনেই আদালত অবমাননা করেছেন।

হাইকোর্ট এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর লেখা ১১ই ডিসেম্বরের চিঠিটি উল্লেখ করে বলেছিলেন—

In his letter of the 11th December, 1919 the respondent Gandhi contends that in publishing and commenting on the letter he "performed a useful public duty at a time when there was great tension and when even the Judiciary was being affected by the popular prejudice."

Comonsense would answer that if the tension and popular prejudice existed it would be increased rather than diminished by abuse of the local judge and that could not be the public duty of any good citizen.

হাইকোর্ট চিঠিটির সংবাদপত্রে প্রকাশ, চিঠিটি নিয়ে সমালোচনা ও মন্তব্য, গান্ধীজীর বক্তব্য ও মনোভাব, দেশের পরিস্থিতি ও অপরাধের গুরুত্ব বিচার-বিবেচনা করে বললেন, অনায়াসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালতের উচিত বেশ বড় রকমের জরিমানার আদেশ দেওয়া। কিন্তু আদালত নানাদিক বিবেচনা করে জরিমানার বদলে গান্ধীজী ও মহাদেব হরিভাই দেশাইকে তাঁদের অন্যায় কাজের জন্য তাঁদের দুজনকেই ভর্ৎসনা ও নিন্দা করছেন। হাইকোর্ট আরো বললেন, উভয় অভিযুক্তকেই সতর্কিত করে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে তাঁরা যেন বিচারাধীন বিষয় নিয়ে এইভাবে সংবাদ পরিবেশন না করেন।

৩ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চের কাছে মামলাটির শুনানী হয়েছিল।

এই ৩ জন বিচারপতির মধ্যে ছিলেন মার্টেন, হেওয়ার্ড এবং কাজীজী। বোম্বে হাইকোর্ট মামলার রায় দান করেছিলেন ২০ সালের ১২ই মার্চ।

রায়ের আদেশে বলা হয়েছিল—

The order of the court will, therefore, be : "The court finds the charge proved, it severely reprimands the respondents and cautions them both as their future conduct."

নির্ভীক গান্ধীজী মামলার পরিণাম জেনেও আদালতের কাছে প্রার্থনা করে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেননি। তিনি ইয়ং ইন্ডিয়ার প্রকাশক মহাদেব হরিভাই দেশাইয়ের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে।

হাইকোর্টের কাছে গান্ধীজীর লিখিত বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠে তাঁর তেজস্বিতা, আত্মবিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি অবিচলতা। শুধু জাতির জনক হিসেবেই নয়, সাংবাদিক হিসেবেও গান্ধীজী ছিলেন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক ভীতিজনক ব্যক্তিত্ব।

আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলা

১৯১৫ সালের ৩০শে মার্চ কলকাতাব চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বডা কোম্পানী (Rodda & Co) থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চুরির ষডযন্ত্র মামলার রায় দান করেছিলেন। দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ৭ জন অভিযুক্ত আসামীর মধ্যে ৪ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২০ (বি) এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারায়। দণ্ডিত ৪ জনেব প্রত্যেককে দেওযা হয়েছিল ২ বছব সশ্রম কারাদণ্ড। দণ্ডিত আসামী ৪ জন ছিলেন কালিদাস বোস, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভুজঙ্গভূষণ ধর এবং হরিদাস দত্ত। অপর ৩ জন অভিযুক্ত আসামী ছিলেন অনুকুলচন্দ্র মুখার্জী, গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং আশুতোষ রায়। এই ৩ জনকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল মামলাটি থেকে।

দণ্ডিত আসামী ৪ জনই চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাযের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। দণ্ডিত আসামীবা সবাই ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। কলকাতা হাইকোর্টে আপিলকারীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত আইনজীবীরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন এস. আর. দাস, দাশরথী সান্যাল, বিপিনচন্দ্র মল্লিক, জে. চৌধুরী, এস. আর. ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ শেঠ, মিঃ বাগরাম, অতুল্যচরণ বোস, শান্তিময় মজুমদার এবং সন্তোষকুমার বোস। সরকার পক্ষে ছিলেন তদানীন্তন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ পি এল. বাকল্যান্ড। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন নীরদচন্দ্র চ্যাটার্জী।

আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলাটিতে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, পূর্বদয়াল মারোয়াড়ী এবং উপেন্দ্রনাথ সেনকেও অভিযুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। ১৯১৪ সালের ১২ই নভেম্বর সরকারপক্ষের প্রার্থনা অনুযায়ী বিচারাধীন মামলাটি থেকে এই ৩ জন অভিযুক্ত আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সরকার পক্ষের অভিযোগ থেকে দেখা যায় কালিদাস বোস, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আশুতোষ রায় এবং আরো অনেকে ১৯১৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে আগস্টের মধ্যে কলকাতার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চুরির ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সরকার পক্ষের অভিযোগে আরো বলা হয়েছিল, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেশ গাঙ্গুলী, গণেশচন্দ্র বোস সহ আরো অনেকে। ষড়যন্ত্রে নেওয়া কর্মসূচী অনুযায়ী বিপ্লবীরা ৫০টি পিস্তল এবং ৪৬,০০০ পিস্তলের গুলি রডা কোম্পানীর মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ড থেকে চুরি করেছিলেন ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট। শ্রীশচন্দ্র মিত্র ছিলেন রডা কোম্পানীর কর্মচারী। শ্রীশচন্দ্র মিত্র, ২৬শে আগস্ট বিকেলের দিকে কোম্পানীর নির্দেশ মত মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ডে জমা দিয়েছিলেন

পিস্তল ও গুলি ভর্তি ১০টি কাঠের বাক্স। কিন্তু ২৭শে এবং ২৮শে আগস্ট শ্রীশচন্দ্র মিত্র রডা কোম্পানীর আয়রন ইয়ার্ডে গরহাজির ছিলেন। এই দুদিন পর পর কাজে না আসায় ২৮শে আগস্ট কোম্পানী থেকে মিঃ প্রাইককে পাঠানো হয়েছিল শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর অফিসে না আসার কারণ জানতে। কিন্তু শ্রীশচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে পাওয়া গেল না। শ্রীশচন্দ্র অফিসে গরহাজির থাকায় ২৯শে আগস্ট অপর একজন কর্মচারীকে কোম্পানী থেকে পাঠানো হল আয়রন ইয়ার্ড থেকে মাল ছাড়াতে। এই সময় অর্থাৎ ২৯শে আগস্ট প্রথম জানা গেল শ্রীশচন্দ্রের ২৬শে আগস্ট জমা দেওয়া ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি কাঠের বাক্সই আয়রন ইয়ার্ড থেকে চুরি গিয়েছে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ চুরির ব্যাপারটি জানতে পেরেই পুলিশকে খবর দিলেন। পুলিশ চুরির খবর পেয়েই দ্রুততার সাথে অস্ত্র চুরির কিনারা করতে লেগে পড়ল। ২৭শে আগস্ট থেকে শ্রীশচন্দ্রের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। গুপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে সন্দেহজনক কিছু তত্ত্ব হাতে আসায় কালিদাস বোস এবং নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করা হল ৩০শে আগস্ট। এরপর ১লা সেপ্টেম্বর ভূজঙ্গভূষণ ধর গ্রেপ্তার হলেন তাঁর বাড়ী থেকে। গ্রেপ্তার করার সময় ভূজঙ্গকে শনাক্ত করেছিল ঘোড়ার গাড়ীর দুই কোচ্‌ম্যান নূর মহম্মদ এবং সেখ আব্দুল। হরিদাস দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১২ই অক্টোবর। আগ্নেয়াস্ত্র ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তে কলকাতা পুলিশের সব গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

মামলার নথি থেকে প্রকাশ, কালিদাস বোস থাকতেন ৭নং হালদার লেনে। তিনি ১৯১২ সালে নিঃস্ব হিতৈষিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথেরও যোগাযোগ ছিল এই নিঃস্ব হিতৈষিনী সভার সাথে। শ্রীশচন্দ্র এবং আরো অনেক যুবক এই সভার জন্য চাল-ডাল সংগ্রহ করতেন গরীব-দুঃখীকে খাওয়াবার জন্য। সভার সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ না থাকলেও পরোক্ষভাবে কালিদাস বোস যুক্ত ছিলেন বিপ্লবী কাজকর্মের সাথে। কালিদাস বোসকে গ্রেপ্তারের পর প্রথম অবস্থায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি শ্রীশচন্দ্রের সাথে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের কথা অস্বীকার করেছিলেন। পরে অবশ্য কালিদাস বোস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র তাঁর পূর্বপরিচিত ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীশচন্দ্র মিত্র ছিলেন সরকার পক্ষের ৪২নং সাক্ষী। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, কালিদাস ও অনুকূলের সাথে ২৩নং মদন বড়াল লেনের কুস্তির আখড়ায় একসঙ্গে তাঁরা মিলিত হতেন। ৪/৩, মলঙ্গা লেনে থাকতেন গিরীন্দ্র এবং নরেন্দ্র। মলঙ্গা লেনের এই বাড়ীতে ছিল হিন্দু মহল ডিবেটিং ইউনিয়ন। কালিদাস হিন্দু মহল ডিবেটিং ইউনিয়নে প্রায়ই আসতেন। এ ছাড়াও কালিদাসকে এপ্রিল ও মে মাসে দেখা গিয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। তাঁর সঙ্গে ছিল গিরীন্দ্র, অনুকূল, খগেন্দ্র, শ্রীশ পাল এবং অন্যান্য কয়েকজন। এ ছাড়াও কালিদাসের সাথে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে কিরণচন্দ্র সেন, শ্রীশচন্দ্র মিত্র, শৈলেন্দ্র সিংহকে। ১৭ই মে কালিদাস বোসের ৭নং হালদার লেনের বাড়ীতে পুলিশি তল্লাসী হ'ল। কালিদাসের বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল মিচেলের লেখা ১ কপি "অ্যানার্কি অ্যান্ড অ্যানারকিস্ট" (*Anarchy and Anarchists* by Michael)। বইটির বিশেষ বিশেষ অংশ বেগুনি রংয়ের পেন্সিলে দাগ কাটা ছিল। এ ছাড়াও কালিদাসের ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছিল বেশ কয়েকখানি 'কর্মযোগিন' এবং 'দেশের কথা'। আরো পাওয়া গিয়েছিল বাল গঙ্গাধর তিলকের মামলার নথিপত্রের নকল। আলফ্রেড নোবেলের লেখা ১ খানি বইও পাওয়া গিয়েছিল কালিদাসের ঘর থেকে। বইটির নাম ছিল—'হাই এক্সপ্লোসিভ্‌স্' (High Explosives)। পাওয়া গিয়েছিল সন্দেহনজক চিঠিপত্র। এই চিঠিগুলি থেকে বোঝা গিয়েছিল নরেন্দ্র ও গিরীন্দ্রর সাথে কালিদাসের পত্রালাপ ছিল।

মামলার এইসব আলামত (তল্লাসীতে পাওয়া দ্রব্যাদি) থেকে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্রের সাথে এইসব আলামতের কোন সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট বললেন, কালিদাসের বাড়ী থেকে পাওয়া নথিপত্রের উপর আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। কারণ আগ্নেয়াস্ত্র চুরির সাথে প্রত্যক্ষভাবে এইসব নথিপত্রের কোন সংস্রব নেই।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন গিরীন্দ্রনাথের সম্পর্কে ভাই। দু-জনই থাকতেন ৪/৩, মলঙ্গা লেনে। কালিদাসের যাতায়াত ছিল ৪/৩, মলঙ্গা লেনের বাড়ীটিতে। ১৭ই মে পুলিশ তল্লাসী করতে গিয়েছিলেন ৪/৩, মলঙ্গা লেনের বাড়ীটিতে। পুলিশ আসতে দেখে গিরীন্দ্রনাথ খোলা জানালা দিয়ে লিফ্‌লেটের একটি প্যাকেট চটজলদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নীচে। উদ্দেশ্য ছিল কোনভাবেই যেন লিফ্‌লেটের প্যাকেটটি পুলিশের হাতে না পড়ে। বিধি বাম। ছুঁড়ে ফেলা লিফ্‌লেটের প্যাকেটটি পড়ল একজন পুলিশ কনস্টেবলের মাথায়। কনস্টেবলটি সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটি লুফে নেয়। এর পর লুফে নেওয়া প্যাকেটটি মিঃ টেগার্টের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। প্যাকেটটি খুলে দেখা গেল যুগান্তর লিফ্‌লেট সহ বহু লিফ্‌লেটস ছিল প্যাকেটটির মধ্যে। লিফ্‌লেটস্‌গুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান। দেশের যুবশক্তির প্রতি ডাক ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের শামিল হওয়ার জন্য। ৪/৩, মলঙ্গা লেনের বাড়িটি থেকে পুলিশ তল্লাসীতে অন্য কোন সন্দেহজনক জিনিসপত্র পাওয়া গেল না। অনুসন্ধানে বোঝা গেল, সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট করার অভিপ্রায়ে গিরীন্দ্রনাথ লিফ্‌লেটের প্যাকেটটি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। এই ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথকে যুক্ত করার মত কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ভুজঙ্গভূষণ ধর ছিলেন কালিদাস বোসের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কালিদাস ভুজঙ্গর ৩নং জেলিয়াপাড়ার বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। ব্রিটিশ প্রশাসনের ইতিপূর্বে অনেকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকলেও ভুজঙ্গর উপর সামান্য সন্দেহ পর্যন্ত করা হয়নি। এমনকি ১৯১৪ সালের মে মাসে বর্তমান মামলাটির অনুসন্ধান কালে ভুজঙ্গর জেলিয়াপাড়ার বাড়ীতে পর্যন্ত কোন তল্লাসী করা হয়নি।

মামলার নথি থেকে দেখা গেল, ১৯১৪ সালের ১৭ই মে থেকে ২৬শে মে পর্যন্ত নরেন্দ্র, গিরীন্দ্র বা ভুজঙ্গ এই ৩ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোন সন্দেহজনক খবর পর্যন্ত ছিল না। ৪/৩ নং মলঙ্গা লেনের বাড়ি এবং ৩নং জেলিয়াপাড়া লেনের বাড়ি মে মাসে পুলিশি তল্লাসীর পর থেকে এই ৩ জনের উপর পুলিশের নজরদারি পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই এর পর থেকে নরেন্দ্র, গিরীন্দ্র বা ভুজঙ্গর গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

এর পর আপিল শুনানীর সময় হাইকোর্ট ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্টের ঘটনায় এলেন। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা গেল, শ্রীশচন্দ্র মিত্র (রডা কোম্পানীর কর্মচারী) এই দিন রডা কোম্পানীর আয়রন ইয়ার্ডে আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি ১০টি কাঠের বাক্স এনে জমা দিয়েছিলেন। ১০টি কাঠের বাক্সের মধ্যে ১টিতে ছিল ৫০টি পিস্তল এবং বাকি ৯টি বাক্সে ছিল পিস্তলির গুলি ভর্তি। বাক্সগুলি মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ডে জমা দেওয়ার সময় শ্রীশচন্দ্রের সাথে আরো ২/৩ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আয়রন ইয়ার্ডে বাক্সগুলি জমা করার পর কয়েকজন কুলির সাথে শ্রীশচন্দ্রকে কথাবার্তা বলতে দেখা গিয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র আয়রন ইয়ার্ড থেকে

চলে যাওয়ার সময় কুলিদের বলে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি বাক্সগুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। শ্রীশচন্দ্র আয়রন ইয়ার্ড ছেড়ে যাওয়ার সময় সেখানে ছিল রঘু মহারানা এবং ঈশ্বর বিশাল নামে দুজন কুলি। রঘু কোন বিশেষ প্রয়োজনে এই সময় ঈশ্বরকে পাঠিয়ে ছিল রামপদ মুখার্জীর কাছে। ঈশ্বরকে রামপদের কাছে পাঠানোর পরেই হঠাৎ প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। ঈশ্বর বিশাল প্রচন্ড বৃষ্টির জন্য রামপদকে নিয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আয়রন ইয়ার্ডে ফিরতে পারেনি। বৃষ্টির জন্য রঘুও এই সময় কিছু দূরে একটি শেডের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই আয়রন ইয়ার্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কুলিরা অনুপস্থিত থাকায় কেউ জানতে পারল না কারা আয়রন ইয়ার্ড থেকে পিস্তল ও গুলি ভর্তি বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলেছিল। কারো পক্ষে জানাও সম্ভব হয়নি কোথায় বাক্সগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পরে সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা গেল, এই ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে কুলিদের অনুপস্থিতিতে ঘোড়ার গাড়িতে করে কাঠের বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। জানা গেল, একজন বাবু বউবাজার এবং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ডে এসে ২টি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ডে এসেছিলেন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে। পরে অবশ্য ঘোড়ার গাড়ীর কোচ্ম্যানরা নরেন্দ্রনাথকে নির্দিষ্ট বাবুটি বলে শনাক্ত করেছিল। ঘোড়ার গাড়ির কোচ্ম্যান দুজন ছিল নূর মহাম্মদ ও সেখ আব্দুল। নির্দিষ্ট বাবুটি (নরেন্দ্রনাথ) ঘোড়ার গাড়ি দুটি নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছিলেন ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে—যেখান থেকে মলঙ্গা লেন শুরু হয়েছিল। সেখ আব্দুলকে গাড়ি দুটির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে নূর মহাম্মদকে নিয়ে বাবুটি আয়রন ইয়ার্ডের উত্তর দিকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর পর বাবুটি ২/৩ জন ওড়িয়া কুলির সাহায্যে বাক্সগুলি আয়রন ইয়ার্ড থেকে বার করে এনে ঘোড়ার গাড়ি দুটিতে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিল ঘোড়ার গাড়ির দুই কোচম্যান সেখ আব্দুল ও নূর মহাম্মদ।

নূর মহাম্মদ তার সাক্ষ্যতে বলেছিল তার গাড়িতে তোলা কাঠের বাক্সটির আকৃতি ছিল দৈর্ঘ্যে অনুমান ৪ ফুট, প্রস্থে এবং উচ্চতায় ১ ফুটের মত। বাক্সটির আকৃতি থেকে আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এই বড় আকৃতির বাক্সটির মধ্যে ছিল ৫০টি পিস্তল। বাক্সটি গাড়ীর মাথায় তুলে দেওয়ার পর ছোকরা বাবুটি গাড়ির ভিতর উঠে বসেছিলেন। ছোকরা বাবুটিকে পরে শনাক্তকরণ প্যারেডে নরেন্দ্র বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। ছোকরা বাবুটির নির্দেশ মত নূর মহাম্মদ তার গাড়িটি চালিয়ে এনে জেলিয়াপাড়া লেনের মাথায় এসে দাঁড় করিয়েছিল। জেলিয়াপাড়া লেনের মাথায় ঘোড়ার গাড়িটিকে দাঁড় করাবার পর ছোকরা বাবুটি গাড়ি থেকে নেমে জেলিয়াপাড়া লেনের একটি বাড়িতে ঢুকেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গে করে ২ জন বাবুকে নিয়ে ছোকরা বাবুটি নূর মহাম্মদের গাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে কাঠের বাক্সটি নামিয়ে জেলিয়াপাড়া লেনের ভিতর বাক্সটি নিয়ে ঢুকে গিয়েছিলেন। নূর মহাম্মদের সাক্ষ্য থেকে আরো জানা গেল ২ জন কুলির মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বড় আকৃতির কাঠের বাক্সটিকে। ছোকরা বাবুটির সঙ্গে আসা বাবু দুজনের মধ্যে একজনকে পরে ভুজঙ্গ বলে শনাক্ত করা হয়েছিল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভুজঙ্গভূষণ ধর থাকতেন ৩নং জেলিয়াপাড়া লেনে। নূর মহাম্মদ তাঁর সাক্ষ্যে আরো বলেছিল কুলির মাথায় কাঠের বাক্সটি চাপিয়ে বাবু তিনজন মোড় থেকে জেলিয়াপাড়া লেনের চতুর্থ বাড়িটিতে মালসহ ঢুকেছিলেন। এই বাড়ীটিই ছিল ৩নং জেলিয়াপাড়া লেন। এর পর অপর একজন বাবু জেলিয়াপাড়া লেনের

ভিতর থেকে বেরিয়ে নুর মহাম্মদের ঘোড়ার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবুটি গাড়ীর সামনে এসে তাঁর পরনের ধুতির ট্যাক থেকে ৬/৭টি টাকা বার করে ১টি টাকা অপর একজন লোককে ভাঙিয়ে আনতে দিয়েছিলেন। টাকাটা খুচরো করে আনার পর বাবুটি তাকে আট আনা দিয়ে তার ভাড়া মিটিয়েছিলেন। ভাড়া পাওয়ার পর নুর মহাম্মদ তার নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিল। যে বাবুটি তাকে ভাড়ার পয়সা মিটিয়েছিলেন, তাঁর গায়ে কোন জামা ছিল না। বাবুটি ছিলেন খালি গায়ে।

সেখ আব্দুলের সাক্ষ্য থেকে জানা গেল তার ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হয়েছিল ৩টি ছোট আকৃতির কাঠের বাক্স। যখন আব্দুল তার গাড়ি নিয়ে হৃদয় ব্যানার্জী লেন দিয়ে পঞ্চানন তলার দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় সে নুর মহাম্মদকে জেলিয়াপাড়ার দিক থেকে গাড়ী নিয়ে ফিরতে দেখেছিল। আব্দুলের গাড়ি জেলিয়াপাড়ার মাথায় এসে থামলে বাক্স ৩টি কুলিদের সাহায্যে নামিয়ে নিয়েছিলেন ২/৩ জন বাবু। সেখ আব্দুলের সাক্ষ্য থেকে দেখা গেল অপর একটি ঘোড়ার গাড়িও ভাড়া করা হয়েছিল মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ড থেকে মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য। তৃতীয় গাড়িটিকেও ভাড়া করা হয়েছিল একই কারণে বলে সেখ আব্দুলের ধারণা হয়েছিল।

নথিপত্র থেকে আরো দেখা গেল সেইদিনই রাত অনুমান ৯টার সময় ১টি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল ১/১, অভয় হালদার লেনে। এই গাড়ীটির কোচম্যান ছিল সেখ আব্দুল বারি। ৩/৪ জন বাবুর উপস্থিতিতে কয়েকটি কাঠের বাক্স তোলা হয়েছিল আব্দুল বারির ঘোড়ার গাড়িতে। এরপর কোচম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল টালার দিকে যেতে। টালা ব্রীজ পেরুবার পর কোন এক জায়গায় আব্দুল বারির গাড়ি থামিয়ে বাক্সগুলি নামিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বাক্সগুলি নামিয়ে নেওয়ার পর ভাড়ার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আব্দুল বারিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবুরা। তদন্তকালে সেখ আব্দুল বারি অবশ্য সেদিনের বাবুদের মধ্যে কাউকেই শনাক্ত করতে পারেনি।

রডা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র চুরির খবরটি জানতে পেরেছিলেন ২৯শে আগস্ট। জানার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনই পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র চুরির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশন বার করে তাতে বলা হয়েছিল রডা কোম্পানীর কাস্টম ক্লার্ক চুরির পর থেকে বে-হদিশ। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চুরির পর থেকে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন। গুপ্ত সূত্র ধরে ৩০শে আগস্ট গ্রেপ্তার করা হ'ল কালিদাস ও নরেন্দ্রকে। কলকাতার প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল পুলিশের হেড কোয়াটারস্ থেকে তাঁরা যেন তাঁদের এলাকাধীন প্রতিটি সন্দেহজনক স্থানে এবং সমস্ত গাড়ির স্ট্যান্ডে নজর রাখার জন্য হেড় কনস্টেবলদের নিযুক্ত করে। পুলিশের নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল, যিনি এই আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা ঘোড়ার গাড়ীর হদিস দিতে পারবেন তাঁকে প্রতিটি গাড়ীর জন্য ১০০ টাকা ইনাম (পুরস্কার) দেওয়া হবে। এই নির্দেশনামা থেকে অনুমান করা যায়, যেভাবেই হোক্ পুলিশ হেড কোয়াটার্সে খবর পৌছেছিল ঘোড়ার গাড়ী করে আয়রন ইয়ার্ড থেকে মাল সরানো হয়েছে। মহাদেও সিং ছিল্ক কলুটোলা থানার কনস্টেবল। সম্ভবত ৩১শে আগস্ট মহাদেও সিং খোঁজ করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ৬০ নং ইডেন হসপিটাল রোডের গুমটিতে। এই গুমটিতে মহাম্মদ ইসমাইল তার গাড়ীগুলি রাখত। মহাম্মদ ইসমাইল ছিল একাধিক ঘোড়ার গাড়ীর মালিক। মহাম্মদ ইসমাইলের সাথে কনস্টেবল মহাদেও সিংয়ের দেখা হলেও গাড়ীর কোচম্যানদের সেই সময় পাওয়া গেল না। অন্যান্য কোচম্যানরা মলঙ্গা

লেন থেকে কাঠের বাক্স বহন করার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না। অন্যদিকে কলুটোলা থানার হেড কনস্টেবল আব্দুল শোভান ইডেন হসপিটাল রোডের ঘোড়ার গাড়ীর স্ট্যান্ডে আগেই খবর দিয়ে রেখেছিল কেউ যদি মলঙ্গা লেন থেকে কোন কাঠের বাক্স ২/৩ দিনের মধ্যে বহন করে থাকে, তবে যেন কলুটোলা থানায় খবর দেয়। তাছাড়া একাধিক কোচম্যানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল এই ব্যাপারে।

হেড কনস্টেবল তার সাক্ষ্যতে বলেছিল তার ধারণা হয়েছিল ঘোড়ার গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রের বাক্স সরানো হয়েছে। আব্দুল শোভান তখন পর্যন্ত জানত না যে এই চুরির ব্যাপারে পুলিশের সদর দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে একটি নির্দেশনামা বার করে থানায় থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩১শে আগস্ট ঘোড়ার গাড়ির মালিক মহাম্মদ ইসমাইল তার গাড়ির কোচম্যান নূর মহাম্মদের কাছে এই ব্যাপারে কিছু খবর জানতে পেরে তাকে নিয়ে কলুটোলা থানায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাত অনুমান ৯টা হবে। গাড়ির কোচম্যান নূর মহাম্মদকে তখন নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ ইনসপেক্টার সেভলিনের কাছে। পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল আগ্নেয়াস্ত্র চুরির ব্যাপারে গাড়ির মালিক এবং কোচম্যানদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরি রহস্য ধরা পড়বে। জিজ্ঞাসাবাদে কোচম্যান নূর মহাম্মদের কাছ থেকে জানা গেল ২৬শে আগস্ট সন্ধ্যাবেলা তার ঘোড়ার গাড়িতে করে মলঙ্গা লেন থেকে ১টি বড় কাঠের বাক্স জেলিয়াপাড়া লেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একটি ছোকরা বাবু গাড়িভাড়া করেছিলেন। নূর মহাম্মদের কাছে আরো জানা গেল অপর ১টি ঘোড়ার গাড়িও ভাড়া করা হয়েছিল একই সঙ্গে। সেই গাড়িটির কোচম্যান ছিল সেখ আব্দুল। ইনস্‌পেক্টার সেভলিনের নির্দেশে তখন সেখ আব্দুলের খোঁজ করা হ'ল। সেখ আব্দুলকে তখন ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ডে পাওয়া গেল না। সে তখন বোধ হয় গিয়েছিল তার গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটতে। ২/৩ ঘণ্টা বাদে সেখ আব্দুল গাড়ী নিয়ে স্ট্যান্ডে ফিরে এলে তাকে নিয়ে আসা হল ইনস্‌পেক্টার সেভলিনের কাছে। সেখ আব্দুলের কাছ থেকে ২৬শে আগস্টের ঘটনার কথা জানার পর ইনস্‌পেক্টার সেভলিন কনস্টেবল আব্দুল শোভানকে নির্দেশ দিলেন কোচম্যান সেখ আব্দুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য। সেখ আব্দুলকে বলা হল ২৬শে আগস্ট মলঙ্গা লেন থেকে তার গাড়ীতে কাঠের বাক্স তোলার পর সে যে সব রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল সেই সব রাস্তা ও গন্তব্যস্থল সে যেন আব্দুল শোভানকে দেখিয়ে দেয়। ইনস্‌পেক্টার সেভলিনের নির্দেশ মত আব্দুল শোভান কোচম্যান সেখ আব্দুল এবং নূর মহাম্মদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নির্দেশ অনুযায়ী সব জায়গা পরখ করার পর কোচম্যানদের নিয়ে আব্দুল শোভান মিঃ সেভলিনের কাছে ফিরে এসেছিল। এইবার মিঃ সেভলিন কোচম্যান দুজনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ অ্যালরিজের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সব ঘটনার কথা জানানো হল মিঃ টেগার্ট এবং মিঃ ম্যাকলিওরকে।

মিঃ টেগার্ট সব ঘটনার কথা জানার পর নিজেই একদল পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবল নিয়ে পরের দিন খুব ভোররাতে অর্থাৎ ১লা সেপ্টেম্বর হানা দিলেন ৩নং জেলিয়াপাড়া লেনের বাড়িটিতে। এই সময় পুলিশের সাথে ছিল ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান দুজন। ৩নং জেলিয়াপাড়ার লেনের বাড়ীটিকে ঘিরে রেখে বাড়ীর সব বাসিন্দাদের ঘুম থেকে তোলা হল। এর পর সবাইকে এক এক করে বাইরে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ভুজঙ্গও পুলিশের নির্দেশ মত অন্যান্য বাসিন্দাদের পিছু পিছু বেরিয়ে আসতেই কোচম্যান দুজন অর্থাৎ সেখ আব্দুল এবং নূর মহাম্মদ শনাক্ত করল ভুজঙ্গকে। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ টেগার্টের নির্দেশে

গ্রেপ্তার করা হল ভুজঙ্গভূষণ ধরকে। এর পর ভুজঙ্গের বাড়ি তল্লাসী করা হ'ল। পুলিশি তল্লাসীতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। ২রা সেপ্টেম্বর মিঃ ম্যাকল্পিওরের কাছে অভিযুক্ত আসামীদের শনাক্ত করার জন্য সেখ আব্দুল ও নূর মহাম্মদকে নিয়ে আসা হ'ল।

মামলার নথি থেকে দেখা যায়, প্রথমবারের শনাক্তকরণ প্যারেডে সেখ আব্দুল কালিদাসকে চিনতে পারেনি। দ্বিতীয়বারের প্যারেডে অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কালিদাসকে শনাক্ত করেছিল সেখ আব্দুল। প্রথমবার কালিদাসকে চিনতে না পারার কারণ হিসেবে সেখ আব্দুল তার সাক্ষ্যে আদালতকে বলেছিল ঘটনার দিন কালিদাসকে সে দেখেছিল খালি গায়ে। কিন্তু প্রথমবার শনাক্তকরণ প্যারেডে কালিদাসের গায়ে ছিল জামা, তাই তার পক্ষে প্রথমবার কালিদাসকে চেনানো সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়বারের প্যারেডে কালিদাস খালিগায়ে লাইনে দাঁড়াতেই সে চিনতে পারে কালিদাসকে। খালিগায়ে থাকা কালিদাসকে চেনা তার পক্ষে কোন অসুবিধা হয়নি। অভিযুক্ত আসামীদের শনাক্তকরণের পদ্ধতি সঠিক হয়নি বলে হাইকোর্টে সওয়াল করা হয়েছিল আসামীদের পক্ষ থেকে।

এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট বলেছিলেন, নথি থেকে দেখা যাচ্ছে নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ থেকে শনাক্তকরণ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করা হয়নি। একবারও বলা হয়নি মিঃ ম্যাকলিওরের কাছে ২রা সেপ্টেম্বর যে শনাক্তকরণ প্যারেড করা হয়েছিল তাতে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। সেখ আব্দুল মিঃ ম্যাকলিওরের কাছে প্রথমবার কালিদাসকে শনাক্ত করতে না পারলেও নূর মহাম্মদ কিন্তু শনাক্ত করতে পেরেছিল কালিদাস এবং ভুজঙ্গকে। সুতরাং প্রথমবারের শনাক্তকরণ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কোচম্যান দুজন ছাড়া মামলার অপর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন চুনীলাল দে। ঘটনার সময় চুনীলাল দে থাকতেন হিদারাম ব্যানার্জী লেন এবং জেলিয়াপাড়া লেনের সংযোগস্থলের কাছের একটি বাড়িতে। চুনীলাল তাঁর সাক্ষ্যতে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বলেছিলেন, তিনি ভুজঙ্গকে আগে থেকেই চিনতেন। ভুজঙ্গ ৩নং জেলিয়াপাড়া লেনের বাসিন্দা তাও তাঁর জানা ছিল। কালিদাসকে তিনি বহুবার ভুজঙ্গের বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছেন। চুনীলাল চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, ২৬শে আগস্ট সন্ধ্যার পর তিনি যখন নিজের ঘরে বসে লেখা-পড়া করছিলেন, সেই সময় জানালা দিয়ে দেখেছিলেন ৩নং জেলিয়াপাড়া লেনের সামনে দাঁড় করানো অবস্থায় দুটি ঘোড়ার গাড়িকে। গাড়ি দুটি থেকে কয়েকটি কাঠের বাক্স নামিয়ে ভুজঙ্গের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া গাড়ি দুটির একটি থেকে নামতে দেখেছিলেন ভুজঙ্গকে। অপর গাড়িটি থেকে নেমেছিলেন কালিদাস। নিম্ন আদালতে জেলিয়াপাড়া লেনের এবং হিদারাম ব্যানার্জী লেনের নক্শা পেশ করা হয়েছিল। নক্শা থেকে নিম্ন আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন চুনীলালের ঘরের জানালা দিয়ে ৩নং জেলিয়াপাড়া লেনের বাড়ীর গেট বা সম্মুখের রাস্তার অংশ দেখা যায় না। সুতরাং চুনীলালের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট চুনীলালের সাক্ষ্যর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। হাইকোর্টও আপিলে চুনীলালের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করলেন না। বরং চুনীলালের সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের যুক্তি মেনে নিলেন। চুনীলাল তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, একই সময় দুটি ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল জেলিয়াপাড়া লেনের মুখে। কিন্তু নূর মহাম্মদ তার সাক্ষ্যে অন্যরকম বলেছিল। নূর মহাম্মদ বলেছিল, সে যখন গাড়ি নিয়ে জেলিয়াপাড়া লেনের মুখে এসে থেমেছিল, সেই সময় অপর একটি ঘোড়ার গাড়িকে

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। নূর মহাম্মদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়, দুটি ঘোড়া গাড়ী কখনই একই সঙ্গে এসে জেলিয়াপাড়া লেনের মুখে দাঁড়ায়নি। চুনীলাল তাঁর সাক্ষ্যে সত্যি কথা যে বলেননি তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে আদালতের কোন অসুবিধা হয়নি।

রডা কোম্পানীর মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি ১০টি কাঠের বাক্স যে চুরি হয়েছিল, সে ব্যাপারে অর্থাৎ চুরির ঘটনাটি আসামী পক্ষ থেকেও অস্বীকার করা হয়নি। আসামীপক্ষ থেকে নিম্ন আদালতে এবং হাইকোর্টে বক্তব্য রাখা হয়েছিল—আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র চুরির ব্যাপারে আপিলকারীরা অর্থাৎ কালিদাস বোস, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূজঙ্গভূষণ ধর এবং হরিদাস দত্ত কোনভাবেই জড়িত ছিলেন না। হাইকোর্টের কাছে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল দণ্ডিত আসামীদের মিথ্যা অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। আপিলকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ বহাল থাকা উচিত নয়।

মামলার নথি থেকে দেখা গেল, কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করেছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে।

প্রথমত, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ঘোড়ার গাড়ীর দুজন কোচ্ম্যানের সাক্ষ্য। এই দুজন কোচম্যান ছিলেন সেখ আব্দুল এবং নূর মহাম্মদ।

দ্বিতীয়ত, সাক্ষীদের আসামী শনাক্তকরণকেও বিশ্বাস করেছিলেন চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। আসামীদের শনাক্ত করা নিয়ে আদালতের কোন সন্দেহ ছিল না। কোচম্যান দুজনের সাক্ষ্যকে সমালোচনা করে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল করে বলা হয়েছিল, দুই কোচম্যানের সাক্ষ্যর মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক এবং এই দুই কোচম্যান সেখ আব্দুল এবং নূর মহাম্মদ পুলিশের শেখানো মত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে দণ্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা করে সাজানো মামলাটির অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য। এই দুজনের সাক্ষ্য এবং তাদের আসামীদের টি-আই-প্যারেডে চেনানো কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আসামী পক্ষের সওয়ালের উত্তরে এই ব্যাপারে হাইকোর্ট বললেন, কোচম্যান দুজনের সাক্ষ্যের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান দেখা যায় তা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান বলে মনে করার কোন কারণ নেই। নূর মহাম্মদ এবং সেখ আব্দুল তাদের সাক্ষ্যে মোটামুটিভাবে মূল ঘটনার বিবরণ একই ভাবে দিয়েছে। তাদের দুজনের সাক্ষ্যের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান দেখা যায় তা মূল ঘটনাকে ক্ষুণ্ণ করে না।

হাইকোর্ট বললেন, সেখ আব্দুলের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় ঘটনার দিন অর্থাৎ ২৬শে আগস্ট সন্ধ্যার পর সে তার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল হাড়কাটা গলির মুখে। জায়গাটি ছিল বৌবাজার মোড় থেকে সামান্য দূরে। অন্যদিকে সেই সময় নূর মহাম্মদ তার গাড়ী লাগিয়েছিল কলুটোলা স্ট্যান্ডে। অবশ্য নূর মহাম্মদ আদালতের কাছে বলেছিল, ছোকরা বাবুটি গাড়ি ভাড়া করার সময় সেখ আব্দুলের গাড়ি একই স্ট্যান্ডে তার গাড়ির পিছনে লাগানো ছিল। সেখ আব্দুল সামান্য সময়ের জন্য গিয়েছিল নূর মহাম্মদের আস্তাবলে ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য ঘাস আনতে। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে বললেন, দুই কোচম্যানের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় দুজনের গাড়ি একই জায়গায় ছিল।

আপিলকারীদের পক্ষে এর পর প্রশ্ন তোলা হলো কোচম্যানদের সাথে গাড়ির ভাড়া কত ধার্য করা হয়েছিল সেই বিষয়ে সেখ আব্দুলের কাছ থেকে কিছুই জানা যায়নি। নূর মহাম্মদ অবশ্য তার সাক্ষ্যতে বলেছিল ভাড়া বাবদ সে আট আনা পেয়েছিল। যে বাবুটি

ভাড়া দিয়েছিলেন তাকে পরে কালিদাস বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে হাইকোর্ট বলেছিলেন একই স্ট্যান্ড থেকে যখন দুটি গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল একই নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তখন ভাড়ার হার একই হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভবত সেখ আব্দুলের অবর্তমানে ভাড়ার হার নিয়ে দুটি গাড়ীর জন্যই কথা হয়েছিল নূর মহাম্মদের সাথে।

এর পর আসামীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হলো ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান দুজনকে জোগাড় করেছিল কলুটোলা থানার হেড কনস্টেবল আব্দুল শোভান এবং মহাদেও সিং। এইসব কোচম্যানরা পুলিশের হাতের সাক্ষী। এদের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন আদালতের পক্ষেই উচিত নয়।

সরকারপক্ষের সাক্ষী মহাম্মদ ইসমাইল ছিল ৩/৪টি ঘোড়ার গাড়ির মালিক। ২৬শে আগস্ট সেখ আব্দুল তার একটি গাড়ি চালাচ্ছিল। মহাম্মদ ইসমাইলের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তার ৩/৪টি গাড়ি থাকলেও তার কাছে লাইসেন্স ছিল মাত্র ১টি গাড়ির।

যে লোক একটি গাড়ির লাইসেন্স নিয়ে ৩/৪টি গাড়ি ভাড়া খাটায় তাকেও আদালতের বিশ্বাস করা উচিৎ নয়। এই বক্তব্যের উত্তরে হাইকোর্ট বললেন, কলকাতা শহরে এই ধরনের লাইসেন্সবিহীন বহু ঘোড়ার গাড়ি রাস্তায় ভাড়া খাটছে। যদিও কলকাতা পুলিশ আইনে এই ধরনের লাইসেন্সহীন গাড়ি চালানো অপরাধ। বর্তমান মামলার সাথে এই ব্যাপারটির কোন সম্পর্ক নেই। সাক্ষ্য থেকে পাওয়া গিয়েছিল কোচম্যান সেখ আব্দুল তার ভাইয়ের লাইসেন্সটি নিয়ে ঘোড়ার গাড়িটি চালাচ্ছিল।

এরপর আসামী পক্ষ থেকে হাইকোর্টের কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল গাড়ির কোচম্যান দুজন এবং গাড়ীর মালিক সেখ ইসমাইল স্ব-ইচ্ছায় ৩১শে আগস্ট থানায় আসেনি। পুলিশের চাপে তারা কলুটোলা থানায় আসতে বাধ্য হয়েছিল। হেড কনস্টেবল আব্দুল শোভান ৩১শে আগস্ট রাত অনুমান ৯টার সময় ইডেন হসপিটাল রোডের ঘোড়ার গাড়ীর গুমটি থেকে সেখ আব্দুল, নূর মহাম্মদ এবং সেখ ইসমাইলকে এনে হাজির করেছিল ইনস্পেক্টার সেভলিনের কাছে। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে বললেন, পুলিশের তরফে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও কোচম্যানদের অবিশ্বাস না করে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন।

নূর মহাম্মদ বলেছিলেন, একটি বাবু খালিগায়ে জেলিয়াপাড়া লেন থেকে বেরিয়ে এসে এক টাকার একটি নোট ভাঙিয়ে তাকে আট আনা ভাড়া বাবদ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আসামী পক্ষের থেকে হাইকোর্টের কাছে বলা হয়েছিল ভদ্রপরিবারের কোন যুবক ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া মেটাবার জন্য খালিগায়ে রাস্তায় আসবেন না এবং ট্যাঁক থেকে টাকা বার করবেন না কোচম্যানের সামনে। এই ধরনের গল্প বিশ্বাস করা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, টি-আই-প্যারেডে (শনাক্তকরণ প্যারেডে) কালিদাসকে কোচম্যানরা চিনতে পেরেছিল জামা খুলে খালিগা হওয়ার পর। প্রশ্নের উত্তরে হাইকোর্ট বললেন, কালিদাস ইচ্ছে করেই খালিগায়ে ভাড়া মেটাতে এসেছিলেন। খালিগায়ে এলে ভদ্রলোকের বাড়ির যুবক বলে তাঁকে পরবর্তীকালে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না এই পরিকল্পনা নিয়ে কালিদাস খালিগায়ে কোচম্যানদের ভাড়া মেটাতে এসেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সকলের মনে হবে কোন বাড়ির চাকরকে দিয়ে ভাড়া দিতে পাঠানো হয়েছে।

সাক্ষ্য-সাবুদ সওয়াল জবাব শোনার পর হাইকোর্ট আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলায় সিদ্ধান্তে এসেছিলেন কালিদাস বোস রডা কোম্পানী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চুরির ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছিলেন ডাকবিভাগের একজন কর্মচারী। ২৬শে আগস্ট ঘটনার দিন ছিল তাঁর ছুটির দিন। আসামী পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সেদিন নরেন্দ্রর ছুটি ছিল না। হাইকোর্ট এই ব্যাপারেও কিছু মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, সত্যি যদি নরেন্দ্রর ছুটি নাই থাকে এবং তিনি যদি ঘটনার সময় অফিসে হাজিরই থাকবেন তাহলে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল আসামী পক্ষেরই। আসামী পক্ষ তা প্রমাণ করেননি। সেই অবস্থায় আসামী পক্ষের এই বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। নরেন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

হরিদাস দত্ত ছিলেন পূর্ব বাংলার লোক। কলকাতায় এসে থাকতেন মাঝেমধ্যে। হরিদাস রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন বলে নিজেই স্বীকার করেছিলেন। তিনি ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে থাকতেন ৪৬নং বৈঠকখানা রোডে রজনী দত্তের দোকানে। হরিদাস রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকায় এপ্রিল ও মে মাসে তার উপর পুলিশের নজরদারী ছিল। হরিদাসকে একাধিকবার দেখা গিয়েছে অনুকূলের সাথে। তাকে এ ছাড়াও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সাথে ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং শিয়ালদহ রেলস্টেশনে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। এপ্রিলের শেষদিকে অথবা মে মাসের প্রথমদিকে আলেকজেন্দ্রা মিলে কাজে ঢুকেছিলেন হরিদাস দত্ত। মিলে কাজ নেওয়ার পিছনে তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আলেকজেন্দ্রা মিলে মিঃ ও. বিরেন নামে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। মিঃ বিরেন ছিলেন একজন অত্যাচারী অফিসার। তিনি সব সময় মিলের শ্রমিকের উপর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন। এমন কি বহু শ্রমিককে তিনি মারধর পর্যন্ত করেছিলেন বলে হরিদাস দত্তের কাছে খবর ছিল। হরিদাস দত্ত মিঃ ও. বিরেনের বিরুদ্ধে শ্রমিক অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। এর পর হরিদাস দত্ত আলেকজেন্দ্রা মিলের চাকরিতে ঢুকে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন শ্রমিকদের নিয়ে। হরিদাস দত্ত নাম ভাড়িয়ে মিলের কাজে ঢুকেছিলেন।

১৭ই এপ্রিল ৪৬নং বৈঠকখানা রোডে পুলিশ তল্লাসী চালিয়েছিল। পুলিশি তল্লাসীতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না ৪৬নং বৈঠকখানা রোড থেকে। নথিপত্র থেকে দেখা গেল হরিদাস দত্ত বাংলার ১৩১১ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কিছুদিনের জন্য বসবাস করেছিলেন দুমকায়। দুমকাতে তিনি অন্য নামে পরিচিত ছিলেন। দুমকাতে হরিদাস দত্ত পরিচিত ছিলেন অতুলচন্দ্র নাগ নামে। আসামী পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল শরীর সারাতে তিনি কিছুদিনের জন্য দুমকায় ছিলেন।

সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আসলে পুলিশের নজর থেকে নিজেকে বাঁচাতে হরিদাস দত্ত দুমকায় গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, রডা কোম্পানী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চুরির ষড়যন্ত্রের সাথে হরিদাস দত্তের যোগাযোগের কোন গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। নথিপত্র থেকে আরো জানা গেল ২৭শে সেপ্টেম্বর হরিদাস দত্ত দুমকা থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন। এরপর হরিদাস এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন ৩৪নং সিকদার পাড়া লেনে একটি গোডাউন (গুদাম) ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে। মাসে ৮ টাকা ভাড়ায় ৩৪নং সিকদার পাড়া লেনে একটি গোডাউন (গুদাম) ভাড়াও নিয়েছিলেন হরিদাস দত্ত। বলা হয়েছিল, গোডাউনটিতে রাখা হবে বাসনপত্র। ২৯শে সেপ্টেম্বর ভাড়া করা গুদামে কয়েকটি কাঠের বাক্স এনে রাখা হয়েছিল। তদন্তে এই গুদামে রাখা বাক্সগুলি থেকে পাওয়া গিয়েছিল পিস্তলের গুলি। যদিও রডা কোম্পানীর কর্ণধার মিঃ প্রাইক তাঁর সাক্ষ্যদান কালে পরিষ্কারভাবে বলতে পারেননি, হরিদাসের ভাড়া করা গুদাম থেকে পাওয়া পিস্তলের গুলিভর্তি বাক্সগুলি ২৬শে

আগস্টের চুরি যাওয়া পিস্তলের গুলি ভর্তি বাক্সগুলি একই কি না! পরিষ্কারভাবে বলতে না পারলেও মিঃ প্রাইক বা মিঃ টেগার্টের ধারণা, গুদাম থেকে উদ্ধার করা এই গুলিভর্তি বাক্সগুলি ২৬শে আগস্ট আয়রন ইয়ার্ড থেকে চুরি যাওয়া গুলিরই বাক্স। ২৯শে সেপ্টেম্বর হরিদাস দত্তকে দেখা গিয়েছিল ১৮/২, দত্তপাড়া লেনে উমাপদ চ্যাটার্জীর সাথে। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কাঠের বাক্সগুলি থেকে গুলি বের করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ১১ই অক্টোবর আবার হরিদাস ফিরে এসেছিলেন ৩৪নং সিকদারপাড়া লেনে গুদামে রাখা গুলির বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য। গুদামটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলকে নিয়োগ করা হয়েছিল। হরিদাস সাদা পোশাকের কনস্টেবলের উপস্থিতি বুঝতে পেরে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন। পুলিশও তাঁর পিছনে ছুটে তাঁকে ধরে ফেলেছিল।

হাইকোর্ট সবদিক বিচার বিবেচনা করে হরিদাস দত্তকে নির্দোষ বলে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ছাড়া পেলেন হরিদাস দত্ত হাইকোর্টের আদেশে।

কালিদাস বোস, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং ভুজঙ্গভূষণ ধরের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ বহাল থাকলেও হরিদাস দত্ত মুক্তি পেয়েছিলেন হাইকোর্টের আদেশে ১৯১৫ সালের ৩০শে আগস্ট।

কলকাতা হাইকোর্টে আগ্নেয়াস্ত্র চুরি ষড়যন্ত্র মামলার (আপিলের) শুনানি হয়েছিল একটি ডিভিশন বেঞ্চে। ডিবিশন বেঞ্চটি গঠন করা হয়েছিল জাস্টিস্ চিট্টি ও জাস্টিস্ রিচার্ডসনকে নিয়ে। মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র চুরি নিয়ে দেশময় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

ময়মনসিং ষড়যন্ত্র মামলা

পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাসে ময়মনসিং জেলার যেসব বিপ্লবী যুবক দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের কথা বোধ হয় কোনদিনই ভোলা যাবে না। বিশেষত বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ময়মনসিং জেলার বহু শিক্ষিত যুবক পরাধীন মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে শপথ নিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ময়মনসিং জেলার বিপ্লবীদের গতিবিধির উপর ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি।

ময়মনসিং ষড়যন্ত্র মামলায় একাধিক বিপ্লবী যুবককে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন অভিযোগে। ১৯৩১ সালের বিশেষ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ময়মনসিং ষড়যন্ত্র মামলাটির বিচার চলে ময়মনসিংয়ের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। লোকাল গভর্নমেন্টের নির্দেশনামা বলে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মামলাটি শুনেছিলেন ১৯৩১ সালে।

ময়মনসিং ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ধরণীকান্ত চক্রবর্তী, শৈলজারঞ্জন ভট্টাচার্য, নিখিলভূষণ চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদ্বন্ধু বসু, প্রফুল্লকুমার মজুমদার এবং মণীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মারাত্মক বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা তৈরি করার ষড়যন্ত্র। এ ছাড়াও অভিযোগ ছিল বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার। সরকারপক্ষ থেকে আরো একটি অভিযোগ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল—অভিযুক্তরা জেনেশুনে চুরি যাওয়া একটি রিভলভার নিজেদের হেফাজতে রেখেছিলেন।

মামলার বিবরণ থেকে দেখা যায় পুলিশ গুপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে ১৯৩১ সালের ২২/২৩ তারিখের রাতে বিপ্লবী ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর বাড়ীতে তল্লাসী অভিযান চালিয়েছিল। ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর বাড়িতে প্রবেশ করার আগে তাঁর বাড়িটি ঘিরে পুলিশ বেষ্টনী তৈরি করে নিয়েছিল। পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল কোনভাবেই যেন বাড়ির ভিতর থেকে পুলিশের নজর এড়িয়ে বিপ্লবীরা পালিয়ে যেতে না পারে। বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করার আগে কয়েকজন স্থানীয় সাক্ষী জোগাড় করার চেষ্টা করা হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও যখন কোন স্থানীয় সাক্ষী জোগাড় করা গেল না, তখন পুলিশ অফিসাররা স্থানীয় সাক্ষী ছাড়াই ধরণী চক্রবর্তীর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। ধরণী সহ সাতজন অভিযুক্তকেই পাওয়া গিয়েছিল ধরণীর ময়মনসিংয়ের বাড়িতে। এ ছাড়াও বাড়িটিতে ছিলেন ধরণীর মা এবং তাঁর এক বয়স্কা আত্মীয়া। পুলিশবাহিনী যখন বাইরে থেকে বাড়িটি ঘিরে রেখেছিল, অবস্থা বুঝে ধরণী তাঁর রিভলভারটিকে পরনের কাপড়ের এক অংশ দিয়ে ঢেকে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে ছুটে গিয়েছিলেন বাড়ির পশ্চিম দিকে। পশ্চিমদিকে ছিল একটি পুকুর। কাপড়ে ঢাকা রিভলভারটি বের করে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন পুকুরে। পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো গেল না।

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ধরণী চক্রবর্তী। ছুঁড়ে ফেলা রিভলভারটিও পুকুর থেকে উদ্ধার করল পুলিশের লোকজন। যখন বাড়ির পশ্চিমদিকে এই সব কাণ্ডকারখানা চলছিল, সেই ফাঁকে অন্যান্য অভিযুক্তরা সন্দেহজনক জিনিসপত্র বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে বারান্দার দিকে ছুঁড়ে ফেলছিলেন সাক্ষ্যপ্রমাণ সরিয়ে ফেলার অভিপ্রায়ে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেন না বিপ্লবীরাও। পুলিশ অফিসাররা বাড়ির মধ্যে ঢোকার পর যেখানে সন্দেহজনক জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল সেখান থেকে উদ্ধার করল বেশ কয়েকটি বোমার খোল, বিস্ফোরক পদার্থ এবং কিছু সন্দেহজনক নথিপত্র। ধরণী চক্রবর্তীর ঘর থেকে পাওয়া গেল বোমা তৈরি করার ফর্মুলা সহ একটি পোস্টকার্ড। পোস্টকার্ডটির মাঝখানের খানিক অংশ কেটে বাদ দেওয়া ছিল। তাই পোস্টকার্ডটির কাটা অংশে কী লেখা ছিল বোঝা গেল না। রিভলভারটি সহ সন্দেহজনক জিনিসপত্র সিজ করে সিজার লিস্ট তৈরি করা হলো। এরপর সাতজন অভিযুক্তকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল ধরণীর বাড়ি থেকে। সিজার লিস্ট তৈরি করার সময় স্থানীয় লোকজন সাক্ষী হতে না চাওয়ায় পুলিশের লোকজনকেই সিজার লিস্টের সাক্ষী হতে হয়েছিল। সিজার লিস্টে সই করেছিলেন সাব-ইনস্পেক্টার আবু মহাম্মদ, সাব-ইনস্পেক্টার বসন্তকুমার মুখার্জী, দফাদার দেবেন্দ্রচন্দ্র দে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টার চিন্তাহরণ মুখোটি, পুলিশ কনস্টেবল আসরফ আলী এবং রঘুনন্দন সিং।

তল্লাসী অভিযান শেষ হওয়ার পর অভিযুক্তদের নিয়ে পুলিশ অফিসাররা থানায় এসে তাঁদের থানা লক্ আপে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। থানা মালখানায় জমা করেছিলেন সিজ করা আলামত। পরের দিন অভিযুক্ত সাতজনকেই মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সেইদিনই সব অভিযুক্ত আসামীর জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক অভিযুক্তরা জামিনের বন্ড জমা দিতে না পারায় অভিযুক্ত আসামীদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার।

মামলার নথি থেকে দেখা যায়, ময়মনসিং ষড়যন্ত্র মামলায় তদন্ত শেষে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করেছিল ২৪শে নভেম্বর। অভিযুক্ত সাতজন আসামীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১/১২০ (বি) ধারায়, অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) এবং ২০ ধারায়। এ ছাড়াও অভিযোগ ছিল বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৫ ধারায়। অভিযুক্ত সাতজন আসামীকে ৯ই ডিসেম্বর জেল হাজত থেকে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পূর্ব নির্দেশ মত হাজির করানো হয়েছিল। ৯ই ডিসেম্বর ধার্য ছিল সরকার পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়ার দিন। আদালতের নির্দেশ থাকলেও ৯ই ডিসেম্বর সরকার পক্ষ থেকে কোন সাক্ষী আনা হয়নি। বেশ কয়েকটি দিন সরকার পক্ষ সাক্ষী না আনায় মামলার শুনানি স্থগিত থাকল সাময়িকভাবে। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ অতিরিক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিয়ে বললেন, তিনি মামলাটি শুনবেন না। মামলাটির শুনানি হবে ময়মনসিং জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। সরকারী নির্দেশনামা-বলে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মামলাটি শুনেছিলেন।

মামলাটির তদন্তকালে জানা গিয়েছিল, ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর হেফাজতে থাকা রিভলভারটি ১৯৩০ সালে একজন সরকারী অফিসারের বাড়ী থেকে চুরি গিয়েছিল।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে এবং ফরিয়াদী ও আসামীপক্ষের সওয়াল জবাব শুনে সাতজন অভিযুক্ত আসামীকেই বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) এবং ২০ ধারায়, বিস্ফোরক পদার্থ

আইনের ৫ ধারায় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ধারায়। ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি প্রমাণিত না হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারার অভিযোগটি থেকে সব আসামীকেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ধরণীকান্ত চক্রবর্তীকে ৭ বছর, শৈলজারঞ্জন ভট্টাচার্য এবং নিখিলভূষণ চৌধুরীকে ৪½ বছর, সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং জগদ্বন্ধু বসুকে ৬ বছর, প্রফুল্ল মজুমদারকে ৭ বছর এবং মণীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথকে ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছিলেন। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই দন্ডাদেশ হয়েছিল ১৪ই মার্চ, ১৯৩২।

দণ্ডিত সাতজন আসামী কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন ১৯৩২ সালে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে। কলকাতা হাইকোর্টে দন্ডিত আসামীদের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার, শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায় এবং শ্রীকুমুদবন্ধু বাগচি। সরকারপক্ষে ছিলেন খোন্দেকার সাহেব এবং শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হয়েছিল চিফ্ জাস্টিস র‍্যানকিনস্ এবং জাস্টিস কোস্টেলোকে নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে। আপিলের রায়দান করেছিলেন হাইকোর্ট ১৯৩২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং আইনগত দিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, দণ্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি ফরিয়াদী পক্ষ। ধরণীর হেফাজাতে রাখা রিভলভারটি যে চুরি যাওয়া রিভলভার ছিল তা আসামীরা আগে থেকে জানতেন এবং জেনেশুনে রিভলভারটি তাঁদের কাছে রেখেছিলেন এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। কাজেই চুরির দ্রব্য রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। অবশ্য দন্ডিত আসামী ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর কাছেই যে রিভলভারটি ছিল সেই বিষয়ে হাইকোর্টের কাছে কোন সন্দেহ ছিল না। সেই কারণে হাইকোর্ট বললেন, ধরণী চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) এবং ২০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা গেল, অস্ত্র আইনের অভিযোগ থেকে ধরণী বাদে অন্যান্যদের মুক্তি দিলেন হাইকোর্ট।

পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে এবং বে-আইনিভাবে রিভলভার রাখার অপরাধ থেকে নিজেকে এবং তাঁর দলের লোকজনদের বাঁচাতে ধরণী পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে রাখা রিভলভারটিকে।

ধরণী সম্বন্ধে হাইকোর্ট বলেছিলেন—প্রথমত, তাঁর বাড়ি তল্লাসী করতে এসে পুলিশ তাঁর হাতে দেখেছিল রিভলভারটি। দ্বিতীয়ত, ধরণী সাক্ষ্য-প্রমাণ বিলোপ করতে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তাঁর হাতে থাকা রিভলভারটি। তৃতীয়ত, তাঁর বাড়ি তল্লাসী করে পাওয়া গিয়েছিল বোমার সেল ও অন্যান্য সন্দেহজনক কাগজপত্র। চতুর্থত, অন্যান্য অভিযুক্তদের পাওয়া গিয়েছিল ধরণীর বাড়িতে। পঞ্চমত, বোমা তৈরি করার মালমশলা পাওয়া গিয়েছিল ধরণীর বাড়ি থেকে।

ধরণী চক্রবর্তী আদালতের কাছে কোন গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাতে পারেননি কীভাবে রিভলভারটি তিনি পেয়েছিলেন এবং কেনই বা তাঁর বাড়িতে বোমার সেল এবং বিস্ফোরক পদার্থ রাখা হয়েছিল।

হাইকোর্ট বললেন, ধরণীকান্ত চক্রবর্তীকে দোষী সাব্যস্ত করে নিম্ন আদালত সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ত্র আইনের উভয় ধারায় অর্থাৎ ১৯ (এফ) এবং ২০ ধারায় ধরণীকে

দণ্ডিত করা নিম্ন আদালতের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। অস্ত্র আইনের ২০ ধারায় যখন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন আর ১৯ (এফ) ধারার অভিযোগে শাস্তি দেওয়া যায় না।

কলকাতা হাইকোর্ট অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারার অভিযোগটি থেকে ধরণী চক্রবর্তীকে মুক্তি দিলেও ২০ ধারার অভিযোগটি তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে বলে নিম্ন আদালতের সাথে একমত হয়েছিলেন। যদিও ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর পক্ষে তাঁর নিযুক্ত আইনজীবীরা আপিল কোর্টের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন সিজার লিস্টের সাক্ষীরা সবাই ছিলেন পুলিশের লোক। কোন স্থানীয় লোককে সাক্ষী করা হয়নি। এই অবস্থায় কেবলমাত্র পুলিশের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করে ধরণীকে দোষী সাব্যস্ত করা নিম্ন আদালতের উচিত হয়নি। এই ব্যাপারে হাইকোর্ট বললেন, পুলিশ অফিসাররা ধরণী চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতর প্রবেশ করার আগে স্থানীয় সাক্ষী পাওয়ার সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় লোকজন সাক্ষী হতে না চাওয়ায় পুলিশকে বাধ্য হয়ে সিজার লিস্টের সাক্ষী হিসেবে সই করতে হয়েছিল। পুলিশের এই যুক্তিকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই বলে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে আরো বলেছিলেন, পুলিশ সাক্ষীকেই বা কেন অবিশ্বাস করা হবে? পুলিশ বলে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না এমন কথা কোন আইনে লেখা নেই। তাছাড়া গভীর রাতে ধরণীর বাড়ি তল্লাসী করা হয়েছিল। গভীর রাতে স্থানীয় লোকজন প্রতিবেশীর বাড়িতে এসে এই ধরনের ঘটনায় কখনই নিজেদের যুক্ত করতে চাইবেন না। পুলিশ ছাড়া এই অবস্থায় বাইরের লোকজন পাওয়া এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার।

সব দিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের দেওয়া ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ধরণীর বিরুদ্ধে বহাল রেখেছিলেন। অবশ্য অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারার অভিযোগ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারার অভিযোগ থেকে ধরণী চক্রবর্তীকে রেহাই দিয়েছিলেন আপিল আদালত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৫ ধারায় ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশও বহাল থেকেছিল ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। অবশ্য উভয় দন্ড একসাথে চলবে বলে আদেশ হয়েছিল। ধরণীকান্ত চক্রবর্তীর আপিলের নিস্পত্তি হয়েছিল সবদিক বিচার-বিবেচনার পর।

নিম্ন আদালতে শৈলজারঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারায় ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারায় আরো ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। হাইকোর্ট শৈলজারঞ্জনকে নির্দোষ সাব্যস্ত করায় উভয় দণ্ডাদেশই বাতিল হয়েছিল। শৈলজারঞ্জন মুক্তি পেয়েছিলেন হাইকোর্টের আদেশে। শৈলজারঞ্জনকে বোমা তৈরির ষড়যন্ত্র থেকেও মুক্তি দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

দণ্ডিত আসামী মনীন্দ্রনাথকেও মুক্তি দিয়েছিলেন হাইকোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে আনা সরকার-পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ না হওয়ায়। কিন্তু অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের দেওয়া দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছিলেন হাইকোর্ট। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়।

মুসলমান পাড়ায় পুলিশ অফিসার হত্যা

১৯১৪ সালের ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যা অনুমান ৯টার সময় হ্যারিসন রোড এবং মুসলমান পাড়ার সংযোগস্থলের কাছ থেকে পর পর দুটি বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শুনে চতুর্দিক থেকে লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হ'ল। ঘটনাস্থলে এসে দেখা গেল, বোমার আঘাতে আহত হয়ে পড়ে আছে পুলিশ অফিসার রামভূজন সিং। এ ছাড়াও ভীষণভাবে আহত হয়েছেন পুলিশ অফিসার মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সোমেশ্বর দত্ত পাণ্ডে এবং একজন স্থানীয় বাসিন্দা হরবিলাস ঘোষাল। ভীষণভাবে আহত পুলিশ অফিসার রামভূজন সিংয়ের কাছে এসে দেখা গেল, তাঁর দেহে প্রাণ নেই। তিনি বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন।

প্রথম বোমাটি ফেলা হয়েছিল ১০/৪/১, মুসলমানপাড়া লেনের বাড়িটির একটি ঘরের মধ্যে। খোলা দরজার মধ্য দিয়ে বোমাটি এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। দ্বিতীয় বোমাটি এসে পড়েছিল পশ্চিম দিকের একটি বাড়ীর দেওয়ালের সামনে। বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল মুসলমান পাড়া লেনের উপর একটি বাড়ীর দেওয়াল ঘেঁষে।

বোমার আঘাতে রামভূজন সিংয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কলকাতার পুলিশ একটি হত্যা মামলা রুজু করল। শুরু হল পুলিশি তদন্ত। তদন্তে জানা গেল, ৩/৪ জন বাঙালী যুবক বোমা ছুঁড়ে পুলিশ অফিসার রামভূজন সিংকে হত্যা করেছে এবং অন্যান্য কয়েকজনকে বোমার আঘাতে আহত করেছে। পুলিশি তদন্তে আরো জানা গেল, মুসলমান পাড়া লেনে বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক। পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী এই ৩/৪ জন বোমা বিস্ফোরণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পুলিশের খবর অনুযায়ী বোমা দুটির মধ্যে একটি ছুঁড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নামে যুবকটি।

মামলার বিচার শুরু হতে বোমায় আহত পুলিশ অফিসার সোমেশ্বর দত্ত পাণ্ডে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে উঠে বললেন, যে লোকটি বোমা ছুঁড়েছিলেন তাঁর গায়ে ছিল একটি আলোয়ান। কিন্তু সেইদিন বোমা বিস্ফোরণের সময় নগেন্দ্রনাথের গায়ে কোন আলোয়ান ছিল না। এ ছাড়াও দায়রা আদালত সোমেশ্বর পাণ্ডের সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করলেন না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই হত্যা মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের দায়রা আদালতে বিচার হয়েছিল।

হত্যা, বোমা বিস্ফোরণ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে আটটি চার্জ গঠন করা হয়েছিল। আটটি চার্জের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চার্জটি ছিল নগেন্দ্রনাথের নিজ হাতে বোমা বিস্ফোরণ। এ ছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বোমা বিস্ফোরণ ষড়যন্ত্রে নগেন্দ্রনাথ প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

পুলিশ অফিসার সোমেশ্বর দত্ত পাণ্ডের আসামী শনাক্তকরণকেও আদালত নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেননি।

এর পর হাইকোর্টের কাছে প্রশ্ন এসেছিল যে ৩/৪ জন বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অভিযুক্ত আসামী নগেন্দ্রনাথ আদৌ ছিলেন কি না! সরকার পক্ষের সব সাক্ষীরাই একবাক্যে বলেছিল দুটি বোমার শব্দ শোনা গিয়েছিল মুসলমানপাড়া ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের কাছ থেকে। বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত ছিল। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বোমা নিক্ষেপকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সি-আই-ডি পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বসন্তকুমার চ্যাটার্জীকে বোমা বিস্ফোরণে হত্যা করা। বসন্তকুমার চ্যাটার্জী ঘটনার সময় থাকতেন ১০/৪/১, মুসলমানপাড়া লেনে। কলকাতা পুলিশের দৃঢ় ধারণা ছিল বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে হাত ছিল কোন সন্ত্রাসবাদী দলের এবং নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন সন্ত্রাসবাদী দলের সাথে যুক্ত। অবশ্য সরকার পক্ষের কৌসুলী স্যার সত্যেন্দ্র সিনহা নিজেই আদালতের কাছে স্বীকার করেছিলেন সরকারের হাতে এমন কোন তত্ত্ব বা প্রমাণ নেই যার থেকে দেখানো যাবে আসামী নগেন্দ্রনাথ কোন সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য বা কোনভাবে যুক্ত ছিলেন।

পুলিশের তদন্তে জানা গিয়েছিল, ঘটনার সময় নগেন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। থাকতেন অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে। এর থেকে প্রমাণ হয়, নগেন্দ্রনাথ থাকতেন মুসলমানপাড়ার কাছাকাছি। বোমা বিস্ফোরণে নগেন্দ্রনাথ নিজেও আহত হয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথের ভাই থাকতেন মুসলমানপাড়া লেনের একটি হস্টেলে। তাঁর যাতায়াত ছিল ভাইয়ের হস্টেলে। সুতরাং ঘটনার সময় মুসলমানপাড়া লেনে নগেন্দ্রনাথের উপস্থিতি কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের কাছে নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তিনি তাঁর ভাইয়ের হস্টেলে যাচ্ছিলেন মুসলমান পাড়া লেন দিয়ে। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁর পক্ষে বোমায় আহত হওয়া আশ্চর্য মনে করারও কোন কারণ ছিল না।

ঘটনার সময় অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলের দেখাশোনার ভার ছিল মিঃ হোমসের উপর। সরকার পক্ষের উচিত ছিল সাক্ষী হিসেবে মিঃ হোমস্‌কে তলব করা। মিঃ হোমস্‌কে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হলে নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশদ খোঁজখবর পাওয়া যেত। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্‌ মিঃ হোমস্‌কে সাক্ষী হিসেবে মানা হয়নি। মুসলমানপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণে পুলিশ অফিসার মনোরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সোমেশ্বর দত্ত পাণ্ডের আহত হওয়ার ঘটনা আদালত বিশ্বাস করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে আসামীপক্ষ থেকেও ঘটনার কথা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর সাথে সোমেশ্বর দত্ত পাণ্ডের সাক্ষ্যর ছিল বিস্তর ফারাক।

সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা গিয়েছিল, দুজন যুবক বোমা দুটি ছুঁড়েছিলেন মুসলমান পাড়া লেনে। পুলিশ অফিসার সোমেশ্বর দত্ত পাণ্ডে মামলার স্বার্থে অন্যরকম বলায় হাইকোর্ট তাঁর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

সোমেশ্বরের সাক্ষ্যকে বিশ্বাসযোগ্য করতে গিয়ে মনোরঞ্জন চক্রবর্তীকে দিয়ে নানা অসত্য কথা বলানো হয়েছিল। মনোরঞ্জন তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, তিনি মুসলমানপাড়ার একটি ডাস্টবিনের সামনে বোমা বিস্ফোরণের সময় দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেখান থেকে নগেন্দ্রনাথকে বোমা ছুঁড়তে দেখেছিলেন। অথচ সোমেশ্বর আদালতের কাছে বলেছিলেন, মনোরঞ্জন দাঁড়িয়েছিলেন দূরের একটি ল্যাম্পপোস্টের সামনে। সোমেশ্বর বলেছিলেন, বোমা

বিস্ফোরণকারীদের দলে ছিল দুজন যুবক। কিন্তু মনোরঞ্জনের সাক্ষ্যে দেখা গিয়েছিল, তিনজন যুবক ছিল দলটিতে। তিনজনের মধ্যে একজন বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল অখিল মিস্ত্রি লেনের দিকে। অখিল মিস্ত্রি লেনের দিকে ছুটে যাওয়া যুবকটিকে ধাওয়া করতে গিয়ে তিনি নাকি একটি পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর সুস্থ হয়ে তাঁর নিজের বাড়ি ১০/৪/১, মুসলমানপাড়া লেনে ফিরেছিলেন। হাইকোর্ট মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করেননি।

সেখ হিংগু নামে একটি ছেলে ছিল সরকার পক্ষের সাক্ষী। সেখ হিংগুর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, পুলিশ অফিসার সোমেশ্বর বা মনোরঞ্জন কেউই বোমা বিস্ফোরণকারীদের তাড়া করেননি। সে ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল বিশদভাবে। সে বলেছিল, বোমা বিস্ফোরণের পর কেউই দৌড়ে যায়নি। সে একটি যুবককে হেঁটে অখিল মিস্ত্রি লেনের দিকে যেতে দেখেছিল।

সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী নামে এক ভদ্রলোক আদালতকে বলেছিলেন, বোমায় আহত হওয়ার পর সোমেশ্বর ও মনোরঞ্জন দুজন পুলিশ অফিসারই ভীষণভাবে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে কোথাও ছুটে যাননি।

এইসব সাক্ষীর সাক্ষ্য শোনার পর পুলিশ অফিসারদের অপরাধীদের ধাওয়া করার গল্প হাইকোর্ট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছিলেন। শরাফত নামে সরকার পক্ষের একজন সাক্ষী ঘটনাস্থল সম্বন্ধে যে ধরনের বিবরণ দিয়েছিল তার থেকে হাইকোর্টের কাছে ঘটনাস্থল নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় সরকার পক্ষ ও আসামী পক্ষ দু তরফের অনুরোধে হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি (যাঁদের কাছে মামলাটির শুনানী চলছিল) ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছিলেন। এই তিনজন বিচারপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিনস্, স্যার আশুতোষ মুখার্জী এবং বিচারপতি হলমউড্। এই তিনজন মাননীয় বিচারপতি মুসলমান পাড়া লেন ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থল এবং সন্নিহিত অঞ্চল ঘুরে দেখেছিলেন। ঘটনাস্থল দেখার পর তাঁদের কাছে মুসলমানপাড়ার ছবিটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

সাক্ষ্যসাবুদ থেকে দেখা যায়, নগেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তারের সময় তিনি মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরেছিলেন। সুবোধ নামে একজন সি-আই-ডি অফিসার আদালতকে বলেছিলেন, গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্ত আসামীর নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি নাকি প্রশ্নের উত্তরে কেবলমাত্র বলেছিলেন, "My name is name." অর্থাৎ 'আমার নাম মানে নাম।' নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তারের পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালে নাকি একজন ইউরোপীয়ান সার্জেন নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি পুলিশের লোক? উত্তরে নগেন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, 'I am not a police but a man।' অথচ হাসপাতালের কোন ইউরোপীয়ান সার্জেন বা বাঙালী ডাক্তার সি-আই-ডি পুলিশের এই গল্প সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করতে পারেননি।

পুলিশের পক্ষ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল নগেন্দ্রনাথকে অখিল মিস্ত্রি লেন থেকে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি গুলি ভর্তি রিভলভার। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে বলেছিলেন, নগেন্দ্রনাথের উপর সন্দেহ জোরদার করার জন্য এই রিভলভারের গল্পটি ফাঁদা হয়েছিল। সরকার পক্ষের কৌসুলী স্যার সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই রিভলভারের গল্পটি বিশ্বাস করেননি। নগেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করেছিলেন সুধীর ও শরৎ নামে দুজন পুলিশ অফিসার। তাঁরা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেওয়ার আগে আদালতের কাছে দাখিল করা এই রিভলভারটি কোনদিন দেখেননি। পুলিশ অফিসার মিঃ বেলচার অবশ্য বলেছিলেন, তিনি ঘটনার খবর

পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁর হাতে একটি রিভলভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি মামলার আলামত হিসেবে রিভালভারটি নিজের হেফাজতে নিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথের সারা দেহ বোমার আঘাতে রক্তাক্ত জখম হয়েছিল, রক্তে তাঁর পরনের জামাকাপড় পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রিভলভারটিতে কোন রক্তের দাগ ছিল না। এইসব দিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, নগেন্দ্রনাথের কাছ থেকে মোটেই কোন রিভলভার পাওয়া যায়নি।

প্রধান বিচারপতি স্যার জেনকিনস্ বলেছিলেন, অভিযুক্ত আসামী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং হাইকোর্ট মুক্তি দিলেন নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে।

প্রধান বিচারপতি তাঁর রায়ের উপসংহারে বলেছিলেন, মামলাটিতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক অভিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিচার-বিবেচনা করার পর হাইকোর্টের কোন সন্দেহ নেই অভিযুক্ত আসামীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল। এইভাবে একজন নির্দোষ যুবককে কখনই একটি হত্যা মামলায় মিথ্যা করে যুক্ত করা উচিত নয়।

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মুক্তি পেয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারে। বিচারপতির রায়দান সমাপ্ত হওয়ার পর স্যার আশুতোষ আলাদাভাবে মামলাটিতে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেন—
"My deliberate conclusion is that the endeavour made to establish a connection between this innocent lad and a dastardly crime, by means of evidence tainted in a large measure by manifest untruths and manufactured incidents, has been completely unsuccessful."

জাস্টিস হলমউডও প্রধান বিচারপতির সাথে সহমত প্রকাশ করার পর মন্তব্য করেছিলেন—

"I am convinced of the absolute innocence of the accused. He was the victim of an unfortunate train of circumstances which made the case at first appear very black against him, but the assidity of those whose duty it was to investigate the facts, in endeavouring to elaborate and clench those circumstances, has served the purpose of clearly demonstrating to my mind that he can have had no hand in the diabolical crime with which he was charged."

হাইকোর্টের বিচারে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শুধু মুক্তিই পেলেন না, তাঁকে মিথ্যা করে মামলাটিতে অভিযুক্ত করায় হাইকোর্ট মামলাটির তদন্ত সম্বন্ধে কঠোর কটাক্ষপাত করেছিলেন।

লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা

পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পরাধীন ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল বিপ্লবী দল গড়ার কাজ। বিপ্লবী দলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা। মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে শপথ নিয়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন বহু কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী। বিপ্লবী দলের একাধিক যুবক-যুবতী নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দলের নির্দেশে সশস্ত্র আঘাত হেনেছিলেন বিদেশী সরকারের আমলাদের উপর। হত্যা করেছিলেন ভারতবর্ষে বসবাসকারী একাধিক ইউরোপীয়ানকে। বিপ্লবী দলের বহু সদস্য হত্যা বা হত্যা ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে কারো কারো বা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাস। রাজদ্রোহের অভিযোগে অনেক বিপ্লবীকে খাটতে হয়েছিল বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড। দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়া দন্ডাদেশ। দেশের কাজে জীবন আত্মাহুতি দিতে বিপ্লবীরা কখনই কুণ্ঠা বোধ করেননি। বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্যরা নিজেদের দলের আদর্শে ছিলেন অবিচল। তাঁদের কাছে দলের আদর্শই ছিল প্রথম ও শেষকথা। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁদের কাছে ছিল অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সদস্যদের আদর্শভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি দেখলে দলের পক্ষে সাধারণত তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ও দলের প্রতি বেইমানি করাব অপরাধে দলের নেতৃত্বের নির্দেশে চরম দন্ড পেতে হয়েছিল একাধিক বিপ্লবী সদস্যকে। পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলতে খুন পর্যন্ত করতে হয়েছে আদর্শ ও নীতিভ্রষ্ট বিপ্লবীকে।

আবার অনেক সময় দেখা গিয়েছে কোন কোন বিপ্লবী দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দলের মধ্যে দেখা গিয়েছে দলাদলি। এই দলাদলিকে কেন্দ্র করে একপক্ষ অন্যপক্ষকে হত্যা পর্যন্ত করেছে পরিকল্পনা মাফিক। লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটিতে ঘটেছিল এই ধরনের ঘটনা।

লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটি হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। বিপ্লবী নেতা বিনায়ক রাও কাপলের হত্যাকে কেন্দ্র করে লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটি শুরু হয়েছিল। বিনায়ক রাও কাপলেকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯১৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ শহরে। লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী দায়রা আদালতের আদেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। দায়রা আদালতের রায় হয়েছিল ১৯১৮ সালের ১৩ই আগস্ট। অভিযুক্ত সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল হত্যা ও হত্যার প্ররোচনা দানের।

মৃত্যুদন্ডের আদেশের বিরুদ্ধে সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী আউধ জুডিসিয়াল কমিশনার কোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন। তাছাড়া লক্ষ্ণৌর দায়রা বিচারকও মামলার রায়-সহ নথিটি

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আউধ জুডিসিয়াল কমিশনার কোর্টে তাঁর দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখার যুক্তিগ্রাহ্যতা বিবেচনা করার জন্য। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করতে গেলে প্রয়োজন ছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ের সমর্থন।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সুশীলচন্দ্র ছিলেন ২৭ বছর বয়সের একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ যুবক। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ১৯১৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত অনুমান ৮টার সময় লক্ষ্ণৌ শহরের ঘসিয়ারীমণ্ডির একটি সরু গলিতে একটি যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত যুবকটির লাশ পড়ে ছিল সরু গলিটির মধ্যে। হত্যা করার পর স্থানীয় লোকজন আসার আগেই হত্যাকারীরা পালিয়ে গিয়েছিল। গুলির আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হয়েছিলেন ঘটনাস্থলে। মৃতদেহটি শনাক্ত করতে না পারায় ঘসিয়ারীমণ্ডির স্থানীয় লোকজন রাত অনুমান ৯টার সময় নিকটস্থ আমিনাবাদ ফাঁড়িতে ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। তাঁরা ফাঁড়ির পুলিশকে বলেছিলেন, রাত অনুমান ৮টার সময় তিনবার গুলির আওয়াজ শোনার পর তাঁরা ঘসিয়ারীমণ্ডির সরু গলিটিতে দৌড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি অচেনা যুবকের রক্তমাখা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ফাঁড়িতে খবর দিতে এসেছেন। স্থানীয় লোকজন অবশ্য পুলিশকে জানিয়েছিলেন তাঁরা মৃত যুবকটিকে চিনতে পারেননি এবং হত্যাকারীদেরও দেখতে পাননি। ফাঁড়ির পুলিশ এই খবর শোনার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছিলেন। ঘটনাস্থলে এসে আমিনাবাদ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলেরা মৃতদেহটি ঘিরে রেখেছিলেন। খবর পাঠানো হয়েছিল হজরথগঞ্জের কোতোয়ালী থানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই থানার অফিসাররাও এসে পৌঁছেছিলেন ঘটনাস্থলে। পিস্তলের গুলির ক্যাপ পড়েছিল মৃতদেহটির কাছাকাছি। এছাড়া গুলির খালি খোলও পাওয়া গিয়েছিল সরু গলিটির মধ্যে। ঘটনাস্থলে পাওয়া খালি খোলগুলি ছিল মাউসের পিস্তলের গুলির খোল। মৃতদেহটির পরনের জামা-কাপড় ছিল একজন বাঙালী বাবুর সাজসজ্জার মত। মৃতদেহটিকে স্থানীয় লোকজন শনাক্ত করতে না পারায় মৃতদেহটির ছবি তুলে রাখা হয়েছিল। এর পর মৃতদেহটির পরিচয় জানার জন্য ছবিসহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল পুলিশের তরফ থেকে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি মৃতদেহটির ছবি দেখানো হয়েছিল মোরেশ্বর রাও কাপলে নামে একটি স্কুলের ছাত্রকে। মোরেশ্বর সেইসময় পড়ত এলাহাবাদের একটি হাইস্কুলে। মৃতদেহটির ছবি দেখার ২/৩ দিন পরে মোরেশ্বর পুলিশ অফিসার মিঃ সন্ডস্‌কে জানিয়েছিল মৃতদেহটির ছবি তার দাদা বিনায়ক রাও কাপলের। প্রথমে ছবিটি দেখে নিশ্চিত হতে না পারায় মোরেশ্বর ২/৩ দিন সময় নিয়েছিল। ২/৩ দিন ধরে ভালভাবে মৃতদেহের ছবি দেখেশুনে মোরেশ্বর নিশ্চিত হয়েছিল ছবিটি তার দাদা বিনায়কের। ছবিটি দেখে প্রথম অবস্থায় চিনতে সময় লাগার কারণ হিসেবে মোরেশ্বরের যুক্তি ছিল তার দাদা বিনায়ককে সে শেষবার দেখেছিল ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে। বছর তিনেকের মধ্যে তার দাদা বিনায়কের সাথে তার কোন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তাই ছবি দেখে তার দাদাকে চিনতে কিছুটা সময় লেগেছিল। মোরেশ্বরের কাছ থেকেই পুলিশ অফিসার প্রথম জানতে পেরেছিলেন মৃত যুবকটির নাম ছিল বিনায়ক রাও কাপলে। বিনায়ক ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত থাকায় পুলিশের তৈরি বিপ্লবীদের তালিকায় বিনায়ক রাও কাপলের নামও উঠে গিয়েছিল। তাঁর বিপ্লবী জীবনের কাজকর্ম সম্বন্ধে পুলিশের কাছে কিছু রেকর্ড ছিল আগে থাকতেই। লক্ষ্ণৌবাসীর কাছে বিনায়ক রাও কাপলে ছিলেন 'সত্যেন' নামে পরিচিত। মোরেশ্বর রাও দায়রা আদালতে সাক্ষ্য দিতে উঠে ছবি দেখে বলেছিল, ছবিটি তার দাদা বিনায়ক রাও কাপলের। মৃতদেহের ছবিটি যে তার

দাদা বিনায়কের সেই ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিল না। দায়রা আদালত মোরেশ্বরের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে অবশ্য আপিলকারীর পক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছিল মৃতদেহটি কোনভাবেই শনাক্ত করা যায়নি। ঘসিয়ারীমণ্ডির সরু গলি থেকে পাওয়া মৃতদেহটি যে প্রকৃতই বিনায়ক ওরফে সত্যেনের তা সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পারেননি। দায়রা আদালত আসামী পক্ষের এই বক্তব্য মেনে নেননি। মৃতদেহটি যে বিনায়ক রাও কাপলে ওরফে সত্যেনের সেই বিষয়ে আদালতের কোন সন্দেহ ছিল না।

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছিল, বিনায়ক ওরফে সত্যেন ছিলেন বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্য। বিনায়কের বিপ্লবী কাজকর্মের পরিধি ছিল বাংলা ও ইউনাইটেড্ প্রভিন্স্ এই দুটি রাজ্যে জুড়ে। পুলিশ ইতিপূর্বে বিনায়ককে ১৯১৫ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে খুঁজে বেরিয়েছিলেন বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায়। ফেরার থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় খোঁজা হয়েছিল সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী এবং নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। তাঁদেরও পাওয়া যায়নি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মনামে তাঁরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। চেষ্টা করেও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা যায়নি বিনায়ক রাও কাপলে, সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী এবং নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে।

নানা গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গুলিতে বিনায়ক রাও কাপলের মৃত্যু ঘটেছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী রাতে লক্ষ্ণৌ শহরের ঘসিয়ারীমণ্ডির সরু গলিটিতে। পুলিশের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল মৃতদেহটি ছিল বিনায়ক রাও কাপলের। মোরেশ্বর ছবি দেখে শনাক্ত করার পর এই ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ ছিল না। লক্ষ্ণৌ শহরে বিনায়ক যেমন 'সত্যেন' নামে পরিচিত ছিলেন আবার অনেকেই তাঁকে 'বড়বাবু' হিসেবে জানতেন। বিনায়ক ছিলেন মারাঠি যুবক। কিন্তু তিনি সব সময় বাঙালী যুবকের মত জামা-কাপড় পরতেন। বেশির ভাগ সময় ধুতি পরতেন। কথাবার্তা বলতেন বাংলায়। পুলিশি তদন্তে দেখা গিয়েছিল বিনায়ক রাও কাপলে, সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী, নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শঙ্করলাল সবাই ছিলেন একই বিপ্লবী দলের সদস্য।

লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২২শে ফেব্রুয়ারী। গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২০০টি তাজা কার্তুজ। এই তাজা কার্তুজগুলি ছিল মাউসের পিস্তলে ব্যবহার করার উপযোগী কার্তুজ। সরকার পক্ষের সাক্ষী মিঃ গোল্ডি ঘটনার সময় ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার। অভিযুক্ত সুশীলচন্দ্রের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা কার্তুজগুলি ছিল কিছুদিন পূর্বে কলকাতার রডা কোম্পানীর মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ড থেকে চুরি যাওয়া কার্তুজের একটা অংশ। মিঃ গোল্ডি জানতেন কিছুদিন আগে রডা কোম্পানীর মলঙ্গা লেনের আয়রন ইয়ার্ড থেকে চুরি গিয়েছিল ৫০টি মাউসের পিস্তল এবং ৪৫,০০০ মাউসের কার্তুজ। রডা কোম্পানীর কার্তুজের গায়ে মার্কা দেওয়া ছিল এবং এই বিশেষ মার্কার কথাও মিঃ গোল্ডি জানতেন। মৃতদেহটির কাছাকাছি থেকে যে কার্তুজের খালি খোল পাওয়া গিয়েছিল তার গায়েও ছিল রডা কোম্পানীর সেই বিশেষ মার্কা। সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর হেফাজত থেকে পিস্তল ও পিস্তলের গুলি পাওয়া যাওয়ায় বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে আলাদাভাবে অস্ত্র আইনেও তাঁর বিচার হয়েছিল। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তাঁকে ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হতে হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটির বিচার চলাকালীন অবস্থায় সুশীলচন্দ্র জেল খাটছিলেন অস্ত্র আইনে দণ্ডাদেশের মেয়াদ শেষ না হওয়ায়। লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায়

শঙ্করলালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩রা এপ্রিল। পরে শঙ্করলালকে মামলাটিতে একজন প্রধান সাক্ষী হিসেবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল সরকার পক্ষ থেকে। শঙ্করলাল ছিলেন আঠারো বছরের একটি যুবক। পড়তেন লক্ষ্মৌ চার্চ মিশন হাইস্কুলে। শঙ্করলাল চার্চ মিশন হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে। এর আগে পড়তেন আলিগড়ের দয়ানন্দ আর্য বৈদিক পাঠশালায়। লক্ষ্মৌ এসে শঙ্করলাল বসবাস করছিলেন বিনায়ক ওরফে সত্যেনের সাথে একই বাড়ীতে। বিনায়কের হত্যার পরদিন থেকে শঙ্করলাল স্কুলে আসছিলেন না। কোথায় চলে গিয়েছিলেন তাও জানা গেল না। হঠাৎ ১লা এপ্রিল শঙ্করলাল আলিগড়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আলিগড়ে শঙ্করলাল থাকতেন তাঁর সম্পর্কের দাদা ভোজরাজের বাড়িতে। ভোজরাজ কাজ করতেন রেলে। ভোজরাজ জানতে পেরেছিলেন বিনায়ক হত্যা মামলায় পুলিশ অফিসাররা শঙ্করলালকে খোঁজাখুঁজি করছেন। শঙ্করলাল আলিগড়ে ফেরার পর ভোজরাজ তাঁকে নিয়ে আলিগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শঙ্করলাল জবানবন্দি দিয়েছিলেন। তাঁর জবানবন্দি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নথিভুক্ত করে নিয়েছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শঙ্করলাল বলেছিলেন, বিনায়ক রাও কাপলের হত্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। অবশ্য তিনি শুনেছিলেন, লক্ষ্মৌতে তাঁর বাড়ির সামনের একটি সরু গলিতে একটি লোককে হত্যা করা হয়েছিল। ভয়ে তিনি মোরদাবাদে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে ফিরে আলীগড়ে দাদা ভোজরাজের বাড়িতে উঠেছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেওয়ার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ৩রা এপ্রিল দিনের বেলা। কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর পর ৫ই এপ্রিল শঙ্করলালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বেনারসে। বেনারসে আসার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সি-আই-ডি'র দুজন পুলিশ অফিসারের কাছে। এই দুজন পুলিশ অফিসারের মধ্যে একজন ছিলেন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, অপরজন ছিলেন ইনস্‌পেক্টার। তাঁরা দুজনই শঙ্করলালকে নানাভাবে জেরা করেছিলেন হত্যা মামলাটির রহস্য সন্ধানে।

৭ই এপ্রিল শঙ্করলালকে হাজির করা হয় বেনারসের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পিমের কাছে। মিঃ পিমের কাছে দীর্ঘ জবানবন্দি দিয়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন, তিনি ছিলেন বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত। প্রথম প্রথম তিনি আলীগড় থেকে লক্ষ্মৌ এসে দলের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। মিঃ পিমের কাছে শঙ্করলাল স্বীকার করেছিলেন আলীগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া তাঁর জবানবন্দি সম্পূর্ণটাই ছিল মিথ্যায় ভরা। শঙ্করলালের দেওয়া দ্বিতীয় জবানবন্দিটি মামলায় এগ্‌জিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়েছিল। মিঃ পিমের কাছে দেওয়া জবানবন্দিটির এগ্‌জিবিট নম্বর ছিল ৬৮। ১২ই এপ্রিল ১৯১৮ সালে লক্ষ্মৌ সেন্ট্রাল জেলে শঙ্করলাল শনাক্ত করেছিলেন সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীকে। শঙ্করলাল বলেছিলেন, সুশীলচন্দ্রকে তিনি জানতেন 'থার্মোমিটার' নামে। গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত তাঁর জানা ছিল না 'থার্মোমিটারের' আসল নাম ছিল সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী। সেইদিনই শঙ্করলালকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হজরথগঞ্জ পুলিশ থানায়। তাঁকে থানায় নিয়ে এসেছিলেন মিঃ সন্ডস্‌। থানায় আসার পর তাঁর সামনে রাখা হয়েছিল ১০টি ফেল্ট ক্যাপ, ১০ রাউন্ড গুলি এবং ৩টি টুপি। ৩টি টুপির মধ্যে থেকে ১টি টুপি তুলে নিয়ে শঙ্করলাল বলেছিলেন, এই ধরনের টুপি 'থার্মোমিটার' ব্যবহার করতেন। শঙ্করলালের দেখানো টুপিটি পাওয়া গিয়েছিল ঘটনাস্থল থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী রাতে। এ ছাড়াও অপর একটি টুপির দিকে ক্রমাগত তাকাচ্ছিলেন শঙ্করলাল। তাঁকে ক্রমাগত টুপিটির দিকে

তাকাতে দেখে কৌতূহলবশত প্রশ্ন করা হয়েছিল—তিনি বারবার কেন টুপিটির দিকে তাকাচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করলাল বলেছিলেন, ওই টুপিটি দলের অপর আর এক নেতা ব্যবহার করতেন। নেতাটির নাম শম্ভুদয়াল। এই শম্ভুদয়ালের নাম মিঃ পিমের কাছে দেওয়া তাঁর জবানবন্দিতে শঙ্করলাল উল্লেখ করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, প্রথমে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল সত্যি সেইটি শম্ভুদয়ালের ব্যবহৃত ক্যাপ কি না! সেজন্য ক্যাপটি চিনতে তাঁর একটু সময় লেগেছিল। এই ক্যাপটিও (টুপি) ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৯ই ফেব্রুয়ারীর রাতে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তৃতীয় ক্যাপটি শঙ্করলাল চিনতে পারেননি। মামলায় অপর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ। তেজেন্দ্রমোহন ছিলেন ২০ বছর বয়সের একটি বাঙালী যুবক। থাকতেন ঢাকায়। মিঃ গোন্ডির কাছ থেকে জানা গিয়েছিল, তেজেন্দ্রমোহন একসময় ছিলেন বাংলার একটি বিপ্লবী দলে। পুলিশ সেই সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী আখড়ায়। কিন্তু পুলিশ সবরকম চেষ্টা করেও তাঁকে সেই সময় গ্রেপ্তার করতে পারেনি। রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে তেজেন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩রা জুলাই কলকাতা থেকে। পরে তেজেন্দ্রমোহনকে লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষী করা হয়েছিল। তেজেন্দ্রমোহন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ১৯১৮ সালের ১৩ই জুলাই।

তেজেন্দ্রমোহন তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, গ্রেপ্তারের পরে তাঁকে নিয়ে মিঃ সন্ডস্ লক্ষ্ণৌ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছিলেন। তিনি বিনায়ক হত্যার নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ সন্ডস্‌কে। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, তিনি নিজের চোখে ঘটনা দেখেছিলেন। তেজেন্দ্রমোহন আরো বলেছিলেন, ঘটনার দিন হত্যাকাণ্ডটি ঘটে যাওয়ার পর তিনি যখন ঘটনাস্থল থেকে রেলস্টেশনের উদ্দেশ রওনা দিয়েছিলেন সেই সময় তাঁর পায়ে জুতো ছিল না। ধস্তাধস্তির সময় তাঁর জুতোজোড়া পা থেকে খুলে যাওয়ায় তাড়াহুড়ায় জুতোজোড়া ফেলে এসেছিলেন ঘটনাস্থলে। তিনি জুতো খুঁজে না পাওয়ায় রেলস্টেশনের পথে আমিনাবাদের একটি জুতোর দোকান থেকে একজোড়া জুতো কিনে নিয়েছিলেন।

তেজেন্দ্রমোহনকে শহর ঘুরিয়ে মিঃ সন্ডস্ নিয়ে এসেছিলেন হজরথগঞ্জ পুলিশ থানায়। সেখানে সিটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেহ্রুর সামনে শনাক্তকরণ প্যারেড হয়েছিল আসামী চেনাবার জন্য। ১৮ জন বিচারাধীন (অন্যান্য মামলার আসামী) আসামীকে টি. আই. প্যারেডের লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল। টি. আই. প্যারেডের লাইনে শঙ্করলালকেও রাখা হয়েছিল। তেজেন্দ্রমোহন লাইনে দাঁড়ানো ১৮ জনের মধ্যে শঙ্করলালের গায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন, এই ছেলেটিকে তিনি 'লালা' নামে চিনতেন ; এরপর অপর একটি শনাক্তকরণ প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছিল হজরথগঞ্জ থানায়। এই টি. আই. প্যারেডটির লাইনে তেজেন্দ্রমোহন সহ ১৮ জন বাঙালী যুবককে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল। এবার সাক্ষী হিসেবে আনা হয়েছিল শঙ্করলালকে। শঙ্করলাল তেজেন্দ্রমোহনকে দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন, এই লোকটি ঘটনায় ছিলেন এবং এই লোকটিকে তিনি চিনতেন 'বাঙাল' নামে। এর পর তেজেন্দ্রমোহনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লক্ষ্ণৌ জেলে। সেখানেও একটি টি. আই. প্যারেড হয়েছিল বিভিন্ন মামলার ২২ জন বিচারাধীন আসামীকে নিয়ে। এই ২২ জনের মধ্যে মিশিয়ে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীকে। সাক্ষী ছিলেন তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ। তেজেন্দ্রমোহন লাইনে দাঁড়ানো সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীকে দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলেন, এই লোকটিকে তিনি চিনতেন 'কেমিস্ট' এবং 'থার্মোমিটার' নামে। আরো বলেছিলেন এই থার্মোমিটার ভদ্রলোকটি হত্যা ঘটনার সাথে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে।

লক্ষ্ণৌ দায়রা আদালতে সাক্ষ্য দিতে উঠে তেজেন্দ্রমোহন বলেছিলেন, তিনি ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে এসেছিলেন অপর একজনের সাথে। তিনি মৃত বিনায়ক ওরফে সত্যেনকে চিনতেন 'রাজু' নামে। তাঁর সঙ্গে থাকা লোকটি যাঁর সাথে তিনি ঘটনাস্থলে এসেছিলেন তিনি তাঁর পিস্তল থেকে সত্যেনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। গুলি লেগেছিল সত্যেনের দেহে। এ ছাড়া তিনি ঘটনাস্থলে 'থার্মোমিটার'-কেও দেখেছিলেন। মামলার অভিযুক্ত আসামী সুশীলচন্দ্র ওরফে থার্মমিটারের হাতেও ছিল একটি রিভলভার। সুশীলচন্দ্র তাঁর রিভলভার থেকে তাঁকে (তেজেন্দ্রমোহনকে) লক্ষ্য করে তিনবার গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনবারই রিভলভারটি থেকে গুলি বের হল না। অবস্থা বুঝে তেজেন্দ্রমোহন থার্মোমিটারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলেছিল থার্মোমিটারের। ধস্তাধস্তির সময় থার্মোমিটারের হাত থেকে রিভলভারটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তেজেন্দ্রমোহন মাটি থেকে রিভলভারটি তুলে নিয়েছিলেন। তেজেন্দ্রমোহন তাঁর সাক্ষ্যতে আবার এই কথাও বলেছিলেন, সত্যেনের সাথেও থার্মমিটারের ধস্তাধস্তি হয়েছিল। এই দুজনের ধস্তাধস্তি চলার সময় রিভলভারটি থার্মমিটারের হাত থেকে তেজেন্দ্রমোহন কেড়ে নিয়েছিলেন। গুলি লাগার পর সত্যেন খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন আহত অবস্থায়। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে আসার পর তিনি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন যেখান থেকে পরে সত্যেনের মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছিল। তেজেন্দ্র এরপর সোজা রেলস্টেশনে এসে রেলগাড়ী ধরে বেনারস হয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন পরের দিন।.

প্রকৃতপক্ষে বিনায়ক ওরফে সত্যেনের হত্যা মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন শঙ্করলাল এবং তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ। প্রথমজন ঘটনার সব বিবরণ শুনেছিলেন আর দ্বিতীয়জন ঘটনা সব দেখেছিলেন। এই দুজনের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করেছিল সমগ্র মামলাটি।

এই প্রসঙ্গে আপিল আদালতের কাছে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য কিনা। অবশ্য এই দুজন ছাড়াও একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল দায়রা আদালতে। বহু কাগজপত্রও দাখিল করা হয়েছিল মামলাটিতে। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে এবং কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র থেকে দায়রা আদালত এবং আপিল আদালতের কাছে একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে মতভেদ হওয়ায় দলের মধ্যে দুটি শিবির হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলির ফলে বিনায়ক ওরফে সত্যেনকে হত্যা করা হয়েছিল। দলের মধ্যে একদিকে ছিলেন সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী ও নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওরফে রাজু ওরফে শম্ভুদয়াল। অপর দিকে ছিলেন মামলার প্রধান সাক্ষী তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ, বিনায়ক রাও কাপলে এবং আরো কয়েকজন। দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায় বিনায়ককে হত্যা করা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল তেজেন্দ্রমোহনকে হত্যা করার। আসামী পক্ষ থেকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে দলাদলি ও দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘটনাবলী। দায়রা আদালতের আদেশে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী যে একজন বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন তাও অস্বীকার করা হয়নি আপিল আদালতের কাছে বক্তব্য রাখার সময়। একসময় সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর সাথে একই বিপ্লবী দলে ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওরফে শম্ভুদয়াল, রামপ্রসাদ ওরফে নরসিংপ্রসাদ, শঙ্করলাল, তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ ওরফে বাঙাল, মৃত বিনায়ক রাও কাপলে ওরফে সত্যেন ওরফে বড়বাবু। পরে দলের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ায় দলে ভাঙন ধরেছিল। অথচ ৯ই ফেব্রুয়ারীর আগে দলের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য দলের

সদস্যরা একাধিকবার মিলিত হয়েছিলেন আগ্রা, আলিগড়, বেনারস এবং লক্ষ্ণৌতে। সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী ৩০শে জানুয়ারী আগ্রায় এসে বিনায়কের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্য থেকে আরো দেখা যায়, আগ্রায় বিনায়কের সাথে কোন ব্যাপারে সুশীলচন্দ্রের মতবিরোধ ঘটেছিল। অবশ্য এই ব্যাপারে বলা হয়েছিল, বিনায়ককে হত্যার আগে তাদের মধ্যে বিবাদ মিটে গিয়েছিল।

দায়রা আদালতে সুশীলচন্দ্রকে সোপর্দ করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নর উত্তরে অভিযুক্ত সুশীলচন্দ্র বলেছিলেন, হত্যার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁর কিছু বলার নেই। দায়রা আদালতে সাক্ষ্যসাবুদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দায়রা জজের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে আসামী সুশীলচন্দ্র কেবলমাত্র বলেছিলেন, "আমি হত্যাকাণ্ডের সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির ছিলাম না" (I was not present when the murder took place)। এর পর বলেছিলেন, "হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না" (I know nothing about it)। এই দুই কথার পর তিনি জজ্ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তিনি জজ সাহেবের কোন প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। আরো বলেছিলেন, তিনি তাঁর পক্ষে কোন সাক্ষীও মানবেন না।

সুশীলচন্দ্র আপিল আদালতে নিজেই ইংরেজীতে লিখে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। এই দরখাস্তে তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন,—তিনি নিজে একজন বিপ্লবী দলের সদস্য। সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি তাঁর লিখিত দরখাস্তে আরো স্বীকার করে নিয়েছিলেন, বিনায়ক ওরফে সত্যেনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর পেশ করা দরখাস্তে উল্লেখ ছিল,—শঙ্করলাল, তেজেন্দ্রমোহনকেও তিনি আগে থেকেই চিনতেন। এর পরে সুশীলচন্দ্র আবার দ্বিতীয় দফায় একটি দরখাস্ত আপিল আদালতের কাছে পেশ করে বলেছিলেন, তাঁর পূর্বে লিখিত দরখাস্তে যে সব বক্তব্য বলা হয়েছিল আপিল আদালতে যেন সেই বক্তব্য তাঁর স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য না করা হয়। দ্বিতীয়ত, দরখাস্তটির বক্তব্য পড়ার পর আপিল আদালত সেইটি আপিলকারীর কৌঁসুলী পণ্ডিত জগৎ নারায়ণের হাতে দিয়ে সেইটি পড়ে তাঁকে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আপিল আদালত। পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ দরখাস্তটি পড়ে বিব্রত বোধ করেছিলেন। তাঁর মক্কেলের এই ধরনের দরখাস্ত সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।

আপিল আদালত এর পর দায়রা আদালতে দেওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্যসাবুদ নথিপত্র বিচার-বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করলেন।

মৃত বিনায়কের দেহের ময়নাতদন্ত করেছিলেন, লক্ষ্ণৌর সিভিল সার্জেনের সহকারী ডঃ মুসাহারফ্ আলী। তাঁর রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, বুলেটের আঘাতে বিনায়কের মৃত্যু হয়েছে। বুলেট ঢুকেছিল, বিনায়কের পেটের নীচের দিকে। তাঁর পাকস্থলী বুলেটের আঘাতে ফুটো হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও মৃতদেহের কপালে এবং দেহের আরও অন্যান্য জায়গাতেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়নি আততায়ীরা গুলি খুব কাছ থেকে না দূর থেকে করেছিল।

আসামী পক্ষ থেকে অবশ্য শেষপর্যন্ত সওয়াল করা হয়েছিল ধ্বস্তাধস্তির সময় দুর্ঘটনাবশত পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে বিনায়কের দেহে ঢুকে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। বিনায়ককে হত্যা করা হয়নি। এই ধরনের বক্তব্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা বিবেচনা করতে গিয়ে শঙ্করলাল ও তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা হয়েছিল। দেখা হয়েছিল দণ্ডিত আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন গ্রহণযোগ্য কিনা!

শঙ্করলাল তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, কিভাবে তিনি আলিগড়ে সুশীলচন্দ্র ওরফে থার্মমিটারের সংস্পর্শে এসেছিলেন। থার্মোমিটারের নির্দেশে তিনি ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে আলিগড় থেকে লক্ষ্ণৌতে এসেছিলেন। শঙ্করলালের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, আলিগড়ে স্কুলে পড়ার সময় নৃপেন্দ্রনাথের সাথেও তাঁর পরিচয় হয়। তিনি নৃপেন্দ্রনাথকে জানতেন শম্ভুদয়াল নামে। শম্ভুদয়াল শঙ্করলালের সাথে লক্ষ্ণৌতে বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ করেন। শম্ভুদয়াল ও থার্মমিটারের বন্ধুত্বের কথাও শঙ্করলাল জানতেন।

সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে হঠাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসেছিলেন। এই সময় সুশীলচন্দ্রের সাথে দুজন নতুন আগন্তুককে দেখা গিয়েছিল। এই দুজনের মধ্যে একজনের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল 'বড়বাবু' নামে, অপর জনের নাম বলা হয়েছিল 'বাঙাল'। এই 'বড়বাবু' নামের ব্যক্তিটি ছিলেন বিনায়ক রাও ওরফে সত্যেন এবং 'বাঙাল' ব্যক্তিটি ছিলেন তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ। শঙ্করলাল তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, 'বড়বাবু' (বিনায়ক রাও), 'বাঙাল' (তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ) এবং শম্ভুদয়াল (নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)—এই তিন বিপ্লবী দলের সদস্য একসময় লক্ষ্ণৌ থেকে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন। এই তিনজন লক্ষ্ণৌ থেকে কোথায় চলে গিয়েছিলেন শঙ্করলালের তা জানা ছিল না। শঙ্করলাল এর পর এই তিনজনকেই আবার ঘটনার দিন দেখেছিলেন একই সঙ্গে লক্ষ্ণৌ শহরে। শঙ্করলালের দেওয়া এই কাহিনীর সাথে তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্যের কিছু গরমিল ছিল।

শঙ্করলাল তাঁর সাক্ষ্যে আরো বলেছিলেন, ৯ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ঘটনার দিন সুশীলচন্দ্র শঙ্করলালকে বলেছিলেন, বড়বাবু (বিনায়ক রাও) দলের টাকা-পয়সা অন্যায়ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সুশীলচন্দ্র তাঁকে আরো বলেছিলেন, 'বড়বাবু' তাঁর সাথে থাকতে চাইলে 'বড়বাবু'কে যেন থাকতে দেওয়া না হয়। শম্ভুদয়ালের ক্ষেত্রে তাঁর উপর নির্দেশ ছিল শম্ভুদয়াল এলে তাঁর থাকা-খাওয়ার যেন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বিনায়ক হত্যার দিন কয়েক আগে সুশীলচন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থান ছেড়ে নতুন কোন কোয়ার্টারে উঠে গিয়েছিলেন। সুশীলচন্দ্রের নতুন ঠিকানার কথা শঙ্করলালকে জানানো পর্যন্ত হয়নি। অথচ সুশীলচন্দ্র প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর ডেরায় এসে প্রতিদিনের সংবাদপত্র খুঁটিয়ে পড়তেন। এইজন্য শঙ্করলাল নিজে প্রতিদিনের সংবাদপত্র কিনে আনতেন সুশীলচন্দ্রের জন্য।

৯ই ফেব্রুয়ারী সকালের দিকে শঙ্করলাল হোটেল থেকে খাবার খেয়ে বাড়ী ফিরছিলেন তখন অনুমান সকাল ৯টা হবে। তাঁর বাড়ীর সামনে এসে দেখেছিলেন, 'বড়বাবু' ও 'বাঙাল' ঘরের দরজার সামনে বসে আছেন। তাঁকে দেখে 'বড়বাবু' ও 'বাঙাল' দুজনেই সুশীলচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সুশীলচন্দ্রের নতুন কোয়ার্টারের ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন শঙ্করলালের কাছে। শঙ্করলালের সুশীলচন্দ্রের নতুন ঠিকানা জানা না থাকায় তিনি 'বড়বাবু' ও 'বাঙাল'কে সুশীলচন্দ্রের নতুন কোয়ার্টারের ঠিকানা জানাতে পারেননি। শঙ্করলাল অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন সুশীলচন্দ্রের সাথে এঁদের কোন ব্যাপারে মনোমালিন্য চলছে। এর পর তাঁদের দুজনের কথামত শঙ্করলাল কিছু খাবার এনে দিয়েছিলেন। খাবার খেয়ে শঙ্করলালের বাড়ী ছাড়ার আগে 'বড়বাবু' সুশীলচন্দ্রের নামে একটি চিঠি লিখে একটি খামে ভরে তাঁর কাছে দিয়ে বলেছিলেন, চিঠিটি খুব জরুরী। সুশীলচন্দ্রের সাথে দেখা হলে চিঠিটি যেন তাঁকে দেওয়া হয়। চিঠিটি শঙ্করলাল তাঁর বাক্সে রেখে

দিয়েছিলেন। মামলার তদন্ত কালে পুলিশ চিঠিটি নিয়ে গিয়েছিল। ঘটনার দিন সকাল অনুমান ১০টা নাগাদ 'বড়বাবু' ও 'বাঙাল' তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেদিন বেলা অনুমান ৩টা নাগাদ শঙ্করলাল যখন তাঁর স্কুলে ক্লাশ করছিলেন, সেই সময় শম্ভুদয়াল হঠাৎ স্কুলের কাছে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খবর পেয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে শঙ্করলাল শম্ভুদয়ালের সাথে দেখা করেছিলেন স্কুলের বাইরে। শম্ভুদয়ালের সাথে দেখা করতেই তিনি শঙ্করলালকে প্রশ্ন কবেছিলেন, 'বড়বাবু' ও 'বাঙালে'র সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা। শঙ্করলাল তখন তাঁকে সকালের সব ঘটনার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সকালের সব কথা জানার পর শম্ভুদয়াল কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গিয়েছিলেন। ঘটনার দিন স্কুলের ছুটি হওয়ার পর শঙ্করলাল অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও "লিডার" পত্রিকা কিনে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন। শঙ্করলাল ভেবেছিলেন, অন্যান্য দিনের মতই সুশীলচন্দ্র সংবাদপত্র পড়তে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে আসবেন, কিন্তু সুশীলচন্দ্র সেদিন এলেন না। সুশীলচন্দ্রের জন্য সন্ধ্যার সময় সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন তিনি এলেন না, তখন রাতের খাবার খেতে শঙ্করলাল হোটেলে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেলের দরজার সামনে দেখা গিয়েছিল সুশীলচন্দ্রকে। হোটেলে খেতে বসে বাইরে থেকে সুশীলচন্দ্রের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন শঙ্করলাল। সুশীলচন্দ্র খোঁজ নিচ্ছিলেন শঙ্করলাল হোটেলে খেতে এসেছেন কিনা। শঙ্করলাল সুশীলচন্দ্রের গলার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে আসতেই তাঁকে সুশীলচন্দ্র দ্রুত খাবার খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন। খাবার খেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিলেন শঙ্করলাল। সুশীলচন্দ্র তখন তাঁকে তাঁর সাথে এক জায়গায় যাওয়ার কথা বলায় শঙ্করলাল প্রশ্ন করেছিলেন কেন তাঁকে তখনই যেতে হবে। তখন সুশীলচন্দ্র বলেছিলেন, "আমরা 'বড়বাবু'কে গুলি করেছি কিন্তু তিনি তখনও মারা যাননি। কিন্তু আমাদের পিস্তল ফেলে এসেছি ঘটনাস্থলে। লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে এই প্রসঙ্গে সুশীলচন্দ্রের বক্তব্য হিসেবে বলা হয়েছিল— 'We have shot Bara Babu but he is not dead and we have lost our Pistol, there. You should not go to house lest he kill you."

এই অবস্থায় শঙ্করলালকে বাড়ী ফিরতে বারণ করেছিলেন সুশীলচন্দ্র। কারণ সন্দেহ ছিল, বাড়ী ফিরলে শঙ্করলালকে মেরে ফেলা হতে পারে। এর পর সুশীলচন্দ্র শঙ্করলালকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর মৌলভীগঞ্জের নতুন কোয়ার্টারে ফিরেছিলেন।

তদন্তকালে শঙ্করলাল পুলিশ অফিসার মিঃ সন্ডস্‌কে সুশীলচন্দ্রের মৌলভীগঞ্জেব কোয়ার্টারটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই কোয়ার্টারটি থেকেই ২২শে ফেব্রুয়ারী সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী রাতে যখন সুশীলচন্দ্র হোটেলে শঙ্করলালের সাথে দেখা করেছিলেন তখন সুশীলচন্দ্রকে খুব চিন্তিত ও ঘাবড়ে গিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল। এই ব্যাপারে শঙ্করলাল তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন—"সুশীলচন্দ্র ঘাবরায়া হুয়া"।

সুশীলচন্দ্র সাধারণত মাথায় টুপি পরে থাকতেন। হোটেলে শঙ্করলালের সাথে দেখা হওয়ার সময় সুশীলচন্দ্রের মাথায় কোন টুপি ছিল না। তাঁর মাথা ও মুখ ঢাকা ছিল গলাবন্ধ বা চাদর দিয়ে। সুশীলচন্দ্রের সাথে তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছে শঙ্করলাল সেখানে দেখেছিলেন শম্ভুদয়ালকে। শম্ভুদয়াল খুব রেগে ছিলেন। সুশীলচন্দ্র শম্ভুদয়ালকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, 'রামপ্রসাদ কোথায়?' উত্তরে শম্ভুদয়াল বলেছিলেন, তিনি জানেন না রামপ্রসাদ কোথায়

গিয়েছেন। সুশীলচন্দ্র শম্ভুদয়ালের উত্তর শুনে বলেছিলেন, রামপ্রসাদ নিশ্চয়ই তাঁদের সাথে বেইমানি করে 'বড়বাবু'র দলে যোগ দিয়েছেন।

এই সব কথাবার্তা যখন সুশীলচন্দ্রের ঘরে বসে চলছিল, সেই সময় হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরের দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শুনে সুশীলচন্দ্র চট্ করে হাতে একটি রিভলভার তুলে নিয়েছিলেন। শম্ভুদয়াল ও শঙ্করলালের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল লাঠি। দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে ভিতর থেকে তাঁরা চেঁচিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—বাইরে কে? বাইরে থেকে উত্তর ভেসে এসেছিল—'আমি রামপ্রসাদ একা এসেছি'। তখন দরজা খুলে দিতে রামপ্রসাদ এসে ঘরে ঢুকেছিলেন। রামপ্রসাদকে দেখে সুশীলচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—'যদি তোমার সাথে বড়বাবুকে দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম'। সুশীলচন্দ্রের এই ধরনের কথাবার্তা থেকে বোঝা গিয়েছিল বড়বাবু বেঁচে আছেন না মারা গিয়েছেন তখনও পর্যন্ত তাঁর মনে সন্দেহ ছিল।

কিছু কথাবার্তার পর রামপ্রসাদ বলেছিলেন, সেদিন সকাল থেকে বড়বাবু ও বাঙাল কিভাবে সারাদিন সুশীলচন্দ্র ও শম্ভুদয়ালকে লক্ষ্ণৌ শহরে খুঁজে বেরিয়েছিলেন। রামপ্রসাদকেও তাঁদের সাথে সারাদিন থাকতে হয়েছিল। ঘটনাস্থলে প্রথম গুলিটির আওয়াজ শুনেই তিনি সকলের নজর এড়িয়ে সরে পড়েছিলেন। এর পরের ঘটনা শঙ্করলাল শুনেছিলেন সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়ালের কাছে। সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়াল তখন বলেছিলেন, তাঁদের ধারণা হয়েছিল বড়বাবু এবং বাঙাল রামপ্রসাদকে নিশ্চয়ই তাঁদের দলে টেনে নিয়েছেন। শঙ্করলাল এইবার সুশীলচন্দ্র ও শম্ভুদযালের কাছ থেকে ঘটনার ছবিটি জানতে পেরেছিলেন।

সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়াল ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর রামপ্রসাদের খোঁজ করছিলেন। রামপ্রসাদকে তাঁরা দেখতে পান একটি সরু গলির মধ্যে। এই সরু গলিটি ছিল শঙ্করলালের বাড়ীর পাশে। রামপ্রসাদ বসেছিলেন বাঙাল এবং বড়বাবুর সাথে। শম্ভুদয়াল তাঁদের তিনজনের কাছে এগিয়ে যেতেই ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। বড়বাবু শম্ভুদয়ালকে ধ্বস্তাধস্তির সময় চেপে ধরেছিলেন। এই অবস্থায় শম্ভুদয়াল গুলি ছুঁড়েছিলেন তাঁর কোমর থেকে পিস্তল বের করে। গুলি লাগা অবস্থায় বড়বাবু বাঙালকে সঙ্গে নিয়ে শম্ভুদয়ালকে তাড়া করেছিলেন। কারণ গুলি করার পর শম্ভুদয়াল দৌড়ে পালাচ্ছিলেন। ছুটে পালাবার সময় শম্ভুদয়াল পা হড়কে মাটিতে পড়ে যাওয়ায় তাঁর পিস্তলটি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি কোথাও পড়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে এই সময় সুশীলচন্দ্র বাঙালকে লক্ষ্য করে পর পর তিনবার গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনবারই তাঁর পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। বাঙাল তখন সুশীলচন্দ্রকে ধরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। সেই সময় সুশীলচন্দ্রের হাত থেকে তাঁর পিস্তলটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। পিস্তলটি তিনি তুলে আনতে না পারায় তাঁর পিস্তলটিও সরু গলিটির মধ্যে পড়ে ছিল। এই সব ঘটনার পর সুশীলচন্দ্র শঙ্করলালের খোঁজ করতে হোটেলে এসেছিলেন। শঙ্করলালকে হোটেলে পেয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছিলেন।

শঙ্করলাল বলেছিলেন, সুশীলচন্দ্রের কোয়ার্টারে এসে শম্ভুদয়ালকে দেখেছিলেন। তখন তাঁর পরনের ধুতিতে রক্তের দাগ ছিল। সুশীলচন্দ্রের গায়ের চাদরেও রক্তের দাগ লেগে ছিল। বিনায়ক হত্যার কয়েকদিনের মধ্যেই শঙ্করলালকে রামপ্রসাদের সাথে বেনারস পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শঙ্করলালের সাক্ষ্য থেকে আদালতের বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি শঙ্করলাল নিজে ঘটনাস্থলে ছিলেন না বা ঘটনাও দেখেননি। কিন্তু বিনায়ক হত্যার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনেছিলেন ঘটনার দিন রাতেই সুশীলচন্দ্রের কোয়ার্টারে আসার পর।

তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ ওরফে বাঙাল ছিলেন চোখে দেখা সাক্ষী। তিনি নিজে ছিলেন ঘটনাস্থলে। তাঁর সাথেও শম্ভুদয়াল এবং সুশীলচন্দ্রের ধ্বস্তাধস্তি হয়েছিল ঘটনাস্থলে। তাঁর সামনেই বিনায়ক ওরফে সত্যেন ওরফে বড়বাবুকে গুলি করা হয়েছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত অনুমান ৮টার সময় শঙ্করলালের বাড়ির পাশের সরু গলিতে।

তেজেন্দ্রমোহন দায়রা আদালতে সাক্ষ্য দিতে উঠে বলেছিলেন—তিনি ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন। বড়বাবুও ছিলেন তাঁর সাথে। তাঁদের সাথে শম্ভুদয়াল ও রামপ্রসাদকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সুশীলচন্দ্র। তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছিল শম্ভুদয়ালের সাথে তিনি ও বড়বাবু আলিগড় এবং আগ্রায় এসেছিলেন দলের আলোচনা সভায় যোগ দিতে। আগ্রায় ৩০শে জানুয়ারী তাঁদের সাথে সুশীলচন্দ্রের (কেমিস্ট) একটি আলোচনা সভা হয়েছিল। আগ্রার এই আলোচনা সভায় সত্যেন ওরফে বড়বাবুর সাথে নীতির প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ হয়েছিল সুশীলচন্দ্রের।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শম্ভুদয়াল ওরফে রাজু আলিগড় থেকে আগ্রায় এসেছিলেন। আগ্রায় সুশীলচন্দ্রের হয়ে সত্যেন ওরফে বড়বাবুকে অনুরোধ করেছিলেন, সুশীলচন্দ্রের সাথে মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। সত্যেন এই ব্যাপারে শম্ভুদয়ালের সাথে আলোচনা পর্যন্ত করতে চাইলেন না। এমন কি সত্যেনকে লেখা সুশীলচন্দ্রের চিঠিটিও নিতে অস্বীকার করলেন। শম্ভুদয়ালের হাত দিয়ে আগ্রায় সত্যেনের উদ্দেশে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন সুশীলচন্দ্র। আগ্রা থেকে সত্যেনের রূঢ় ব্যবহারের কথা জানিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ সেই দিনই একটি চিঠি লিখেছিলেন শম্ভুদয়াল লক্ষ্ণৌতে সুশীলচন্দ্রের কাছে। চিঠিটি পরে লক্ষ্ণৌ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষ থেকে এগ্‌জিবিট করা হয়েছিল। শম্ভুদয়ালের চিঠিটিতে উল্লেখ ছিল প্রভু দাসের (সত্যেনের আর একটি ছদ্মনাম) মতামত থেকে তাঁর মনে হয়েছে সত্যেন তাঁর নিজের মত থেকে সরতে চাইছেন না বা বিরোধ মেটানোর ব্যাপারেও কোনভাবে আগ্রহী নন। এই অবস্থায় সুশীলচন্দ্রের একবার আগ্রায় আসা প্রয়োজন। শম্ভুদয়াল তাঁর চিঠিতে আরো উল্লেখ করেছিলেন, প্রভু দাসের সাথে সুশীলচন্দ্রের বিরোধ মিটিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। তেজেন্দ্রমোহন সম্বন্ধে শম্ভুদয়াল চিঠিতে সুশীলচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন দলের মধ্যে বাঙাল ডাবল রোল খেলছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। সত্যেনের সাথে সুশীলচন্দ্রের বিরোধ বাঙালের জন্যই মিটছে না।

এই চিঠিটি থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল, সত্যেন ও সুশীলচন্দ্রের মধ্যে দু দলে মনোমালিন্য বা বিরোধ চলছিল। সত্যেনের দিকে ছিলেন তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ ওরফে বাঙাল। অপরদিকে সুশীলচন্দ্রের দিকে ছিলেন শম্ভুদয়াল ওরফে নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

তেজেন্দ্রমোহন তাঁর সাক্ষ্যতে দায়রা আদালতে বলেছিলেন, নৃপেন্দ্র ওরফে শম্ভুদয়াল ওরফে রাজু আবার ৮ই ফেব্রুয়ারী আগ্রায় সত্যেনের সাথে দেখা করেছিলেন। কিছু কথাবার্তার পর চলে গিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর উদ্দেশে। শম্ভুদয়াল সত্যেনের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর দেখা গেল সত্যেনের বিছানার তলায় রাখা একটি মাউসের পিস্তল এবং কিছু তাজা

কার্তুজ পাওয়া যাচ্ছে না। পিস্তল ও কার্তুজ না পাওয়া যেতে সেইদিন রাতেই সত্যেন ও তেজেন্দ্রমোহন বুঝতে পেরেছিলেন, শম্ভুদয়াল ওরফে রাজু পিস্তলটি ও কার্তুজ নিয়ে পালিয়েছেন। সেই রাতেই শম্ভুদয়ালের খোঁজে সত্যেনের সাথে তিনি আগ্রা থেকে লক্ষ্ণৌর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। তাঁরা ৯ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা নাগাদ লক্ষ্ণৌ পৌঁছেছিলেন। এর পর সত্যেন ও তেজেন্দ্রমোহন গিয়েছিলেন শঙ্করলালের বাড়িতে। তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্যের এই সব ঘটনার সাথে শঙ্করলালের সাক্ষ্যের মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

শঙ্করলালের বাড়িতে এসে তাঁরা শঙ্করলালের কাছে জানতে চেয়েছিলেন শম্ভুদয়াল ও সুশীলচন্দ্রকে তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁদের দুজনকে কোথায় পাওয়া যাবে? শঙ্করলাল সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়ালের কোন খোঁজ-খবর দিতে না পারায় কিছু জলযোগ করে তাঁরা তখনকার মত শঙ্করলালের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। এর পর তাঁরা রামপ্রসাদকে খুঁজছিলেন সুশীলচন্দ্রের খোঁজ-খবর পাওয়ার জন্য। রামপ্রসাদকে তাঁরা পেয়েও গিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের সাথে দেখা হতে তিনি সুশীলচন্দ্র বা শম্ভুদয়ালের খোঁজ-খবর দিতে না পারায় রামপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে সত্যেন ও তেজেন্দ্রমোহন প্রায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছিলেন তাঁদের অনুসন্ধানে। ইচ্ছে করেই রামপ্রসাদ সুশীলচন্দ্রের কোয়ার্টারের ঠিকানা জানাননি সত্যেনকে। সন্ধ্যার সময় রামপ্রসাদ সহ সত্যেন ও তেজেন্দ্রমোহন আবার এসেছিলেন শঙ্করলালের বাড়ীর কাছাকাছি একটি সরু গলির মধ্যে। সেখানে তাঁরা তিনজন অপেক্ষা করছিলেন সুশীলচন্দ্রের জন্য। সত্যেন জানতেন, সন্ধ্যার সময় সুশীলচন্দ্র শঙ্করলালের বাড়ীতে আসেন। কিছুক্ষণ পর শঙ্করলালের বাড়ির সামনের গলিটিতে এসে পৌঁছেছিলেন সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়াল। অন্ধকার সরু গলিটি দিয়ে সত্যেন ও তেজেন্দ্রমোহনের কাছাকাছি আসতেই সত্যেন ও তেজেন্দ্রমোহন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়ালের উপর। শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি—যার শেষ পরিণতি ছিল গুলির আঘাতে বিনায়ক ওরফে সত্যেনকে হত্যা।

একদিকে সত্যেনের সাথে ধ্বস্তাধস্তি চলছিল শম্ভুদয়ালের। অপরদিকে সুশীলচন্দ্রের সাথে তেজেন্দ্রমোহনের। সুশীলচন্দ্র তেজেন্দ্রমোহনকে লক্ষ্য করে তিনবার গুলি ছুঁড়েছিলেন তাঁর পিস্তল বা রিভলভার থেকে, কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হওয়ায় তেজেন্দ্রমোহন বেঁচে গিয়েছিলেন। এর পর সুশীলচন্দ্র ও শম্ভুদয়াল সরু গলিটি থেকে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা তাঁদের পিস্তল ও রিভলভার ফেলে এসেছিলেন গলির মধ্যে ঘটনাস্থলে।

সুশীলচন্দ্র এবং শম্ভুদয়াল পালিয়ে যেতে তেজেন্দ্রমোহন আহত সত্যেনের কাছে এসে দেখলেন তাঁর শরীরে গুলি লেগেছে। তিনি মাটিতে পড়ে আছেন। উঠতে পারছেন না। তেজেন্দ্রমোহন ভীষণভাবে আহত সত্যেনকে মাটি থেকে তুলবার চেষ্টা করলেন। আহত সত্যেন তেজেন্দ্রমোহনের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার পর ২/৩ পা এগিয়েই মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। সত্যেনের অবস্থা বুঝতে পেরে তেজেন্দ্রমোহন সুশীলচন্দ্র ও শম্ভুদয়ালের ফেলে যাওয়া পিস্তল ও রিভলভার দুটি সঙ্গে করে নিয়ে আহত সত্যেনকে সেখানেই রেখে লক্ষ্ণৌ রেল স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। ধ্বস্তাধস্তির সময় তাঁর পায়ের জুতোজোড়া খুলে পড়েছিল ঘটনাস্থলে। তাই স্টেশনের পথে তাঁর পায়ে জুতো ছিল না। তাঁর মাথার টুপিটিও পড়েছিল একই জায়গায়। এই অবস্থায় স্টেশনের পথে তেজেন্দ্রমোহন একটি দোকান থেকে একজোড়া জুতো কিনে পায়ে পরে নিয়েছিলেন।

সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তেজেন্দ্রমোহন তাঁর ব্যবহার করা টুপিটি আলামত হিসেবে আদালতে

দেখেছিলেন। টুপিটি তিনি শনাক্ত করেছিলেন সাক্ষ্য দেওয়ার সময়। তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে সমগ্র ছবিটি তুলে ধরেছিলেন তাঁর সাক্ষ্যের মাধ্যমে। তিনি ঘটনার দিন রাতেই লক্ষ্ণৌ রেলওয়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন পরের দিন। তেজেন্দ্রমোহন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতা থেকে ৩রা জুলাই।

আব্দুল ওয়হব ছিলেন সরকার পক্ষের সাক্ষী। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌর একটি জুতোর দোকানের মালিক। তিনি তাঁর দোকানের খাতাপত্র আদালতের কাছে পেশ করে বলেছিলেন (তেজেন্দ্রমোহনকে দেখিয়ে) এই ভদ্রলোক ৬ টাকা দিয়ে ৯ই এপ্রিল রাতে তাঁর দোকান থেকে একজোড়া 'সু' কিনেছিলেন।

আপিল আদালতে আপিলকারীর পক্ষে তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং শঙ্করলালের সাক্ষ্য নিয়ে নানারকম সমালোচনা করে বক্তব্য রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এই দুজনের সাক্ষ্যর মধ্যে নানা ব্যবধান ও ব্যতিক্রম থাকায় এই দুজনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে আদালতের কোন সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসংগত হবে না। অবশ্য আপিলকারীর কৌসুলীর এই বক্তব্য আপিল আদালত মেনে নেননি। আপিল আদালত বরং শুনানীর পর সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এই দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবধান থাকলেও এই দুজনের সাক্ষ্য আদালতের পক্ষে অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। আপিল আদালত আরো বলেছিলেন, দণ্ডিত আসামীর পক্ষে কখনই বলা হয়নি শঙ্করলাল এবং তেজেন্দ্রমোহন ঘোষ পুলিশের শেখানো অনুযায়ী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আদালতের কাছে এমন কোন প্রমাণও ছিল না যে এই দুজন সাক্ষী মিথ্যা করে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

আপিল আদালত শঙ্করলালের সাক্ষ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রথমবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিতে গিয়ে শঙ্করলাল অবশ্যই সত্য ঘটনা চেপে গিয়েছিলেন। কারণ দাদা ভোজরাজের কাছে তিনি বলে ফেলেছিলেন, তাঁর সাথে বিপ্লবী দলের কোন সম্পর্ক নেই। সেই কারণেই তিনি সত্য গোপন করে প্রথমবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দিয়ে বলেছিলেন, তিনি বিনায়ক হত্যার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। আপিল আদালত অবশ্য বলেছিলেন, সরকার পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে আপিল আদালত বলেছিলেন, শঙ্করলালের ৭ই এপ্রিলের জবানবন্দির সাথে তাঁর দেওয়া পরবর্তী জবানবন্দির কিছু অসংগতি থাকলেও তাঁর সাক্ষ্যের সবদিক বিচার-বিবেচনা করার পর মেনে নিয়েছিলেন। তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্যের মধ্যে কিছু অসংগতি ছিল। সবদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে আপিল আদালত তেজেন্দ্রমোহনের সাক্ষ্যও নির্ভরযোগ্য বলে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

ঘটনার পরেই স্থানীয় ব্যক্তিরা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সংবাদ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই বলেছিলেন, তাঁরা তিনবার গুলির আওয়াজ শোনার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ একজন আহত লোককে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। আপিল আদালত বলেছিলেন, এইসব স্থানীয় লোকজনের মিথ্যাকথা বলার কোন কারণ ছিল না। স্বভাবতই স্থানীয় লোকজন যাঁরা সাক্ষী হিসেবে মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের সাক্ষ্য আপিল আদালতও বিশ্বাস করেছিলেন। মিঃ গোল্ডি এবং মিঃ বিগনির সাক্ষ্যও আপিল আদালত বিশ্বাসযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। মামলার সাক্ষ্যসাবুদ, আপিলকারীর কৌসুলীর বক্তব্য এবং সরকার পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে আউধ জুডিসিয়াল কমিশনার কোর্ট দায়রা

আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে আপিলের রায় দিয়েছিলেন ১৯১৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। আপিল আদালতের দুজন বিচারক ছিলেন প্রধান বিচারপতি লিন্ডসে এবং বিচারপতি স্টুয়ার্ট।

প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল থাকার রায় শুনে সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর মত বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে যাওয়ার আগে দেশবাসী এবং পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে হয়ত বলে থাকবেন—

বন্ধু, আজকে বিদায়!
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা কোরো।

অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা

৮ই মে ১৯৩৪ সাল। বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ডারসন এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের লেবং রেস কোর্স মাঠে। ঘোড়দৌড় চলছিল লেবং রেস কোর্সে। স্বয়ং গভর্নর রেস কোর্সে ঘোড়দৌড় দেখতে আসায় বহু গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন সেদিন লেবং রেস কোর্সে। পুলিশ বাহিনীও বিশেষ ভাবে সতর্ক ছিলেন গভর্নর স্যার অ্যান্ডারসন রেস কোর্সে স্বয়ং উপস্থিত থাকায়। তখন অনুমান বেলা ৩টা। ঘোড়দৌড় শেষ করে রেসের ঘোড়াগুলিকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল নির্দিষ্ট জায়গায়।

স্যার অ্যান্ডারসন সাহেব বসেছিলেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ আসনে। হঠাৎ দেখা গেল, একজন লোক ১০ ফুট দূর থেকে স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন লোক অনুমান ৬ ফুট দূর থেকে তাঁর হাতে-থাকা পিস্তল থেকে গুলি করলেন বাংলার গভর্নরকে লক্ষ্য করে। গভর্নরের আশেপাশের লোকজনেরা পরপর দুটি গুলির শব্দে হকচকিত হয়ে পড়লেন। সৌভাগ্যবশত স্যার অ্যান্ডারসনের শরীরে একটিও গুলি স্পর্শ করল না। পুলিশ অফিসার সহ উপস্থিত লোকজন সকলেই বিস্ময়বোধ করলেন হঠাৎ রেস কোর্স মাঠের এই ধরনের ঘটনায়। এত কাছ থেকে গুলি করা সত্ত্বেও সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় স্যার অ্যান্ডারসন সাহেব আশ্চর্যজনক ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন কোন্ দৈবশক্তিতে। ঘটনার বিহ্বলতা কাটতে বোঝা গেল বিপ্লবীরা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন বাংলার গভর্নরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। বিপ্লবীদের অত কাছ থেকে ছোঁড়া গুলি দুটোতে হয়ত অ্যান্ডারসন সাহেবের মৃত্যুর ঠিকানা লেখা ছিল না। বোধ হয় তাই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন লেবং রেস কোর্সের মাঠে অত সামনে থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য করে গুলি করা সত্ত্বেও।

স্যার অ্যান্ডারসনের আসনের পাশে সেই সময় দাঁড়িয়েছিলেন মিস্ বেনলা থর্টন নামে এক মহিলা। দুটি গুলির একটি এসে লেগেছিল তাঁর পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বুঝতে পেরে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা রাইফেলধারী দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিলেন। স্যার অ্যান্ডারসনের পাশের দুটি আসনে বসেছিলেন মিঃ ট্যান্ডি গ্রিন এবং বারোয়ারীর রাজা। স্যার অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে পিস্তলধারী দুজনকে গুলি ছুঁড়তে দেখে মিঃ ট্যান্ডি গ্রিন ও বারোয়ারীয় রাজাসাহেব সময় বিলম্ব না করে নিজেদের আসন থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দুষ্কৃতকারী দুজনের উপর। তাঁদের এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য ছিল পিস্তলধারীরা যেন কোনভাবেই তৃতীয় বার তাঁদের হাতের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ডারসনের জীবন সংশয় করতে না পারেন।

দুজন পিস্তলধারী ব্যক্তিই পুলিশের গুলিতে আহত হলেন। আহত অবস্থায় তাঁদের ধরে ফেলা হ'ল লেবং রেস কোর্সের মাঠে। অল্প সময়ের মধ্যেই আহত পিস্তলধারী দুজনকে নিয়ে যাওয়া হ'ল স্থানীয় হাসপাতালে।

অ্যান্ডারসন হত্যার প্রয়াস ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা রুজু করা হল।

ঘটনার পরের দিন অথবা তার পরের দিন আহত দুজনই স্বীকারোক্তি করলেন। তাঁদের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করানো হল ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে। তাঁদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেল, তাঁরা দুজনই ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল লেবং রেস কোর্স মাঠে বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার প্রচেষ্টা নেওয়া। সেই পরিকল্পনা মত তাঁরা দুজনেই পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন অ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আহত বিপ্লবীদের স্বীকারোক্তি থেকে আরো জানা গেল, বিপ্লবীদের মধ্যে কারা কারা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের নামগুলি জানার পর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ৭ জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই ৭ জন অভিযুক্তর মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ওরফে নরেশ চৌধুরী, উজ্জ্বলা মজুমদার ওরফে অমিয়া ওরফে মলয়া ওরফে মলিনা দেবী ওরফে লীলা, মধুসূদন ব্যানার্জী ওরফে অমিয় ব্যানার্জী ওরফে সুনীল সেন, সুকুমার ঘোষ ওরফে লল্টু, ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওরফে সমরজিৎ ব্যানার্জী, সুশীলকুমার চক্রবর্তী ওরফে অজিতকুমার ধর।

স্যার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটির তদন্তকালীন অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জী এবং উজ্জ্বলা মজুমদার। অবশ্য মামলাটির বিচারকালীন অবস্থায় উজ্জ্বলা তাঁর পূর্বে দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেছিলেন। মনোরঞ্জনও তাঁর পূর্বে দেওয়া স্বীকারোক্তির বেশ কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করেছিলেন পরবর্তী সময়ে। কিছু কিছু জায়গা অস্বীকারও করেছিলেন।

উপরোক্ত ৭ জন অভিযুক্তকে বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। এই স্পেশাল ট্রাইবুনালটি অভিযুক্তদের বিচারের জন্য দার্জিলিংয়ে বসেছিল ১৯৩৪ সালে। স্পেশাল ট্রাইবুনালে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলাটির শুনানী চলেছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। এই মামলাটির ইংরেজী নামাকরণ করা হয়েছিল লেবং আউটরেজ্ (Lebong Outrage)।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল মামলাটির রায় দিয়েছিলেন ১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার।

বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার ছিলেন একটি বছর উনিশের যুবতী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল হত্যা ষড়যন্ত্র এবং বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র রাখার। বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনাল দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ। মধুসূদন ব্যানার্জীর বিরুদ্ধেও ছিল হত্যা ষড়যন্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ। মধুসূদন ব্যানার্জী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়

তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। সুকুমার ঘোষের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। সুশীলকুমার চক্রবর্তীকে হত্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় ১২ বছর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল।

দার্জিলিংয়ের স্পেশাল ট্রাইবুনালের দেওয়া মৃত্যু দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন ভবানী, রবীন্দ্র এবং মনোরঞ্জন। তাছাড়া স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন উজ্জ্বলা, মধুসূদন এবং সুকুমার। সুশীলকুমার চক্রবর্তী কোন আপিল দায়ের করেন নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, লেবং রেস কোর্সে পিস্তল থেকে অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলেন ভবানী ও রবীন্দ্র। দুজনের নিশানাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।

উপরোক্ত ৬টি আপিলের চরিত্র থেকে বোঝা যায়, মৃত্যুদণ্ডের আসামী ৩ জন স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল দায়ের করেননি। তাঁরা ৩ জন কেবলমাত্র দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ তাঁদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ) কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবুনালও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ৩ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দেওয়া আদেশ কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আইনগত দিক থেকে হাইকোর্টের বিনা অনুমোদনে মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করা যায় না।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ভবানী, রবীন্দ্র এবং মনোরঞ্জনের পক্ষে হাইকোর্টে আপিলে সওয়াল করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীসুধাংশুশেখর মুখার্জী, শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত এবং ফরাৎ আলী। কিন্তু অপর ৩ জন দণ্ডিত আসামী উজ্জ্বলা, মধুসূদন এবং সুকুমার আপিল হাইকোর্টে তাঁদের পক্ষে কোন আইনজীবী নিযুক্ত করতে না পারায় আপিল বেঞ্চের অনুরোধে শ্রীসুধাংশুশেখর মুখার্জী এবং শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে এই ৩ জনের পক্ষে আপিলের সওয়াল করে দিয়েছিলেন। হাইকোর্টের অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে মধুসূদন, উজ্জ্বলা এবং সুকুমারের আপিলে সওয়াল করায় হাইকোর্ট শ্রীমুখার্জী এবং শ্রীলাহিড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

হাইকোর্টের মামলার নথি থেকে দেখা যায়, ১৯৩২ সালে দণ্ডিত আসামী উজ্জ্বলা মজুমদারের পিতা সুরেশ মজুমদার বাস করতেন ঢাকায়। তখন উজ্জ্বলার বয়েস ছিল মাত্র ১৭। সুরেশ মজুমদারের পুত্রের নাম ছিল গোপাল। উজ্জ্বলার থেকে গোপাল বছর দুয়েকের ছোট ছিল। সুরেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী অর্থাৎ উজ্জ্বলা ও গোপালের মা এইসময় মারা গিয়েছিলেন। সুরেশ মজুমদার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। উজ্জ্বলার সৎ মা বয়সে উজ্জ্বলার থেকে মাত্র বছর দুয়েকের বড় ছিলেন। সুরেশবাবু কলকাতায় রিক্সার ব্যবসা করতেন। এ ছাড়াও তাঁর নানা জায়গায় কিছু সম্পত্তি ছিল। সম্পত্তির তদারকির জন্য নানা জায়গায় তাঁকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হত। এইসব কারণে সুরেশবাবু বেশীর ভাগ সময় ঢাকায় থাকতে না পারায় উজ্জ্বলা এবং গোপালের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারতেন না। সুরেশবাবুর মেয়ে উজ্জ্বলা এবং ছেলে গোপাল দুজনেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩২ সালে উজ্জ্বলার জন্য একজন প্রাইভেট শিক্ষকের খোঁজ করছিলেন সুরেশবাবু। উদ্দেশ্য ছিল উজ্জ্বলা যাতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়

ভাল ফল করতে পারেন তার জন্য তাঁকে সাহায্য করা। সুরেশবাবুর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে সুকুমার ঘোষ (পরে মামলায় একজন দণ্ডিত আসামী) উজ্জ্বলাকে পড়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সুকুমার ঘোষ ভাল সংস্কৃত জানতেন না বলে সুরেশবাবু সুকুমার ঘোষকে উজ্জ্বলার প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করতে চাইলেন না। তখন সুকুমার ঘোষ অবস্থা বুঝতে পেরে মধুসূদন ব্যানার্জীকে প্রাইভেট টিউটর হিসেবে উজ্জ্বলাকে পড়াবার জন্য ঠিক করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মধুসূদন ব্যানার্জী নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন অমিয় ব্যানার্জী নামে। যে কোন কারণেই হোক্ মধুসূদন ব্যানার্জী নিজের আসল পরিচয় গোপন করেছিলেন। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী (পরে মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী) ছিলেন মধুসূদন ব্যানার্জীর ভ্রাতা। সুরেশবাবুর পরিবারের সকলের সাথে মনোরঞ্জনের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য মনোরঞ্জন তাঁর আসল নাম গোপন করে সকলের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'নরেশ' নামে।

মধুসূদন উজ্জ্বলাকে মাস ছয়েক পড়িয়েছিলেন তাঁর প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু প্রায়ই গরহাজির থাকায় সুরেশবাবু মধুসূদনকে ছাড়িয়ে দিলেন উজ্জ্বলাকে মাস ছয়েক পড়ানোর পরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মধুসূদনকে ছাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সুকুমার এবং তাঁর ভাই মনোরঞ্জনকে নিয়ে মাঝে মধ্যেই সুরেশবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। প্রথম প্রথম সুরেশবাবু উপরোক্ত ৩ জনের তাঁর বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াতের কারণ বুঝতে পারেননি। সম্ভবত ১৯৩৩ সালে তিনি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর কন্যা উজ্জ্বলা দুটি বই সব সময় একাগ্র মনে পড়ত। বই দুখানি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, এই বই দুখানিই ছিল বিপ্লবী বই। নানা ধরনের সশস্ত্র বিপ্লবের কথা লেখা ছিল বই দুটিতে। সুরেশবাবু বিরক্ত হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে উজ্জ্বলার এই ধরনের বিপ্লবী বই পড়ায়। তিনি উজ্জ্বলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই ধরনের বিপ্লবী বই উজ্জ্বলা কার কাছ থেকে পেয়েছিল? বাবার প্রশ্নের উত্তরে উজ্জ্বলা বলেছিলেন, তাঁর গৃহশিক্ষক মধুসূদন ব্যানার্জী তাঁকে বই দুটি পড়তে দিয়েছিলেন। সুরেশবাবু উজ্জ্বলার উত্তর শুনে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে বই দুখানি নিজেই মেয়ের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই ধরনের বই উজ্জ্বলাকে পড়তে দেওয়া মধুসূদনের মোটেই বিবেচনাপ্রসূত কাজ হয়নি। মেয়েকে বলেছিলেন, মধুসূদনকে উজ্জ্বলা যেন তাঁদের এ বাড়ীতে আসতে বারণ করে দেয়। এর পর সুরেশবাবু নিজের কাজে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। সুরেশবাবু যখন কলকাতায় থাকতেন, তাঁর অবর্তমানে মধুসূদন, মনোরঞ্জন এবং সুকুমার আগের মতই উজ্জ্বলাদের ঢাকার বাড়ীতে যাতায়াত করতেন।

পরে অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর মধুসূদন এবং মনোরঞ্জন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিলেন, তাঁরা দুজন এবং সুকুমার ওরফে লল্টু ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। তাঁদের বিপ্লবী মন্ত্র ছিল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের আমলাদের হত্যা করা। সুকুমারকে দিয়ে সরকার পক্ষে স্বীকারোক্তি করানোর চেষ্টা করলেও তিনি কোন স্বীকারোক্তি করতে অস্বীকার করেছিলেন।

ফিরে আসা যাক উজ্জ্বলা ও তাঁর ভাই গোপালের কথায়। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ মাসে গোপাল এবং উজ্জ্বলা দুই ভাইবোন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে বসেছিলেন এবং ভাইবোন দুজনেই সেই বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। পরীক্ষায় পাশ করার পর উজ্জ্বলা এবং গোপাল দুজনেই আস্তে আস্তে বিপ্লবী কাজকর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। পরে অবশ্য বিপ্লবী দলের সদস্য হয়েছিলেন।

মার্চের শেষাশেষি কিংবা এপ্রিলের গোড়ার দিকে সুকুমার পৃথ্বীশ নামে একটি যুবকের সাথে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিলেন। এই পৃথ্বীশও ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। সুকুমার ও পৃথ্বীশ দুজনে মিলে একটি পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল গুলি করে দেশের শত্রু নিধন। এইজন্য পৃথ্বীশকে শিলং যেতে বলা হয়েছিল তাঁদের পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পৃথ্বীশের শিলং যাওয়া হয়ে উঠল না। হঠাৎ যে কোন কারণেই হোক পৃথ্বীশের মত পাল্টে যাওয়ায় তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পৃথ্বীশের মত পাল্টে যাওয়ায় সুকুমারের পক্ষে পৃথ্বীশের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হল না।

এর পর এপ্রিলের প্রথম দিক থেকে আবার দেখা গেল সুকুমার, মধুসূদন এবং মনোরঞ্জন এই ৩ জনকে সুরেশবাবুর বাড়িতে প্রায়ই এসে উজ্জ্বলার সাথে শলাপরামর্শ করতে। এই ব্যাপারে উজ্জ্বলার ভাই গোপাল বলেছিলেন, এই ৩ জন তাঁদের বাড়ীতে এসে তাঁর দিদি উজ্জ্বলাকে নিয়ে ছাদে চলে যেতেন। সেখানে দিদির সাথে মনোরঞ্জন, মধুসূদন এবং সুকুমারের গুপ্ত আলোচনা চলত। মামলাটির্তে গোপাল সরকার পক্ষের একজন সাক্ষী ছিলেন। গোপাল তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন, তিনিও বিপ্লবী দলে তাঁর নাম লিখিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়েস ছিল অনুমান ১৬/১৭। তাঁকে অবশ্য বিপ্লবী দলের কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

এই সময় মনোরঞ্জনের পরামর্শ ও নির্দেশে উজ্জ্বলার উপর বিপ্লবী দলের কাজ-কর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের আমলা হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয় এই সময় এবং উজ্জ্বলা মজুমদারও এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত ৩রা কলকাতায় এসেছিলেন বিপ্লবীদলের নেওয়া সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার অভিপ্রায় নিয়ে। মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা যখন কলকাতায় এসে পৌছেছিলেন, সেই সময় উজ্জ্বলার বাবা সুরেশ মজুমদার ছিলেন ঢাকায়।

মনোরঞ্জন ঢাকায় মিথ্যা টেলিগ্রাম করে সুরেশ মজুমদারকে জানিয়েছিলেন, তাঁকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ কলকাতায় এসে দেখা করতে বলেছে। এই মিথ্যা টেলিগ্রাম করে সুরেশবাবুকে কলকাতায় আনানোর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া গোপাল কলকাতায় এসে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুরেশবাবুর কলকাতায় আসা দরকার বলে তাঁকে মিথ্যা করে জানানো হয়। এই টেলিগ্রাম পেয়ে সুরেশবাবু কলকাতায় এসে পৌছে দেখলেন, আসলে গোপাল মোটেই অসুস্থ হয়নি। এর পর উজ্জ্বলা ও গোপাল তাঁদের বাবাকে জানালেন, তাঁরা আত্মীয় ননীবালার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যেতে চান। সুরেশবাবু ভাবলেন, ছেলেমেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে, কয়েকদিনের জন্য ননীবালার বাড়ি বেড়িয়ে আসলে দোষ কি! তিনি অনুমতি দিলেন ছেলেমেয়েকে ননীবালার বাড়িতে যাওয়ার। উজ্জ্বলা ও গোপাল ননীবালার বাড়ির নাম করে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাবার অনুমতি নেওয়ার পর। আসলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বলা চলে এসেছিলেন কলকাতায় মনোরঞ্জনের সাথে। গোপালকে সঙ্গে করে মধুসূদন চলে এসেছিলেন তাঁর নিজের দেশের বাড়ি হাসাইলে। সেখানে মধুসূদনের বাড়িতে গোপালকে রাখা হয়েছিল পূর্ব বন্দোবস্ত মত।

৩রা মে যখন মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে নিয়ে কলকাতায় আসছিলেন তখন ট্রেনে আসতে আসতে উজ্জ্বলাকে মনোরঞ্জন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এতদিন ধরে বলা বিশেষ কাজটি উজ্জ্বলার পক্ষে কী ধরনের হবে। এর পর উজ্জ্বলা মনোরঞ্জনের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন বিশেষ কাজটি হল বাংলার তদানীন্তন গভর্নরকে গুলি করে হত্যা করা।

এর পর কলকাতায় পৌঁছে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উজ্জ্বলাকে একদিনের জন্য রাখা হল। পরের দিন মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে নিয়ে একটি ট্যাক্সিতে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলেন। শিয়ালদহ রেল স্টেশনে ট্যাক্সি করে আসার সময় ট্যাক্সিতে দুটি স্যুটকেস দেখতে পেয়েছিলেন উজ্জ্বলা। মনোরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন স্যুটকেস দুটিতে কিছু বিশেষ জিনিস আছে। উজ্জ্বলা মনোরঞ্জনের দিকে প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকাতেই তিনি উজ্জ্বলাকে বলেছিলেন, স্যুটকেসের মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি। এই গুলিভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বাংলার গভর্নরকে হত্যা করার প্রয়াস নেওয়া হবে। এজন্য তাঁরা দলের নির্দেশে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছেন। উজ্জ্বলা মনোরঞ্জনের কথা শুনে প্রথমে খানিকটা চমকে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, কাজটি সাংঘাতিক ধরনের। ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, দার্জিলিংয়ে রেলগাড়ি থেকে নামার আগে তাঁদের স্যুটকেস দুটি পুলিশ তল্লাসী করতে পারে। উজ্জ্বলার মত একটি মহিলা সঙ্গে থাকায় পুলিশ যদি বুঝতে পারে স্যুটকেস দুটি একজন মহিলার তাহলে হয়ত পুলিশের তাঁদের প্রতি সন্দেহটা কম হতে পারে। মনোরঞ্জন এ জন্যেই বিশেষত উজ্জ্বলাকে সঙ্গে করে আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি স্যুটকেস দুটি নিয়ে দার্জিলিংয়ে যাচ্ছেন। পুলিশের সন্দেহ উজ্জ্বলা সঙ্গে থাকায় অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে মনোরঞ্জনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ ছাড়া এই প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, যদি আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি স্যুটকেস্ দুটি নিতান্ত পুলিশের হাতে পড়ে যায় তাহলে তাঁরা স্যুটকেস দুটির মালিকত্ব সঙ্গে সঙ্গেই অস্বীকার করে যাবেন।

এর পর মনোরঞ্জন নির্বিঘ্নে উজ্জ্বলাকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিলেন। দার্জিলিংয়ে এসে তাঁরা উঠেছিলেন 'স্নো ভিউ হোটেলে'। দার্জিলিং স্টেশনে হঠাৎ উজ্জ্বলার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল এক আত্মীয়ের। মনোরঞ্জনের সাথে উজ্জ্বলাকে দেখে আত্মীয় ভদ্রলোকের চোখে মুখে একটা সন্দেহের ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আত্মীয় ভদ্রলোকের সন্দেহজনক দৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ না করে 'স্নো ভিউ হোটেলে' একটি ঘর ভাড়া করে উজ্জ্বলা ও মনোরঞ্জন একই সঙ্গে দুজনে ছিলেন। হোটেলে উজ্জ্বলার পরিচয় ছিল মনোরঞ্জনের স্ত্রী হিসেবে।

এই প্রসঙ্গে পরে মামলার রায়ে মন্তব্য করা হয়েছিল—হোটেলের একটি ঘরে উজ্জ্বলাকে নিয়ে মনোরঞ্জন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকায় মনে করার যথেষ্টই কারণ ছিল—একদিকে যেমন মনোরঞ্জন তাঁর আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, আবার অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলের একটি ঘরে থাকায় তাঁদের প্রতি কারো সন্দেহ করারও সুযোগ ছিল না। ফলে তাঁদের নেওয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা যখন 'স্নো ভিউ হোটেলে' ছিলেন সেই সময় দুজন যুবক তাদের সাথে ঘন ঘন দেখা করতে হোটেলে আসতেন। পরে মামলায় এই দুই যুবককে ভবানী ও রবীন্দ্র বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল ভবানী এবং রবীন্দ্র তাঁদের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পরামর্শ করতে প্রায়ই হোটেলে এসে মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলার সাথে দেখা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অ্যাণ্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, সেই স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল 'স্নো ভিউ হোটেলে' থাকার সময় মনোরঞ্জন ভবানীর হাতে ১টি অটোমেটিক পিস্তল, ১টি রিভলভার এবং কিছু আগ্নেয়াস্ত্রর গুলি দিয়েছিলেন। ভবানী ও রবীন্দ্রও সেই সময় হোটেলে উঠেছিলেন। ভবানী উঠেছিলেন 'স্যানোটরিয়াম' নামে দার্জিলিংয়ের একটি হোটেলে। তাঁকে দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ভবানী তাঁর হোটেল 'স্যানোটরিয়ামে' এনে রেখেছিলেন।

উজ্জ্বলাকে নিয়ে তাঁকে স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলের এক ঘরে মনোরঞ্জনের থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের বিপ্লবী কাজকর্মের সম্বন্ধে কারো মনে যেন কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না হয় এবং দলের সদস্যদের পরিচয় যেন জানাজানি না হয়। তাছাড়া দার্জিলিংয়ে আনা আগ্নেয়াস্ত্রগুলি দিয়ে দলের অভিসন্ধি (operation) ফলপ্রসূ না হওয়া পর্যন্ত যাতে অস্ত্রগুলি গুপ্তভাবে তাঁদের হেফাজতে লুকিয়ে রাখা যায়, তার জন্যও মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলাকে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে একই ঘরে থাকার অনুমতি দিয়েছিল তাঁদের নির্দিষ্ট বিপ্লবী দল। কিন্তু হোটেলে ওঠার পর থেকে মনোরঞ্জনের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার বিপদ সম্বন্ধে কোন সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়নি। বরং এই ব্যাপারে তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল একটা উদাসীনতা। মনোরঞ্জনের এই ধরনের উদাসীনতা দলের আদর্শের প্রতি মোটেই সঙ্গত ছিল না বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল।

এই সময় একদিন মনোরঞ্জন, উজ্জ্বলা, ভবানী ও রবীন্দ্র একসাথে বসে যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করলেন পরের দিন বিকেলের দিকে যখন বাংলার গভর্নর 'ফ্লাওয়ার শো' দেখতে যাবেন নির্দিষ্ট একটি জায়গায়, তখন সেখানে তাঁকে গুলি করে হত্যা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। ঠিক হ'ল গভর্নরকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করবেন ভবানী এবং রবীন্দ্র। সেইমত নির্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকতেও বলা হ'ল ভবানী ও রবীন্দ্রকে। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল ভবানী ও রবীন্দ্র দুজনই গভর্নরকে চিনতেন না। চিনিয়ে না দিলে কে গভর্নর তাঁরা বুঝবেন কীভাবে। গভর্নরকে চিনতে না পারলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করাও সম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা উঠতেই মনোরঞ্জন বললেন, গভর্নর সাহেব সব সময় একটি বড় ঘোড়ায় চলাফেরা করেন। ঘোড়া দেখেই বোঝা যায়, কোন্‌টি গভর্নর সাহেবের ঘোড়া। তাছাড়া মনোরঞ্জন নিজেই পরের দিন 'ফ্লাওয়ার শো'-এর জায়গায় উপস্থিত থাকবেন এবং আড়াল থেকে ভবানী ও রবীন্দ্রকে গভর্নর সাহেবের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁকে চিনিয়ে দেবেন।

পরের দিন 'ফ্লাওয়ার শো' শুরু হওয়ার অনেক আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন ভবানী ও রবীন্দ্র। তাঁরা টিকিট কাটতে গিয়ে জানতে পারলেন, তখনও টিকিট দেওয়া শুরু হয়নি। টিকিট দিতে দেরী আছে।

এই অবস্থায় সময় কাটাবার জন্য ভবানী এবং রবীন্দ্র কাছাকাছি একটি পার্কে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তাঁদের দুজনের চোখে পড়ল সামান্য দূরে পার্কের একটি জায়গায় মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা দুজনে বসে আছেন। এর কিছুক্ষণ বাদে তাঁদের দুজনকে কোনরকম সঙ্কেত না দিয়েই পার্কটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা। এই অবস্থায় ভবানী এবং রবীন্দ্রর পক্ষে কিছু করার ছিল না। তাঁরাও হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন বিফল মনোরথ হয়ে। কিন্তু পরে দেখা গেল সেদিন মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে নিয়ে যথাসময়ে 'ফ্লাওয়ার শো' দেখতে ঢুকেছিলেন। গভর্নরকে চিহ্নিত করতে যাতে সুবিধা হয় এই রকম জায়গা বেছে নিয়ে তাঁরা বসেছিলেন। কিন্তু যাঁদের দুজনের উপর গভর্নর হত্যার দায়িত্ব ন্যাস্ত করে পিস্তল দেওয়া হয়েছিল তাঁদের দুজনকে দেখতে না পাওয়ায় সমস্ত পরিকল্পনাটি সেদিনের মত ভেস্তে গিয়েছিল। অর্থাৎ সেদিন কিছুই ঘটল না।

সেদিনই সন্ধ্যার পর ভবানী এবং রবীন্দ্রর সাথে দেখা হতে মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা নিজেদের উত্তেজনা প্রকাশ করে তীব্র ভাষায় ভবানী ও রবীন্দ্রর সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের দুজনের সাহসিকতার প্রতি কটাক্ষ করে। খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা

সেদিনের অপারেশন ব্যর্থ হওয়ায়। এর পর ঠিক হ'ল পরের বার যেন কোনভাবেই তাঁদের লক্ষ্য ব্যর্থ না হয়।

পরের দিন ভোরে মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা এসে উপস্থিত হলেন ভবানী ও রবীন্দ্রর 'স্যানোটরিয়াম' হোটেলে। সেখানে তাঁদের মধ্যে আবার শলাপরামর্শ হ'ল। পিস্তল পরিষ্কার করা হ'ল। পিস্তলের গুলি আগুনের তাপে গরম করে নেওয়া হ'ল।

এই ব্যাপারে মনোরঞ্জনের প্রথম দেওয়া স্বীকারোক্তি থেকে জানা গিয়েছিল উজ্জ্বলাই কাগজ জ্বেলে পিস্তলের গুলি গরম করে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য পোড়া কাগজের অংশ এবং কাগজের ছাই হোটেলের ঘরে স্তূপীকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং এর থেকে মনোরঞ্জনের স্বীকারোক্তির এই অংশের মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

পিস্তলের গুলি কাগজ পুড়িয়ে গরম করে দেওয়ার পর 'স্যানোটরিয়াম' হোটেল ছেড়ে মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা নিজেদের হোটেল 'স্নো ভিউতে' ফিরে এসেছিলেন। এর পর বিকেলের দিকে পূর্ব পরিকল্পনামত সবাই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন লেবং রেস কোর্সের মাঠে। সেদিন ছিল ৮ই মে।

ভবানী ও রবীন্দ্র রেস কোর্সে পৌঁছে প্রথমে সাধারণ দর্শকের জন্য নির্দিষ্ট দুখানি টিকিট কিনলেন। কিন্তু সেই টিকিটে তাঁদের বিশেষ এনক্লোজারে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বুঝতে পেরে তাঁরা দুজন ফের দু-টাকা দামের দুটি টিকিট কিনলেন বিশেষ এনক্লোজারে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এর পর ভবানী ও রবীন্দ্র দুজ'নে গভর্নরের আসনের কাছাকাছি দুটি আসন বেছে বসে পড়লেন। এই সময় মনোরঞ্জন এবং উজ্জ্বলা এসে রেস্ কোর্স মাঠে ঢুকেছিলেন।

রবীন্দ্রর স্বীকারোক্তি থেকে এই প্রসঙ্গে জানা গিয়েছিল মনোরঞ্জন আঙুল নির্দেশ করে বাংলার গভর্নর স্যার অ্যাণ্ডারসনকে রবীন্দ্র ও ভবানীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ; গভর্নরকে চিনিয়ে দেওয়ার পর মনোরঞ্জন উজ্জ্বলাকে নিয়ে লেবং রেস কোর্স ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এর পর বেলা অনুমান ৩টার সময় ঘটেছিল সেই সাংঘাতিক ঘটনা। অর্থাৎ লেবং রেস কোর্সে গভর্নরকে লক্ষ্য করে দুজনের পর পর পিস্তল থেকে দুটি গুলি নিক্ষেপ করার ঘটনা।

হাইকোর্ট আপিলের রায়ে ভবানী ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—ভবানীর ঘটনায় যুক্ত থাকা নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাঁকে ঘটনার দিন এবং নির্দিষ্ট সময়ে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছিলেন একাধিক সাক্ষী। ভবানীকে গুলি ছুঁড়তে দেখে পুলিশ তৎপরতার সাথে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল এবং পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ায় ভবানীকে সঙ্গে সঙ্গে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালে আহত অবস্থায় ভবানী নিজেই জবানবন্দি দিয়ে স্বীকার করেছিলেন, তিনি গভর্নরকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়েছিলেন।

আপিল আদালতও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, ভবানী বাংলার গভর্নর স্যার জন্ অ্যাণ্ডারসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার অপরাধে অপরাধী।

রবীন্দ্র সম্বন্ধেও ট্রাইবুনাল এবং হাইকোর্ট একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। একাধিক সাক্ষী রবীন্দ্রকে দেখেছিলেন গভর্নরকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়তে। তাছাড়া রবীন্দ্র তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন, তিনি গুলি ছুঁড়েছিলেন বাংলার গভর্নর অ্যাণ্ডারসন সাহেবকে হত্যা করার জন্য। সুতরাং উভয় আদালতই রবীন্দ্রকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় দোষী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন।

মনোরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসে বিভিন্ন সাক্ষ্যসাবুদের উল্লেখ করেছিলেন হাইকোর্ট আপিল মামলায়। প্রকৃতপক্ষে অ্যাণ্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে মনোরঞ্জনই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ছিলেন বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্য। একসময় তিনি ঢাকায় সুরেশ মজুমদারের বাড়ীতে হামেশা যাতায়াত করতেন। ঢাকায় উজ্জ্বলাদের বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর ছাদে উজ্জ্বলার সাথে গুপ্ত শলাপরামর্শ করতে তাঁকে অনেকেই দেখেছিলেন। ৩রা মে উজ্জ্বলাকে নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসতে একাধিক ব্যক্তি দেখেছিলেন।

মনোরঞ্জনের সাথে উজ্জ্বলাকে দার্জিলিং রেল স্টেশনে রেলগাড়ি থেকে নামতে দেখেছিলেন উজ্জ্বলার এক আত্মীয় ভদ্রলোক। 'স্নো ভিউ হোটেলে' একই কামরায় উজ্জ্বলার সাথে মনোরঞ্জনকে থাকতে দেখা গিয়েছিল ৩রা মে থেকে। স্যানোটরিয়াম হোটেলের ওয়েটার তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন, মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলাকে তিনি দেখেছিলেন তাঁদের হোটেলে। ঘটনার দিন দুই আগে স্যানোটরিয়াম হোটেলে এসে ভবানী ও রবীন্দ্রর সাথে বসে তাঁরা চা পান করেছিলেন। স্যার অ্যাণ্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি করার দিন দুই আগে স্যানোটরিয়াম হোটেলের ওয়েটারটি ৪ কাপ চা পরিবেশন করেছিলেন ৪ জনকে। হোটেলের বিল থেকেও ওয়েটারের সাক্ষ্যর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। বিল মিটিয়েছিলেন ভবানী এবং রবীন্দ্র। মনোরঞ্জন ঘটনার দুদিন পর যখন দার্জিলিং থেকে ট্রেনে করে উজ্জ্বলাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন, তাঁকে ট্রেনের মধ্যেই একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টার চিনতে পেরেছিলেন। পুলিশ ইনস্‌পেক্টার মনোরঞ্জনের নাম জিজ্ঞাসা করতেই তিনি নিজের আসল নাম গোপন করে মিথ্যা নাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের সন্দেহজনক সাক্ষ্য এসেছিল অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায়।

মামলায় মনোরঞ্জন নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে নিজের দেওয়া পূর্ব স্বীকারোক্তির কোন কোন অংশ অস্বীকার বা পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু ভবানী ও রবীন্দ্রর দেওয়া স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, মনোরঞ্জন ছিলেন সক্রিয়ভাবে অ্যাণ্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত। দার্জিলিংয়ে মনোরঞ্জন সবসময় ভবানী এবং রবীন্দ্রর সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

হাইকোর্ট মনোরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছিলেন, অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে মনোরঞ্জন গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবুনালও তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাছাড়া বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র হেফাজতে রাখার অপরাধেও তিনি অপরাধী ছিলেন।

উজ্জ্বলা সম্বন্ধে হাইকোর্ট আলোচনা করে বললেন, উজ্জ্বলা নিজেই অ্যাণ্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। পরে অবশ্য নিজের দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকারও করেছিলেন। উজ্জ্বলা তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন, তিনিও অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মনোরঞ্জনের দেওয়া স্বীকারোক্তির সাথে তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

হাইকোর্টও উজ্জ্বলা মজুমদার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, তিনি অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগটিও তাঁর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। উজ্জ্বলা সম্বন্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

উজ্জ্বলার পর দণ্ডিত আসামী মধুসূদন ব্যানার্জী সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন

হাইকোর্ট। ঘটনার দিন মধুসূদন দার্জিলিংয়ে ছিলেন না। তিনি অন্য কোথাও ছিলেন। মধুসূদন নিজে কেন ঘটনার দিন দার্জিলিংয়ে থাকতে পারেননি তা বুঝতে কোন অসুবিধা ছিল না। উজ্জ্বলার ভাই গোপালের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৩রা মে গোপালকে নিয়ে মধুসূদন তাঁর নিজের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল উজ্জ্বলাকে মনোরঞ্জনের সাথে দার্জিলিংয়ে পাঠানো। কারণ উজ্জ্বলা ও তাঁর ভাই তাঁদের বাবা সুরেশবাবুকে বলেছিলেন, তাঁরা দুজনে কয়েকদিনের জন্য আত্মীয়া ননীবালার বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। উজ্জ্বলাকে দার্জিলিংয়ে পাঠাতে হলে গোপালকেও সরিয়ে রাখা প্রয়োজন ছিল। নতুবা ননীবালার বাড়িতে ভাইবোনের না যাওয়ার খবরটি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গোপাল মধুসূদনের দেশের বাড়িতে ছিলেন ৩রা মে থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে দার্জিলিংয়ের ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। লেবং রেস কোর্সে ঘটনা (Lebong outrage) ঘটেছিল ৮ই মে। গোপালকে কলকাতা থেকে সরিয়ে রাখার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুরেশবাবু যেন কোনভাবেই জানতে না পারেন তাঁর ছেলেমেয়ে দুজন ননীবালার বাড়ী যাননি। কোনভাবে সুরেশবাবু এই খবর জানতে পারলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সুরেশবাবু জানতে পারলে তখনই উজ্জ্বলার খোঁজ-খবর শুরু করতে পারেন। তখন হয়ত ষড়যন্ত্রের পুরো ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এইসব চিন্তা-ভাবনা থেকেই গোপালকে এই সময় কেউ দেখতে না পান এই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

লেবং রেস কোর্সে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ১৫ই মে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসে মুসলমান পাড়ার একটি বাড়িতে উঠেছিলেন। মুসলমানপাড়ার বাড়িটি থেকেই পরে মধুসূদনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর গলায় পৈতা পর্যন্ত ছিল না। মধুসূদন যে একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন সেই পরিচয় গুপ্ত করার জন্য নিজের পৈতা তিনি খুলে রেখেছিলেন। তাছাড়াও নিজের পরিচয় গুপ্ত রাখার জন্য মধুসূদন নানা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

ট্রাইবুনাল এবং হাইকোর্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, মধুসূদন নিজে দার্জিলিংয়ে উপস্থিত না থাকলেও অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মধুসূদনকে দোষী সাব্যস্ত করা স্পেশাল ট্রাইবুনালের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে হাইকোর্টও ট্রাইবুনালের রায় মেনে নিয়েছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ব্যাপারে মধুসূদনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেই অভিযোগটি থেকে হাইকোর্ট আপিলে মধুসূদনকে রেহাই দিয়েছিলেন।

সুকুমার ঘোষ ওরফে লন্টুর ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করতে বসে মামলার নথিপত্র থেকে হাইকোর্ট দেখলেন, সুকুমার ছিলেন একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী যুবক। অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে তিনি সবসময় নিজেকে পর্দার আড়ালে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

সুকুমারের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে সাক্ষ্য এসেছিল তিনি অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে নিজেই অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সুকুমারের বন্ধু পৃথ্বীশ সাক্ষ্য দিয়ে সুকুমারের এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং অভিযুক্ত আসামীদের স্বীকারোক্তি থেকে সুকুমারের নাম পাওয়া গিয়েছিল অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রে।

ঢাকায় সুরেশবাবুর বাড়িতে মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে অন্যান্যদের সাথে সুকুমারকেও যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই হত্যা ষড়যন্ত্রের শুরু হয়েছিল।

মধুসূদন যখন মুসলমানপাড়ার মধ্যে ঘর নিয়ে থাকছিলেন, সেই সময় মধুসূদনের বাড়িতে একাধিকবার সুকুমারকে দেখা গিয়েছিল।

উজ্জ্বলার জবানবন্দি থেকে জানা গিয়েছিল, উজ্জ্বলা যখন দার্জিলিংয়ের ঘটনার পর মনোরঞ্জনের সাথে ১৫ই মে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন. তখন তাঁরা দুজনেই কলকাতায় সুকুমারের সাথে দেখা করে তাঁদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। পরিকল্পনা সাফল্যমন্ডিত না হওয়ায় সুকুমার খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, সুকুমার ছিলেন একজন বিচক্ষণ যুবক। নিজে এই হত্যা ষড়যন্ত্রে সব সময় পর্দার আড়ালে থেকে মনোরঞ্জনকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আবার মনোরঞ্জনও নিজেকে মূল অপারেশন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ভবানী এবং রবীন্দ্রকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনার আগে ও পরে সুকুমারের সঙ্গে অন্যান্য অভিযুক্তদের যোগাযোগ থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল হত্যা ষড়যন্ত্রে সুকুমার যুক্ত ছিলেন। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে ট্রাইবুনালের সাথে একমত হয়েছিলেন। হাইকোর্টও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সুকুমার অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়নি বলে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল সুশীলকুমার চক্রবর্তীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত করেছিলেন। সুশীল ট্রাইবুনালের রায় কিংবা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল দায়ের করেননি। আপিল দায়ের না করা সত্ত্বেও হাইকোর্টে তাঁর সম্বন্ধেও আলোচনা করেছিলেন। সুশীল ছিলেন একজন বেকার যুবক। মাঝে মধ্যে সাবান বিক্রি করতেন। সুশীল পরে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। এপ্রিলের শেষদিকে অথবা মে-র প্রথম দিকে মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর কথায় সুশীল ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। মনোরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর জন্য কলকাতায় একটি কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতায় আসার পর সুশীল মনোরঞ্জনের কাছে জানতে চাইলেন কি কাজ তাঁর জন্য যোগাড় করা হয়েছে? উত্তরে মনোরঞ্জন বলেছিলেন তাঁর কাজটি হবে বাংলার গভর্নরকে গুলি করে হত্যা করা।

এরপর সুশীলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিংয়ে সেখানকার জল-আবহাওয়ার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। সুশীল দলের নির্দেশ মত দার্জিলিংয়ে এসে নিজেকে বেশ ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন। সুশীল দার্জিলিংয়ে ছিলেন ৬ই অথবা ৭ই মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মনোরঞ্জন দার্জিলিংয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভবানী এবং রবীন্দ্র। ভবানী এবং রবীন্দ্রকে পেয়ে যাওয়ায় মনোরঞ্জনের কাছে তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সুশীলকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার ২/১ দিন আগে দার্জিলিং থেকে সুশীলকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলেও বাংলার গভর্নর হত্যা ষড়যন্ত্রে তিনিও ছিলেন। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে ট্রাইবুনালের সাথে একমত হয়েছিলেন। তাছাড়া সুশীলের পক্ষে হাইকোর্টে কোন আপিল দায়ের না করায় হাইকোর্ট সুশীলের ব্যাপারে বিশেষ আলোচনায় যাননি।

এর পর হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের দণ্ডের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ভবানী এবং রবীন্দ্রর বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনাল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট এই দুজনের বিরুদ্ধে সব দিক বিচার-বিবেচনা করে স্পেশাল ট্রাইবুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রেখেছিলেন এবং সেই আদেশ অনুমোদন করেছিলেন।

মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধেও স্পেশাল ট্রাইবুনাল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। মনোরঞ্জন হত্যা ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে লিপ্ত থাকলেও নিজে অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার জন্য গুলি ছোঁড়েননি। পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন ভবানী এবং রবীন্দ্র। আইনের জটিলতার জন্য

হাইকোর্ট মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখতে পারলেন না। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে বলেছিলেন, যদিও মনোরঞ্জন অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা, তবুও তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত কারণে মৃত্যুদণ্ডের বদলে তাঁকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সম্বন্ধে হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল—

"As far as we can see, the maximum sentence that can be passed against Monoranjan with regard to that part of the charge which relates to conspiracy for an attempt to murder is one of fourteen years' rigorous imprisonment. That is the power given by sec. 307 of the Indian Penal Code."

এর পর হাইকোর্ট আবার মনোরঞ্জন সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"We think there is ample evidence on which the commissioners could come to the conclusion, as they did, that one of the offences committed my Monoranjan was one under sec. 3 of the Bengal Criminal Law (Arms and Explosives) Act, 1932, adding sec. 19(A) to the Indian Arms Act, 1878, which makes him liable to transportation for life. The commissioners did not pass this sentence upon him. We think the offence is so serious that a sentence ought to be passed under that section and we pass on him the sentence of transportation for life."

উজ্জ্বলাকে স্পেশাল ট্রাইবুনাল দিয়েছিলেন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। হাইকোর্ট আপিলে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের জায়গায় উজ্জ্বলার বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ হ্রাস করে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

সুকুমারের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালের দেওয়া ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বহাল রেখেছিলেন হাইকোর্ট।

মধুসূদনের বিরুদ্ধে দেওয়া ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশও হাইকোর্ট বহাল রেখেছিলেন। সুকুমার ওরফে লন্টুর বিরুদ্ধেও ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশই বহাল থাকল হাইকোর্টের আদেশে।

এইভাবে দণ্ডিত আসামীদের আপিলের পরিসমাপ্তি হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ১৯৩৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর। হাইকোর্টে আপিল শুনেছিলেন একটি স্পেশাল বেঞ্চ।

হাইকোর্টে স্পেশাল বেঞ্চটি গঠন করা হয়েছিল প্রধান বিচারপতি ডার্বিশায়ার, বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জী এবং বিচারপতি কস্টেলোকে নিয়ে। আপিলের রায় লিখেছিলেন প্রধান বিচারপতি ডার্বিশায়ার। অন্যান্য বিচারপতিরা প্রধান বিচারপতির দেওয়া রায়কে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

মামলাটির নথি ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস লেখার পক্ষে নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা

পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলার মেদিনীপুর জেলা ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের পীঠস্থান। মেদিনীপুর জন্ম দিয়েছিল একাধিক বিপ্লবীকে। এই সব বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবে সামিল হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন সমর্পিত করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার বিপ্লবীরা আওয়াজ তুলেছিলেন, 'ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়ো'। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসনের ইংরেজ আমলাদের এবং তাদের পদানত দেশীয় দালালদের হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা তাদের সংগঠিত বিপ্লবী দলের নেতৃত্বের পরিচালনায়।

মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল নির্মলজীবন ঘোষ, কামাখ্যাচরণ ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিংহ, সুকুমার সেনগুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, পূর্ণানন্দ সান্যাল, মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সরোজরঞ্জন দাস কানুনগু, শান্তিগোপাল সেন এবং শৈলেশচন্দ্র ঘোষকে।

এই ১৩ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল—তাঁরা ১৯৩১ সালের ২রা মার্চ থেকে ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনাথ পাঁজা, মৃগেন্দ্র দত্ত, শান্তিগোপাল সেন, শৈলেশচন্দ্র ঘোষ, পরিমল রায়, ফণী দাস, প্রভাংশু পাল, প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলেন মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ বার্জ এবং অন্যান্য সরকারী আমলাদের হত্যা করার। মামলার নথি থেকে দেখা যায়, এই হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল মেদিনীপুর শহর ও খড়্গপুরের রাজার দিঘী, আবাস, গোপ, কেদানবাবুর বাড়ী, সুকুমার সেনগুপ্তের বাড়ী, গোলকুয়াচক্, পুরানো জেল, কলেজ ময়দান, পুলিশ ময়দানএবং আরো বিভিন্ন জায়গায়।

মেদিনীপুরে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে অভিযুক্তদের বিচার হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) এবং ৩০২ ধারায়। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন মিঃ এইচ. জি. রাইট, মিঃ টি. এন. বাসু এবং মিঃ এস. পি. ঘোষ।

বিচার শুরু হতেই পাবলিক প্রোসিকিউটর স্পেশাল ট্রাইবুনালকে জানিয়েছিলেন, অভিযুক্তদের মধ্যে শান্তিগোপাল সেন ফেরার। তাই তিনি আসামীর কাঠগড়ায় অনুপস্থিত। এর পর সরকার পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন পেশ করে ট্রাইবুনালের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছিল অভিযুক্ত আসামী শৈলেশচন্দ্র ঘোষকে যেন ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। কারণ তিনি সরকারপক্ষের আনা অভিযোগ সম্বন্ধে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিতে সম্মত হয়েছেন। তাই সরকারপক্ষ তাঁকে রাজসাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়াতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্পেশাল ট্রাইবুনাল সরকারপক্ষের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করে বাকি ১১ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মামলাটি শুনেছিলেন।

মামলার নথি থেকে দেখা যায় হত্যার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর।

মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় স্পেশাল ট্রাইবুনাল ১৯৩৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী রায় দান করেছিলেন। ৩ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনাল। এই ৩ জনের মধ্যে ছিলেন নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী এবং রামকৃষ্ণ রায়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল ৪ জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। এই ৪ জন অভিযুক্ত ছিলেন কামাখ্যাচরণ ঘোষ, সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিংহ এবং সুকুমার সেনগুপ্ত। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় স্পেশাল ট্রাইবুনাল মুক্তির আদেশ দিয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, পূর্ণানন্দ সান্যাল, মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং সরোজরঞ্জন দাস কানুনগুকে। ১৯৩৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ৩ জনের বিরুদ্ধে দেওয়া ফাঁসির আদেশটি কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনাল। অপর দিকে সব দণ্ডিত আসামীরাই তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া রায় এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে ১৯৩৪ সালের ১৭ই এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

কলকাতা হাইকোর্ট ডেথ্ রেফারেন্স এবং দণ্ডিত আসামীদের আপিল শুনেছিলেন একই সঙ্গে। কলকাতা হাইকোর্টে ডেথ্ রেফারেন্স এবং দণ্ডিত আসামীদের আপিলের শুনানী হয়েছিল একটি স্পেশাল বেঞ্চে। স্পেশাল বেঞ্চটি গঠিত হয়েছিল বিচারপতি কস্টেলো, বার্টলে এবং হেণ্ডারসনকে নিয়ে।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়টি ছিল অতি দীর্ঘ। স্পেশাল ট্রাইবুনাল রায়ের একাংশে বলেছিলেন—"In the case before us, however, where two previous District Magistrates had already been murdered. no possible ground could exist for any youth who joined in the conspiracy to fail to be aware that it was a conspiracy in deadly earnest. The evidence shows that the accused person Brojo Kishore Chakraborty, Nirmal Jiban Ghosh and Ram Krishne Roy had already joined the party berfore the murder of Mr. Douglas. It shows that after the murder of Mr. Douglas, Brojo Kishore Chakraborty became the leader of the party and that he throughout took a directing part in arranging the murder of Mr. Burge. The evicence shows moreover that both Nirmal and Ram Krishna were active in pursuing the object of the conspiracy and ihat they both took a leading part in all the activities of the conspirators. We are aware that Nirmal's intimacy with the approver seems to throw the activities of Nirmal into disproportionate prominence. But even making allowance for that fact it is clear that Nirmal was one of the most enthusiastic and active members of the conspiracy."

ট্রাইবুনাল প্রদত্ত রায়ের এই অংশ থেকে বোঝা যায় মেদিনীপুরের দুজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের (মিঃ ডগলাস এবং মিঃ বার্জ) পর পর হত্যার কারণে স্পেশাল ট্রাইবুনাল ব্রজকিশোর, নির্মল এবং রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। এই ৩ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে গিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনাল বলেছিলেন এরা সবাই কেবলমাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক। এইসব যুবকরা আবেগতাড়িত হয়ে সন্ত্রাসবাদের পথ ধরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রায়ের এই

অংশে বলা হয়েছিল—"We feel however that these circumstances cannot weigh against the deadly object of their activities which were carried on and indeed carried on with greater vigour even after at least one District Magistrate had been murdered during their membership of the party. In these circumstances we feel that we should be doing less than our duty in awarding any other punishment than the maximum which the law allows."

এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে ব্রজকিশোর, নির্মল এবং রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক ৩ জন একমত হয়ে।

অভিযুক্ত আসামী শৈলেশচন্দ্র ঘোষ রাজসাক্ষী হিসেবে হত্যা ষড়যন্ত্রের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সামনে। রাজসাক্ষী শৈলেশ বিপ্লবী দলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিয়েছিলেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এ ছাড়াও একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। স্পেশাল ট্রাইবুনাল এবং পরে আপিল আদালত রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য সহ অন্যান্য সাক্ষ্য সাবুদ বিচার-বিবেচনা করে দেখেছিলেন অতি ধৈর্য সহকারে। রাজসাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্যর সাথে অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্যর মিল ও গরমিল কি পর্যায়ের তাও বিচারের স্বার্থে যথাসম্ভব বিবেচনা করে দেখা হয়েছিল উভয় আদালতে। ক্ষমা প্রদর্শিত অভিযুক্ত আসামীর সাক্ষ্য (রাজসাক্ষী) আইনগত দিক থেকে কতখানি এবং কিভাবে গ্রহণ করা যায় তাও বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনাল মূল মামলার বিচারের সময় এবং আপিল শুনানির সময় হাইকোর্ট।

এই প্রসঙ্গে স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের ১৭১ পাতায় বলা হয়েছিল,—"We have been constantly mindful of the position in which the approver stands. The approver has given his evidence in the hope of perdon and we are awarethat he is under the temptation to depose in accordance with what he may have reason to suppose that he has deposed by reason of repentance for his own past activities or that his motives are anything but motives of self-interset. We have received his evidence with great caution and have scrutinised it with all the care of which we are capable. Bearing all these considerations in mind, we are nevertheless of opinion that he has deposed with substantial truth."

স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের এই অংশ থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল রাজসাক্ষী শৈলেশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্য অতি সুচিন্তিতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। দেখা হয়েছিল রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা যায় কি না। রাজসাক্ষী শৈলেশের সাক্ষ্য থেকে স্পেশাল ট্রাইবুনাল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তাঁর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে রায়ের একাংশে বলা হয়েছিল,—"We should, however, not prepared to act upon his evidence unless we were satisfied that it had been sufficiently corroborated in material particulars and we now declare that we are of opinion that his evidence has received sufficient corroboration, so far as the general story of conspiracy is concerned."

কলকাতা হাইকোর্টে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার আপিলের শুনানি

একনাগাড়ে চলেছিল ১১ দিন। হাইকোর্ট আপিলের রায় দিতে গিয়ে বলেছিলেন একাধিক বার মূল মামলায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য, সওয়াল, জবাব এবং ট্রাইবুনালের রায় বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্টের মনে হয়েছে স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে যুক্তিসঙ্গত ও বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। ট্রাইবুনাল মামলাটির সব দিক গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আপিলের রায়ে হাইকোর্ট এই ব্যাপারে বলেছিলেন,—"The whole of the testimony given before the learned Commissioners was examined microscopically and meticulously with the result, however, that this process of sifting the evidence only served to throw into high relief the undoubted truth of the prosecution story. We have, since the hearing of the appeal, once more examined the evidence for ourselves and reconsidered all the arguments put forwardby learned counsel on behalf of the Appellants and in the result we can only say that the more we looked into the enidence and the more we considered the arguments put forward on behalf of the Appellants, the more solid and the more substantial, and indeed, unasailable, became the case for the prosecution. After our very careful examination of the case and consideration of all the arguments put forward, we are definitely of opinion that the learned Commissioners were quite justified in coming to the conclusion–and indeed they could have come to no other conclusion–that the evidence of the approver was in every way sufficiently and satisfactorily corroborated."

দণ্ডিত আসামী কামাখ্যাচরণ ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ এবং সুকুমার সেনগুপ্তের পক্ষে হাইকোর্টে আপিলে সওয়াল করেছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী এন. সি সেন। শ্রী সেন তাঁর সওয়ালে হাইকোর্টের কাছে বলেছিলেন, রাজসাক্ষী শৈলেশচন্দ্র ঘোষ পুলিশের শেখানো মত পুরোপুরি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে। সেই কারণে রাজসাক্ষী শৈলেশের সাক্ষ্যর উপর কোনমতেই নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হয়নি স্পেশাল ট্রাইবুনালের। হাইকোর্ট শ্রী সেনের বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী কামাখ্যাচরণ ঘোষকে গ্রেপ্তার করার পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়েছিল ১২ই সেপ্টেম্বর। সেই সময় তাঁর শরীরে কিছু কিছু আঘাতের দাগ বা চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। তাঁকে এই অবস্থায় সিভিল সার্জন দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল। সিভিল সার্জেন কামাখ্যাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন তাঁর শরীরে কমবেশী আঘাতের দাগ আছে।

এই ব্যাপারে সাক্ষ্যসাবুদ হয়ে যাওয়ার পর কামাখ্যাকে তাঁর নিজের বক্তব্য বলতে বলায় তিনি স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে নিজের জবানবন্দিতে বলেছিলেন, তাঁকে ৯ই সেপ্টেম্বর থানায় তলব করা হয়েছিল। সেইমত তিনি থানায় এসেছিলেন সেইদিন। থানায় ৯ই সেপ্টেম্বর যাওয়ার পর তিনি একাধিক গোয়েন্দা অফিসারকে থানায় দেখতে পেয়েছিলেন। সেইসব অফিসাররা তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলেছিলেন। এর পর শুরু হয়েছিল ভীতি প্রদর্শন। এমনকি তাঁকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল তাঁকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াবার জন্য।

পরের দিন অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা অনুমান ৭টার সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ জোনস্ থানায় এসে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, মেদিনীপুরের জেলা

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পার্জের হত্যার ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা আছে কি না! উত্তরে কামাখ্যা মিঃ জোনস্‌কে বলেছিলেন, এই হত্যার ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা নেই। তখন মিঃ জোনসের নির্দেশে তাঁর উপর শুরু হয়েছিল অকথ্য অত্যাচার। দুজন পুলিশের লোক তাঁর দুটি পা দুদিক থেকে টেনে ধরেছিল। অন্য দুজন ধরেছিল তাঁর হাত দুখানি টেনে। এরপর একটি খালি টেবিলের উপর তাঁকে উপুড় করে ফেলে চেপে ধরা হয়েছিল। এক ব্যক্তি তাঁর মুখটি চেপে ধরেছিল। এর পর তাঁর দেহের বস্ত্রাদি খুলে ফেলে দিয়ে তাঁকে উলঙ্গ করে ফেলা হয়েছিল। মিঃ জোনসের নির্দেশে ওই অবস্থায় তাঁর পিঠে চাবুক মারা শুরু হয়েছিল। চাবুক খেয়ে তিনি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। জল চাইলে তাঁকে জল ও বরফ দেওয়া হয়। আঘাতের জায়গায় বরফ ঘষে দেওয়ায় কিছুটা সুস্থ হতেই আবার তাঁকে চাবুক মারা হয়। চাবুকের আঘাতে কামাখ্যা ফের বেহুঁশের মত হয়ে গিয়েছিলেন। অকথ্য অত্যাচার করার পর মিঃ জোনস্‌ থানা ত্যাগ করার সময় অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন, "ছেলেটি খুব দুর্বল। তোমরা এই ছেলেটিকে মামলায় সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাতে চেষ্টা কর।" এইসব কথা বলার পর তাঁর বাবার পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন কামাখ্যা বলেছিলেন, তাঁর পিতা একজন সরকারী কর্মচারী। তাঁর পিতার পরিচয় জানার পর মিঃ জোনস্‌ সেদিনের মত থানা থেকে চলে গিয়েছিলেন। মিঃ জোনস্‌ চলে যাওয়ার পর তাঁর দেহের ক্ষতস্থানে 'জামবাক্‌' মালিশ করা হয়। এর পরের দিন সকাল অনুমান ৯টা নাগাদ তাঁর বাবাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর বাবাকে বলা হয়েছিল যদি তাঁর পুত্র ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশের কথামত সাক্ষী হিসেবে না দাঁড়ান তাহলে তাঁর পুত্রকে খুন করা হতে পারে এবং তিনিও সরকারী চাকুরিটি হারাতে পারেন।

কামাখ্যাচরণ ঘোষ এর পর স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে বলেছিলেন, আবার পুলিশের লোক তাঁকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করে। শেষ পর্যন্ত ভয়ে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হাইকোর্ট এই প্রসঙ্গে আপিলের রায়ে বলেছিলেন, দণ্ডিত আসামী কামাখ্যাচরণ ঘোষ তাঁর জবানবন্দিতে স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়ে বলেছিলেন। অবশ্য হাইকোর্ট বিশ্বাস করেছিলেন, কামাখ্যাকে গ্রেপ্তার করার ২/৩ দিন আগে তাঁকে থানায় এনে তাঁর উপর চাবুক মারা হয়েছিল। কমবেশী অত্যাচার অবশ্যই তাঁর উপর করা হয়েছিল। সেই বিষয়ে হাইকোর্টের কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর উপর দৈহিক অত্যাচার করা হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য।

কামাখ্যা নিজেও স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে বলেছিলেন পুলিশের শেখানো মত স্বীকারোক্তি দিতে না চাওয়ায় তাঁকে মিথ্যা করে মামলায় জড়ানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট বলেছিলেন মামলার নথি থেকে দেখা যায় কামাখ্যাচরণ ঘোষ ১৬ই সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেছিলেন পুলিশ তাঁর উপর দৈহিক এবং মানসিক ভাবে অকথ্য অত্যাচার করেছে। সিভিল সার্জেন ক্যাপ্টেন লিন্টনের পরীক্ষা থেকেও কামাখ্যার বক্তব্যের সত্যতা কিছুটা প্রমাণিতও হয়েছিল।

হাইকোর্ট এই প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন কামাখ্যাচরণ ঘোষের উপর পুলিশের অত্যাচার হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। তবে এই স্বীকারোক্তি আদায় করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল বলেই তাঁকে মিথ্যা করে মামলায় জড়ানো হয়েছে এই যুক্তি কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

দণ্ডিত আসামী সনাতন রায় এবং সাক্ষী বিজয়কৃষ্ণ দত্ত ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র। আসামী সনাতনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ঘটনার সময় তিনি মেদিনীপুর শহরে একটি মিছিলের সাথে রাস্তায় ছিলেন। মিছিলটি করা হয়েছিল বন্যা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য।

সনাতন রায়ের পক্ষে তাঁর মিছিলে থাকার যে গল্পটি বলা হয়েছিল সেই ব্যাপারে হাইকোর্ট বলেছিলেন ঘটনার সময় প্রকৃতই যদি তিনি মিছিলে অংশগ্রহণ করে থাকবেন তাহলে মিছিলে অংশগ্রহণকারী একাধিক ব্যক্তিকে তিনি সাক্ষী হিসেবে আদালতের কাছে এনে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করতে পারতেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করা হয়নি। এই অবস্থায় সনাতনের নিজের দেওয়া গল্পটির কোন ভিত্তি নেই।

আপিল শুনানির পর কলকাতা হাইকোর্ট রাজসাক্ষী শৈলেশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্য সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। সব দিক বিচার-বিবেচনা করে হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের সাথে একমত হয়ে দণ্ডিত আসামীদের আপিল খারিজ করে দিয়েছিলেন ১৯৩৪ সালের ৩০শে আগস্ট। হাইকোর্ট একই সঙ্গে ব্রজকিশোর, নির্মল এবং রামকৃষ্ণের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছিলেন।

মামলাটিতে ৩ জন বিপ্লবীর ফাঁসির আদেশ হাইকোর্ট পর্যন্ত অনুমোদন করা সত্ত্বেও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কয়জন এই ৩ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর কথা মনে রেখেছেন? বোধহয় খুব কম নেতৃত্বই বলতে পারবেন এইসব দেশপ্রেমিকদের কথা। সাধারণ মানুষের কথা'ত না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

হিলি স্টেশন মেলব্যাগ ডাকাতি মামলা

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস। দিনাজপুর জেলার হিলি রেলস্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির ষড়যন্ত্র চলছিল বিপ্লবী দলের সদস্যদের মধ্যে।

দিনাজপুর জেলার হিলি স্টেশনটি ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের অধীনে। আপ দার্জিলিং মেলে যাতায়াত করার পথে পড়ত পাকশি, শান্তাহার, আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, হিলি, চড়কাই, ফুলবাড়ী এবং পার্বতীপুর রেলস্টেশনগুলি। বিরামপুরের রেলযাত্রীরা সাধারণত চড়কাই রেলস্টেশন থেকে রেলগাড়ি ধরতেন।

হিলি রেলস্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির ষড়যন্ত্র হয়েছিল বিরামপুর, পলাশবাড়ী, পাঁচবিবি-সহ বিভিন্ন স্থানে। ১৯৩৩ সালের ২৪শে অক্টোবর থেকে ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে হিলি স্টেশনে ডাকাতি করার পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছিল। ক্রমাগত তিনদিন অর্থাৎ ২৪, ২৫ এবং ২৬শে অক্টোবর হিলি স্টেশনে ডাকাতি করার সবরকম প্রচেষ্টা নেওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে ডাকাতির পরিকল্পনা থেকে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের সরে আসতে হয়েছিল। হিলি রেলস্টেশনে অবশেষে মেলব্যাগ ডাকাতি করা হয়েছিল ২৭/২৮ অক্টোবর রাতে। ডাকাতিটিতে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীরা বোধহয় কোনদিনই ভুলতে পারেননি সেই দারুণ রাতটির কথা।

হিলি রেলস্টেশন ডাকাতিটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সরোজকুমার বসু, হরিপদ বসু, প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল, কালীপদ সরকার, অশোকরঞ্জন ঘোষ, শশধর সরকার এবং লালু পানডে। এঁরা সকলেই ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য।

বিপ্লবী দলের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিশাল পরিমাণ অর্থের। আর্থিক প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বিপ্লবীদের নিতে হয়েছিল একাধিক ডাকাতি করার পরিকল্পনা। হিলি রেলস্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতিটি ছিল বিপ্লবীদের বিভিন্ন ডাকাতির মধ্যে একটি।

দিনাজপুর জেলার বিপ্লবী দলের ডিস্ট্রিক্ট-ইন-চার্জ ছিলেন প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল এবং সরোজকুমার বসু ছিলেন দিনাজপুর টাউনের টাউন-ইন-চার্জ। উপরোক্ত বিপ্লবীরা ছিলেন কলকাতা অনুশীলন সমিতির অধীনে দিনাজপুর বিপ্লবী শাখার সাথে যুক্ত।

বিপ্লবীরা হিলি রেলস্টেশনে ডাকাতি করার আগে সবাই সমবেত হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন দুটি জায়গা। এই দুটি জায়গার মধ্যে একটি ছিল বিরামপুর। অপরটি পাঁচবিবি। হিলির উত্তরে ছিল বিরামপুর আর দক্ষিণে ছিল পাঁচবিবি।

বিপ্লবী দলের সদস্য আব্দুল কাদের চৌধুরী পাঁচবিবিতে নির্জন স্থান দেখে একটি বাড়ি

ভাড়া নিয়েছিলেন। একদিকে বিরামপুরের সাহা ও পালেদের বাড়ি। অন্যদিকে পাঁচবিবির আব্দুল কাদেরের বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি। দিনাজপুর জেলার এই বিপ্লবী ঘাঁটিগুলিকে কেন্দ্র করে দলের নেতৃত্ব একাধিক কিশোর ও যুবককে বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত করেছিলেন।

দিনাজপুর বিপ্লবী শাখা ২৪শে অক্টোবর হিলি রেলস্টেশনে মেলব্যাগ ডাকাতির পরিকল্পনা নিয়েছিল।

ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় ২৪শে অক্টোবর দিনের বেলা অশোক ও সরোজ সাইকেলে চেপে বিরামপুরে পৌছেছিলেন। তাঁদের দুজনকে দিনাজপুর থেকে সামজিয়া হয়ে বিরামপুরে আসতে হয়েছিল। বিরামপুর পৌছে অশোক ও সরোজের প্রথমেই দেখা হল কিরণের সাথে। কিরণের সাথে দেখা হওয়ার পর তাঁরা তিনজনে মিলে গৌর পালের বাড়িতে যান। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন অনিল। এর পর গৌর পালের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন হৃষিকেশ এবং শশধর।

কিরণের বিরামপুরে একটি দর্জির দোকান ছিল। তিনি তাঁর দর্জির দোকানটিতেই সরোজ, শশধর, হৃষিকেশ এবং অশোকের জন্যে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন দুপুরবেলা খেতে বসে দিনাজপুর টাউনের টাউন-ইন-চার্জ সরোজ সবাইকে উদ্দেশ্য করে জানিয়ে দিলেন তাঁরা সকলে মিলে সেদিনই রাত ৮-১০ মিনিটে চড়কাই রেলস্টেশন থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরে হিলি রেলস্টেশনে পৌছবেন। পরিকল্পনামত চড়কাই রেলস্টেশনে পৌছে কিরণ হিলি যাওয়ার জন্য ৪টি রেলের টিকিট কিনে শশধর, হৃষিকেশ, অশোক এবং সরোজের হাতে দিলেন। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসটি চড়কাই এসে থামতেই উপরোক্ত ৪ জন হিলির উদ্দেশ্যে রেলগাড়িটিতে উঠে বসলেন।

অন্যদিকে অপর একটি দল জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে হিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল রাত ৯-৪০ মিনিটের গাড়িতে। এই দলটিতে ছিলেন সত্যব্রত এবং রামকৃষ্ণ। সত্যব্রত ও রামকৃষ্ণের ট্রেনটি যখন পাঁচবিবি রেলস্টেশনে এসে থামল, তখন আব্দুল কাদের তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজনকে নিয়ে পাঁচবিবি থেকে ট্রেনটিতে উঠে বসলেন হিলির উদ্দেশ্যে।

প্রায় কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তিনটি দলই এসে পৌছলেন হিলি রেলস্টেশনে। হিলি স্টেশনে পৌছনর পর তিনটি দলের সদস্যরাই নিকটবর্তী গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে এসে মিলিত হলেন। জায়গাটি ছিল হিলি রেলস্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। পুকুর পাড়ে জমায়েত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ, সত্যব্রত, হৃষিকেশ, সরোজ, হরিপদ, প্রফুল্ল, আব্দুল কাদের, রামকৃষ্ণ, অশোক এবং শশধর।

ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে সবাই নিজেদের বেশভূষা পাল্টে নিলেন। সঙ্গে নিলেন বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু নিজেদের প্রস্তুত করার পর দেখা গেল ঘড়িতে রাত ৩টা। প্রায় ভোরের আলো ফোটার সময় হয়েছে। সুতরাং নানাদিক বিচার করে সেদিনের মত ডাকাতি করার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। ঠিক হল পরের দিন রাতে ডাকাতি করা হবে। অগত্যা দলের ১০ জন সদস্যই পাঁচবিবিতে ফিরে গেলেন। কেউ কেউ ফিরলেন ট্রেনে আবার কেউ কেউ পাঁচবিবিতে ফিরলেন পায়ে হেঁটে।

২৫শে অক্টোবর দিনের বেলা হরিপদ ও প্রফুল্লকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শান্তাহার এবং চড়কাইতে। তাঁদের উপর নির্দেশ ছিল আরো কিছু দলের সদস্যকে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট ডাকাতিটিতে অংশগ্রহণ করানোর। এবার পরিকল্পনা নেওয়া হল দলের সদস্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে হিলিতে পৌছবেন। আরো ঠিক হল একটি ভাগের সদস্যরা হিলি যাবেন ট্রেনে। অপর ভাগটি হিলিতে উপস্থিত হবেন পায়ে হেঁটে।

২৫ তারিখ পরিকল্পনা মাফিক পায়ে হেঁটে যাওয়ার দলটি প্রথমে যাত্রা শুরু করল। অপর দলটি পরে ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে পৌছল। ট্রেনে আসা দলটির ট্রেন হিলি স্টেশনে থামতেই প্রথমেই ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন হরিপদ। তাঁর সঙ্গে ট্রেনে থেকে নেমেছিলেন দলের অপর একজন সদস্য। প্ল্যাটফর্মে নামতেই কয়েকজন মুসলমান যাত্রীর ফিসফিসানি কথাবার্তা তাঁদের কানে এল। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু কথা হরিপদর কানে পৌছল যা শোনার পর ২৫ তারিখ রাতে ডাকাতির পরিকল্পনাটিও তাঁদের বাতিল করতে হল। আবার সবাই মিলে আব্দুল কাদেরের বাড়িতে ফিরে এলেন।

২৬শে অক্টোবর হঠাৎ আব্দুল কাদের নিজেই আমাশা রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁকে স্থানীয় ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানো হল। সেদিনও ডাকাতি করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হল আব্দুল কাদেরের অসুস্থতার জন্য। সেই কারণে সেদিন সবাই মিলে পাঁচবিবিতে রাত কাটালেন।

২৭শে অক্টোবর শুক্রবার দুপুরের ট্রেন ধরে প্রাণকৃষ্ণ, শশধর এবং প্রফুল্ল পাঁচবিবি থেকে চড়কাইতে পৌছলেন। চড়কাইতে এসে কিরণের সাথে তাঁরা যোগাযোগ করলেন। সেখান থেকে কিরণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ৩ জন বিরামপুরে গৌর পালের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

২৭শে অক্টোবর শশধর দিনের বেলা ফুলবাড়ি থেকে জোগাড় করলেন কালিপদকে। কিরণ জোগাড় করলেন অনিলকে। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে অনিল, প্রফুল্ল, কালিপদ, শশধর এবং কিরণ সবাই মিলে এলেন চড়কাই রেলস্টেশনে। কিরণ কিনে আনলেন সকলের জন্য রেলের টিকিট। রাত ৯-১০ মিনিটে চড়কাই থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরে হিলি রেলস্টেশনে পৌছলেন উপরোক্ত ৫ জন।

অন্যদিকে পাঁচবিবি থেকে প্রাণকৃষ্ণ, সত্যব্রত, হৃষিকেশ, সরোজ, হরিপদ, রামকৃষ্ণ এবং অশোক রাত ১০-১২ মিনিটের ট্রেনটি ধরে হিলিতে পৌছলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি স্যুটকেশ এবং অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র।

সেদিন অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর নওগাঁও থেকে শান্তাহার হয়ে হিলিতে পৌছলেন বিজয় চক্রবর্তী এবং লালু পানডে। আবারও তিনটি দলের সব বিপ্লবী সদস্যরা পূর্বের নির্দিষ্ট পুকুরের পাড়টিতে এসে উপস্থিত হলেন। এইখানে প্রত্যেককে পোশাক এবং অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হল। ডাকাতিতে বিপ্লবী দলের সেদিনের কমান্ডার ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ। সহ-কমান্ডার ছিলেন হৃষিকেশ। এই দিন ডাকাতি দলে ছিলেন ১৩ জন বিপ্লবী। এঁরা সবাই ২৭/২৮ তারিখ রাতে ডাকাতির সময় হিলি রেলস্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দলের নির্দেশ অনুযায়ী। ডাকাতির আগে নির্দিষ্ট কাজকর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেককে।

আক্রমণকারীরা বেশভূষা পরিবর্তন করে পুকুর পাড় থেকে ডাবল মার্চ করে এগুলেন হিলি রেলস্টেশনের দিকে। আগ্নেয়াস্ত্রধারীরা তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুড়তে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়লেন।

স্টেশনে মেলব্যাগগুলি ছিল মেলচেস্টের মধ্যে তালা লাগানো অবস্থায়। স্টেশনমাস্টারের অফিস ঘরে ছিল একাধিক বাক্স। এই বাক্সগুলিতেও ছিল তালা দেওয়া। এছাড়া ছিল স্টেশন ঘরে লোহার সিন্দুক।

মেল পিওন কালিচরণ একটি খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমচ্ছিল মেলচেস্টের পাশে। কালিচরণের অন্য সহকর্মী জীতেন্দ্র ঘুমচ্ছিল মেলচেস্টের উপরে শয্যা বিছিয়ে।

প্রথমেই মেলচেস্টের সামনে গিয়ে কালিচরণকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হল। তার কাছ

থেকে মেলচেস্টের চাবি চাওয়া হল। কালিচরণ চাবি দিতে অস্বীকার করায় তার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হল আক্রমণকারী ডাকাতদের। কোনক্রমে আক্রমণকারীদের হাত ছাড়িয়ে কালিচরণ দৌড়তে শুরু করল বাইরে যাওয়ার গেট লক্ষ্য করে। তার গলা থেকে চীৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল।

প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথের পাশে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন ডাকাত-দলের একজন বিপ্লবী সদস্য। কালিচরণকে চীৎকার করতে করতে বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে স্টেশনের প্রবেশপথের সামনে মোতায়েন আগ্নেয়াস্ত্রধারী তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়লেন। কালিচরণ গুলিবিদ্ধ হল। গুলি লাগা অবস্থায়ও কালিচরণ দৌড়ে যাত্রীদের নির্দিষ্ট প্রবেশপথ দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেও কালিচরণ দৌড়বার চেষ্টা করতেই একটি ঢালু জায়গায় পা হড়কে পড়ে গেল। সামনেই ছিল আলগু নুনিয়ার কুঁড়েঘর। অতিকষ্টে নিজের দেহটিকে মাটি থেকে তুলে আবার দৌড়বার চেষ্টা করতেই ফুট চল্লিশেক দূরে মাটিতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল কালিচরণ।

অন্যদিকে মেলচেস্টের সামনে চলছিল আর এক দৃশ্য। মেলচেস্টের উপর ঘুমিয়ে থাকা কালিচরণের সহকর্মী জীতেন্দ্রকে ঘুম থেকে তুলে তার বুকে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে প্রাণকৃষ্ণ তার কাছ থেকে মেলচেস্টের চাবি চাইলেন। জীতেন্দ্রও চাবি দিতে অস্বীকার করায় তাকে মারধর করে লাথি মেরে স্টেশন মাস্টারের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। মেলব্যাগ ভর্তি মেলচেস্টের চাবি কেড়ে নেওয়া হল জীতেন্দ্রর কাছ থেকে।

সতীশ সেখ নামে অপর একজন কুলি স্টেশনের বুকিং অফিসে ঘুমচ্ছিল। তাকেও ঘুম থেকে টেনে তোলা হল। এর পর তাকে স্টেশন মাস্টারের ঘরের বারান্দায় বের করে নিয়ে এসে লোহার রড দিয়ে তার দেহে আক্রমণ করা হল। লোহার রডের আঘাতে আহত হয়ে সতীশ পড়ে থাকল যাত্রী ছাউনিতে। আক্রমণকারীরা সরে যেতে সতীশ আহত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হল। আক্রমণকারীদের গুলি এসে লাগল সতীশের বাঁ পায়ে। সতীশের পায়ে গুলি লাগায় সে মাটিতে পড়ে গেল।

পাঁচু বিশ্বাস নামে আর একজন কুলি বুকিং অফিসেই সতীশের সাথে ঘুমচ্ছিল। তাকেও টেনে তোলা হল। বেদম প্রহার করার পর তাকে এনেও যাত্রী ছাউনির তলায় ফেলে রাখা হল প্ল্যাটফর্মের উপর। আহত অবস্থায় প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে থাকল পাঁচু বিশ্বাস।

ইলেকট্রিক টর্চের আলো পড়েছিল স্টেশনের দিক থেকে। এ ছাড়াও বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল একই দিক থেকে। স্টেশন মাস্টার নিজের কোয়ার্টারে ঘুমচ্ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে তুলে রাতের প্রহরী স্টেশনে ডাকাতির খবর দিল। স্টেশন মাস্টার অবস্থা অনুমান করে নিজের বন্দুকটি সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের দিকে গেলেন। তিনি স্টেশনের কাছে পৌঁছেই আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে নিজের বন্দুক থেকে তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়লেন। প্রত্যুত্তরে ৪/৫টি গুলি প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে স্টেশন মাস্টারকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল। ভাগ্যক্রমে স্টেশন মাস্টারের দেহে গুলির আঘাত লাগল না। গুলিগুলো এসে ছিটকে পড়ল সহঃ স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের দেওয়ালে।

এর পর আক্রমণকারী বিপ্লবী ডাকাতরা মেলচেস্ট ভেঙে ফেললেন। মেলব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বার করে ফেলা হল মেলচেস্ট থেকে। স্টেশনের টিকিট ঘরের ও অফিস ঘরের আলমারীগুলিও ভেঙে ফেলা হল। টাকা-পয়সা ভর্তি লোহার সিন্দুকটি সরিয়ে ফেলা হল। রেলস্টেশন থেকে অন্যান্য স্টেশনের যে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তাও তছনছ করে দেওয়া

হল। নগদ ৪৬২৪ টাকা এবং মেলব্যাগের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আক্রমণকারী বিপ্লবী ডাকাতরা হিলি স্টেশন ত্যাগ করলেন। এবার তাঁরা চড়কাইয়ের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

কালিচরণ সহ ঘটনার রাতে হিলি স্টেশন চত্বরে ৬ জন কুলি আহত হয়েছিল ডাকাতদের হাতে। ২৮শে অক্টোবর ভোরের দিকে আহতদের ট্রেনে করে পার্বতীপুর রেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। কালিচরণ ছিল বেহুঁশ অবস্থায়। হাসপাতালে এসে ডাক্তারি পরীক্ষার পর জানা গেল রেলকুলি যদুবংশীর বাঁ চোখ বেশ ভালরকম জখম হয়েছে। তখন তাকে সেই অবস্থায় সৈদপুর রেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সৈদপুর রেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যদুবংশীকে রাখা হয়েছিল ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত। এর পর তাকে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছিল তার চোখের দৃষ্টি ফিরে না আসায়। ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখ পর্যন্ত যদুবংশীকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে চক্ষু বিভাগে ভর্তি অবস্থায় রাখা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য যদুবংশীর। চোখের দৃষ্টি সে চিরকালের মত হারিয়ে ফেলেছিল। ডাক্তাররা তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারলেন না।

পার্বতীপুর রেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল পাঁচু আর সতীশকে। তাদের দুজনের দেহ থেকেই অপারেশন করে গুলির টুকরো বার করা হয়েছিল। এই গুলির টুকরোগুলিকে অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত দিতে গিয়ে বলেছিলেন সেগুলি ছিল এস-এস-জি পিলেট। পরের দিন পাঁচু ও সতীশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দিনাজপুর সিভিল হাসপাতালে। সুস্থ হওয়ার পর দিনাজপুরের সিভিল হাসপাতাল থেকে পাঁচুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ১৭ই ডিসেম্বর আর সতীশকে ছাড়া হয়েছিল ৩রা ডিসেম্বর।

আহত কালিচরণ, হরিজুদ্দিন এবং ইসমাইলের অবস্থা ছিল গুরুতর। পার্বতীপুর রেল হাসপাতালে আহত কালিচরণকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার শরীরে একাধিক গুলির আঘাত। অপারেশন করে তার দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে বার করা হল অনেকগুলি ২এস এস-জি পিলেট। হরিজুদ্দিনের দেহে দেখা গেল ৫৩টি মারাত্মক ধরনের ক্ষত। তার দেহ থেকেও অপারেশন করে বার করা হল অনেকগুলি ৪ বি-বি পিলেট। ইসমাইলের দেহের ক্ষতস্থান থেকে বার করা হল একটি এস-এস-জি পিলেট।

পার্বতীপুর রেল হাসপাতালে কালিচরণকে ভর্তি করার ঘণ্টা তিনেক বাদে তার জ্ঞান ফিরে এল। কালিচরণের জ্ঞান ফিরে আসার পর তার কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনার পর তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন পার্বতীপুরের সাব-রেজিস্টার। ২৮ তারিখ রাত ৮টার ট্রেনে আহত কালীচরণ, হরিজুদ্দিন এবং ইসমাইলকে ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরের দিন ভোরে আহতরা কলকাতায় পৌঁছেছিল। কলকাতায় পৌঁছনর পর আহত তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যাম্বেল হাসপাতালে। ২৯শে আগস্ট অনুমান ১০-৪০ মিনিটের সময় ক্যাম্বেল হাসপাতালে কালিচরণের দেহে আবার অপারেশন করা হল। কিন্তু কালিচরণকে বাঁচানো গেল না। সেইদিন সন্ধ্যা অনুমান ৭টার সময় কালিচরণ মারা গেল কলকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

১৩ জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করে একটি ফৌজদারী মামলা শুরু করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৬/১২০(বি)/২০১/২১৬(এ) প্রভৃতি ধারায়।

এই ১৩ জন অভিযুক্তর মধ্যে ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সরোজকুমার বসু, প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল, কালীপদ সরকার, আব্দুল কাদের চৌধুরী, কিরণচন্দ্র দে, রামকৃষ্ণ সরকার, অশোকরঞ্জন ঘোষ, শশধর সরকার এবং লালু পানডে।

এই ১৩ জন অভিযুক্ত বিচারের জন্য দিনাজপুরে তিনজন কমিশনারকে নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছিল।। স্পেশাল ট্রাইবুনালের সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) ছিলেন মিঃ ই. এস. সিম্পসন, আই-সি-এস।

ট্রাইবুনাল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছিলেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৬ এবং ৩৯৫/১২০(বি) ধারায়। তিনজন বাদে বাদ বাকি দশজন অভিযুক্ত দোষ অস্বীকার করায় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ নেওয়া শুরু হয়েছিল। ৩ জন অভিযুক্ত আসামী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মেনে নিয়ে দোষ স্বীকার করায় স্পেশাল ট্রাইবুনাল তাদের তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই কিস্তিতে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। এই তিনজন অভিযুক্তের মধ্যে ছিলেন অশোকরঞ্জন ঘোষ, শশধর সরকার এবং লালু পানডে।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল সাক্ষ্য নেওয়ার পর এবং সরকার পক্ষ এবং আসামী পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর বাকি ১০ জন অভিযুক্ত আসামীকেও দোষী সাব্যস্ত করে রায় দান করেছিলেন ১৯৩৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৬ এবং ৩৯৫/১২০(বি) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য এবং সরোজকুমার বসুর বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুনাল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। কালীপদ সরকার, রামকৃষ্ণ সরকার এবং হরিপদ বসুকে দেওয়া হয়েছিল ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল, আব্দুল কাদের চৌধুরী এবং কিরণচন্দ্র দেকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ৪ জন অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার পর স্পেশাল ট্রাইবুনাল সেই মৃত্যুদণ্ডের অদেশ হাইকোর্টের অনুমোদনের জন্য মামলার নথিপত্র এবং রায়ের নকল সমেত সবকিছু কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অপরদিকে ৪ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীসহ ১০ জন দণ্ডিত আসামীই স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেন। দোষ স্বীকার করে নেওয়া দণ্ডিত আসামী ৩ জন অবশ্য কোন আপিল করেননি।

হিলি মেল ব্যাগ ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত আসামীদের আপিল শুনানীর জন্য কলকাতা হাইকোর্টে ৩ জন বিচারপতিকে নিয়ে একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। স্পেশাল বেঞ্চের বিচারপতিদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী, জাস্টিস প্যাটারসন এবং জাস্টিস গুহ।

কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ দণ্ডিত ১০ জন আসামীর আপিল শুনেছিলেন ১৯৩৪ সালে আগস্ট মাসে। আপিলের রায় দান করা হয়েছিল ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪।

আপিলকারীদের পক্ষে হাইকোর্টে আপিলে সওয়াল করেছিলেন মিঃ পাগ, মিঃ নির্মলচন্দ্র

হাইকোর্টের কাছে আসামীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনাল-এর কাছে অপরাধ স্বীকার করা ৩ জন অভিযুক্ত আসামীকে (অশোকরঞ্জন ঘোষ, শশধর সরকার এবং লালু পানডে) দণ্ডিত করার পর তাদের দিয়েই আবার সাক্ষ্য দেওয়ানো সম্পূর্ণ বে-আইনী। স্পেশাল ট্রাইবুনালের পক্ষে দণ্ডিত আসামীদের দিয়ে সাক্ষ্যদানের অনুমতি দেওয়া আইনগত দিক্ থেকে.সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি।

হাইকোর্ট অবশ্য আইনগত এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনাল এই ব্যাপারে বে-আইনী কিছু করেন নি। তাছাড়া ৬৩ জন সরকার পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর ·প্রাথমিক ভাবে স্পেশাল ট্রাইবুনাল দেখেছিলেন হিলি রেল স্টেশনে মেল ব্যাগ ডাকাতি হয়েছিল ২৭/২৮ অক্টোবরের রাতে। ডাকাতির সময় ডাকাতদের রিভলভার এবং পিস্তলের গুলিতে কালিচরণ আহত হয়েছিল এবং পরে তার মৃত্যু ঘটেছিল এই গুলির আঘাতে। সুতরাং এই ধরনের সাক্ষ্য সাবুদের উপর নির্ভর করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগে চার্জ গঠন করা ট্রাইবুনালের পক্ষে অযৌক্তিক বা বে-আইনী কিছু হয়নি। চার্জ গঠনের ব্যাপারে অভিযুক্তদের কোনভাবেই সন্দিহান হওয়ার কারণ ছিল না বলে হাইকোর্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

হাইকোর্ট আপিলের রায় দান করার সময় স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরেছিলেন। ট্রাইবুনালের রায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে সমগ্র ডাকাতিটির একটি পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। ট্রাইবুনালের রায়ের এই অংশে বলা হয়েছিল—

"Sasadhar and Asoke were deputed to open the mail chest and cut open the mail bags and to remove therefrom the yellow and red bags containing registered covers, parcels and other articles. They were to operate under the supervision of Prafulla and had Kalipada attched to them as an extra man. They received their orders from Hrishikesh and, for the purpose of carrying out their duties, were supplied with pen knife and electric torch. Kamal (i e Prafulla) was given a sword, a knife and a torch, and Kalipada, a pen knife and an axe. They were also supplied with shirts. Bijoy, Lalu Pande and Anil were deputed to enter the station rooms, to break open all the boxes and to take possession of all the Railway Cash. These persons were armed,–Lalu with dagger, Anil with a dagger and an iron rod and Bijoy with a bhojali and they were all supplied with khaki shirts. Saroj and Satyabrata were deputed to act as "gunners" and were armed respectively, with a single barrel and a double barrel gun. To assist them in making their firing effective, Haripada was attached to Satyabrata and Ramkrishna to Saroj in the capacity of "Light man", each of them being given an electric torch. In addition, Ramkrishna was armed with an iron rod and Haripada with an iron rod and a dagger. The uniform worn by the gunners consisted of short trousers and shirts with short sleeves, while their light men were dressed in khaki short sleeved shirts with their cloths tied up tightly round their loins. A revolver and a pistol were then taken

out and loaded. Hrishikesh was armed with a revolver and a big dagger, while Prankrishna, dressed in a khaki shirt armed himself with a Pistal and carried in addition an electric torch and a dagger in its Sheath. In command of this raiding force was Prankrishna with Hrishikesh as his Lieutenant and Second-in-Command. Orders were then issed by Prankrishna to the gunners to the effect that they were to shoot down ruthlessly any person who attempted to interfere with the Commissioner of dacoity at the station. The whole party then proceeded to the motor-bus stand beyond the Station Master's quarters, where they were joined by yet another person carrying a dagger. Certain of the party got into the motor bus while the remainder sat upon a veranda of the house opposite and waited until the Up-Darjeeling Mail left Hili at 02.17 hours. They then reassembled on the road and it was arranged that when the gunners opened fire with their guns, the other porsons were ot embark upon the performance of their duties immediately."

স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ের এই অংশ থেকে পাওয়া যায় ২৭/২৮ অক্টোবরের রাতে হিলি রেল স্টেশনের ডাকাতিটিতে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের মধ্যে কে কিভাবে তাদের নিজেদের ভূমিকা পালন করেছিলেন তার একটি পরিষ্কার ছবি।

ডাকাতির রাতে আক্রমণকারীদের মধ্যে যাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল তাঁরা ডাকাতির কিছুক্ষণ আগে পরে নিয়েছিলেন খাঁকি হাফপ্যান্ট ও খাঁকি হাফশার্ট। তাঁদের হাতে রিভলবার ও পিস্তল ছাড়াও অন্যান্য অস্ত্রাদি ছিল। আক্রমণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পরেছিলেন মালকোচা দিয়ে ধুতি। গায়ে ছিল খাঁকি রংয়ের হাফশার্ট। কারো কারো হাতে ছিল বৈদ্যুতিক টর্চ। কারো কারো হাতে ছিল সাধারণ টর্চ। অনেকের হাতে ছিল লোহার রড, ছোরা, চাকু এবং ভোজালি। বিপ্লবীরা ডাকাতি করার সময় মেলচেস্ট ভাঙার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন কুড়ুল।

শশধর এবং অশোকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মেলচেস্ট ভেঙে মেলব্যাগগুলি বের করে আনার। মেলব্যাগগুলির মধ্যে আবার ছিল একাধিক হলুদ এবং লাল রংয়ের ব্যাগ। এই হলুদ এবং লাল ব্যাগগুলির মধ্যে থাকত রেজিস্ট্রি কভার, পার্সেল এবং আরো অন্যান্য জিনিসপত্র।

শশধর এবং অশোককে মেলচেস্ট ভেঙে মেলব্যাগ বের করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল প্রফুল্ল এবং কালিপদকে। মেলব্যাগগুলি কেটে সেইসব ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে শশধর, অশোক, প্রফুল্ল এবং কালিপদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দলের কমান্ডার হৃষিকেশ। তাঁদের এই কাজ হাসিল করার জন্য তাঁদের হাতে দেওয়া হয়েছিল ছুরি এবং বৈদ্যুতিক টর্চ। এছাড়াও প্রফুল্লর হাতে ছিল তলোয়ার। কালিপদর কাছে ছিল পেন-ছুরি এবং কুড়ুল। এদেরকে পরতে দেওয়া হয়েছিল খাঁকি রংয়ের হাফশার্ট।

বিজয়, লালু এবং অনিলের উপর দায়িত্ব ছিল স্টেশন ঘরে ঢুকে সেখানকার বাক্স ভেঙে রেলের টাকা লুট করার। অনিল এবং লালুর হাতে ছিল ছোরা। বিজয়ের হাতে ছিল ভোজালি। এদের ৩ জনকেও পরতে দেওয়া হয়েছিল খাঁকি হাফশার্ট।

সরোজ ও সত্যব্রতর হাতে ছিল একনলা এবং দুনলা বন্দুক। এই দুজনকে সাহায্য করার

জন্য প্রস্তুত ছিলেন হরিপদ ও রামকৃষ্ণ। এই দুজনেরই হাতে ছিল বৈদ্যুতিক টর্চ। এ ছাড়াও রামকৃষ্ণের হাতে ছিল লোহার রড এবং হরিপদর কাছে ছিল লোহার রড আর ছোরা।

বন্দুকধারী সরোজ এবং সত্যব্রতর পরনে ছিল খাঁকি রংয়ের হাফপ্যান্ট এবং হাফশার্ট। রামকৃষ্ণ এবং হরিপদর গায়ে ছিল খাঁকি হাফশার্ট আর পরনে ছিল মালকোচা দিয়ে ধুতি। এঁদের কাছে ছিল গুলিভর্তি রিভলভার এবং পিস্তল। যাঁর নির্দেশে ডাকাতির দলটি পরিচালিত হচ্ছিল, সেই দলের কমান্ডার হৃষিকেশের কাছে ছিল রিভলভার এবং একটি বড় আকারের ছোরা। প্রাণকৃষ্ণের কাছে ছিল পিস্তল, ছোরা এবং বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন দলের সহঃ নেতা। দলের কমান্ডার হৃষিকেশের নির্দেশমত সমগ্র আক্রমণটি পরিচালিত হয়েছিল ছবির মত।

কমান্ডার হৃষিকেশ দলের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হিলি রেলস্টেশনে ডাকাতি করার সময় যে কোন লোক বাধা দিলে বন্দুক, রিভলবার এবং পিস্তল থেকে নির্বিচারে গুলি ছুঁড়তে হবে বাধাদানকারীকে লক্ষ্য করে।

ডাকাতি অভিযানটি শুরু করার আগে দলের সবাই স্টেশনের কাছে মোটর বাসস্ট্যান্ড এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আপ দার্জিলিং মেলটি হিলি স্টেশন ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করেছিলেন মোটর বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায়।

আপ দার্জিলিং মেলটি হিলি রেলস্টেশন ছেড়ে গেল রাত ২-১৭ মিনিটের সময়। আপ দার্জিলিং মেল ছেড়ে যেতেই দলের সবাই এসে জড় হলেন স্টেশনের কাছে রাস্তার উপর। দলের উপর কমান্ডারের নির্দেশ ছিল বন্দুকধারীরা স্টেশনে ঢুকে গুলি ছুঁড়ে সংকেত দিলে দলের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের কাজ শুরু করে দেবেন। ঘটনার রাতে দলের কমান্ডারের নির্দেশমতই কাজ হয়েছিল হিলি রেলস্টেশনে।

হাইকোর্টে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল ডাকাতির রাতে হিলি রেলস্টেশনে কালিচরণ সহ ৬ জন রেলের কুলি ডাকাতদের গুলিতে আহত হয়নি। বলা হয়েছিল তারা সবাই আহত হয়েছিল স্টেশন মাস্টারের পিস্তল থেকে ছোঁড়া গুলিতে। এ ছাড়াও বলা হয়েছিল গুলিবিদ্ধ হওয়ায় কালীচরণের মৃত্যু হয়নি। কালিচরণের মৃত্যু হয়েছিল ডাক্তারদের ভুল অপারেশনের জন্য। আহত অবস্থায় কালিচরণকে টানা-হ্যাঁচড়া করে কলকাতায় নিয়ে না এলে তার মৃত্যু ঘটত না। সেই অবস্থায় তার চিকিৎসা হওয়া উচিত ছিল হিলি কিংবা পার্বতীপুরের হাসপাতালে। হিলিতে অথবা পার্বতীপুরে কালীচরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে কলকাতায় নিয়ে আসার ধকল তার শরীরের উপর দিয়ে যেত না। কালীচরণকে অনায়াসে বাঁচানো যেত। আসামী পক্ষের এইসব বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে হাইকোর্ট মেনে নিতে পারেননি।

দিনাজপুরে স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে দেওয়া সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং মামলার নথিপত্র বিচার-বিবেচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিলেন দণ্ডিত আসামীদের ক্ষেত্রে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত।

হাইকোর্ট আপিলের শুনানীর পর কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট আপিলের রায় দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

প্রথমত, সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে হিলি রেলস্টেশনে ডাকাতি চলাকালীন অবস্থায় ডাকাতদের গুলিতে রেলের কুলি কালিচরণ আহত হয়েছিল। তার মৃত্যুও হয়েছিল এই গুলির আঘাতে।

দ্বিতীয়ত, ইসমাইলের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় কালিচরণের পাশে ডাকাতির সময় সে দুজন ডাকাতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। দুজন ডাকাতের মধ্যে একজন তার হাতের বৈদ্যুতিক টর্চ থেকে টর্চের আলো ফেলছিল। অপরজন কালিচরণকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। ইসমাইলের সাক্ষ্যের সাথে এই ব্যাপারে অন্য সাক্ষীর সাক্ষ্যর মিল ছিল বলে হাইকোর্ট আপিলের রায়ে উল্লেখ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, দণ্ডিত আসামী অশোক তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন ডাকাতির রাতে দলের যে সব সদস্যের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল তাঁরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাঁদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছোঁড়েননি। তাঁরা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই ক্রমাগত গুলি ছুঁড়েছিলেন। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতির সময় তাঁদের কেউ যেন বাধা দিতে সাহস না করে। প্রকৃতপক্ষে কালিচরণকে হত্যা করার জন্য গুলি ছোঁড়া হয়নি। বাধা প্রতিহত করার জন্য তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

চতুর্থত, কালিচরণের শব ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছিলেন কালীচরণের মৃত্যুর কারণ আহত অবস্থায় তার শরীরের উপর দিয়ে অত্যধিক ধকল। কলকাতায় ট্রেনে করে নিয়ে আসার ধকল সাঙঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় কালীচরণ সহ্য করতে পারেননি। ডাক্তার আরো বলেছিলেন কেবলমাত্র দেহে গুলির আঘাতের জন্যই কালীচরণের মৃত্যু হয়নি।

এই প্রসঙ্গে শব ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের সাক্ষ্যর অংশবিশেষ তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—"A shot of the kind found by me might remain in the abdominal cavity capsuled without causing harm."

এইসব বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে হাইকোর্ট বলেছিলেন দণ্ডিত কোন আসামীর বিরুদ্ধেই ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। হিলি স্টেশনে ডাকাতিতে ডাকাতদের কারোকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না বলে হাইকোর্ট সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। হাইকোর্ট অবশ্য সিদ্ধান্তে এসেছিলেন আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ডাকাতি করার ষড়যন্ত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইবুনালের সাথে এই ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্ট দণ্ডিত আসামীদের শাস্তির আদেশের পরিবর্তন করেছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুদণ্ড রদ করে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। প্রফুল্ল ও সত্যব্রতর বিরুদ্ধে দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ পাল্টে তাঁদের দেওয়া হল ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আব্দুল কাদের, রামকৃষ্ণ এবং হরিপদকে দেওয়া হল ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। কিরণের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালের দেওয়া দণ্ডাদেশ পাল্টে হাইকোর্ট ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। আপিলে হাইকোর্ট থেকে কালিপদ ছাড়া পেয়েছিলেন।

আপিলের রায় লিখেছিলেন বিচারপতি তিনজনের মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখার্জী। বিচারপতি প্যাটারসন এবং বিচারপতি গুহ স্যার আশুতোষের সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন।

বিচারপতি গুহ স্যার আশুতোষের সাথে সহমত পোষণ করা সত্ত্বেও আলাদাভাবে বলেছিলেন—আপিলকারী সত্যব্রত চক্রবর্তী ওরফে মণি, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য ওরফে অনুকূল, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ওরফে প্রাণ ওরফে কাকা ওরফে কালোদা ওরফে মহেন্দ্র, হরিপদ বসু ওরফে রামবাবু, প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল ওরফে কমল ওরফে অমল, আব্দুল কাদের চৌধুরী ওরফে ডাক্তারদা, কিরণচন্দ্র দে, রামকৃষ্ণ সরকার ওরফে মন্ডল, সরোজকুমার বসু ওরফে

কেতু এবং কালিপদ সরকারের বিরুদ্ধে স্যার আশুতোষ অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনালের দেওয়া দণ্ডাদেশের পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বিচারপতি গুহ বিচারপতি প্যাটারসন দুজনেই বলেছিলেন তাঁরাও স্যার আশুতোষের সাথে একমত হয়ে আপিলের নিষ্পত্তি করছেন।

১০ জন দণ্ডিত আসামীর পক্ষে মোট ৪ টি আপিল দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এই আপিল ৪টির একই সঙ্গে রায়দান করা হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর।

রাইটার্স অভিযানে বিনয়-বাদল-দীনেশ

১৯০৫ থেকে ১৯৩৫। এই সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী দলগুলির ছিল বিশেষ ভূমিকা।

পরাধীন ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবীদের কণ্ঠে আওয়াজ উঠেছিল—'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'। অন্যথায় 'ইংরেজ খতম কর'। 'বন্দেমাতরম'।

বিপ্লবী দলগুলির নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংরেজ তাড়াতে গেলে প্রয়োজন সশস্ত্র আন্দোলনের। অহিংসার বুলিতে ভিজবে না অত্যাচারী ইংরেজ প্রশাসন। তাই অনেক বিপ্লবী দলই কর্মসূচী নিয়েছিল ইংরেজ আমলা এবং

ইংরেজ প্রশাসনের দালালদের উপর সশস্ত্র আঘাত হানার। দলের নেতৃত্বের ডাকে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্যরা ইংরেজনিধন যজ্ঞে। ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—'দেশের মাটি থেকে ইংরেজকে মেরে তাড়াতে হবে।'

এই সময় বিপ্লবী দলগুলির মাধ্যমে চলছিল রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের কাজ। মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক দিয়ে বানানো হচ্ছিল বিশেষ ধরনের বোমা। সাথে সাথে চলছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা ব্যবহারের তালিম দেওয়ার কাজ।

বিনয়-বাদল-দীনেশ। এই তিন নির্ভীক বাঙালী যুবক ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সক্রিয় সদস্য। এই তিন বিপ্লবী দেশের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। এদের প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন।

বিনয়-বাদল-দীনেশের বিপ্লবী জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় পরাধীন ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনে বিপ্লবী দলগুলির ভূমিকা। এসে যায় বাংলার একাধিক বিপ্লবী দলের ইতিহাস।

বাংলার বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যায় 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর পার্টি, চট্টগ্রামের 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি', 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স', 'মালদার বিপ্লবী দল', 'কলকাতা অনুশীলন সমিতি', 'মেদিনীপুর বিপ্লবী দল', 'বিপ্লবী কমিউনিস্ট সংগঠন', 'স্বরাজ পার্টি'র। এছাড়াও ছিল একাধিক বিপ্লবী সংগঠন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে তৃতীয় দশকের মধ্যে বাংলার বিপ্লবী দলগুলি জন্ম নিয়েছিল।

১৯০৬-০৭ সালে পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা শহরে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির শাখা-সংগঠন হিসেবে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে গড়ে উঠেছিল একাধিক বিপ্লবী সমিতি বা দল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির শাখা-সংগঠনগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল নারায়ণগঞ্জের ব্রতী সমিতি, সিরাজগঞ্জের বান্ধব সমিতি। এছাড়া ছিল সোনামুখী সমিতি, হবিগঞ্জ সমিতি, সতীপাড়া সমিতি, মধ্যপাড়া সমিতি প্রভৃতি।

সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বিপ্লবী দলের সভ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত আধা মিলিটারী কায়দায়। বিপ্লবীদের শরীর-চর্চার দিকেও দৃষ্টি দিতে হ'ত।

বিশেষত বাংলার বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রধান প্রধান গুপ্ত ঘাঁটিগুলি ছিল কলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিং, রাজশাহী, মেদিনীপুর, নাটোর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, হুগলি, সিলেট, চট্টগ্রাম, হাওড়া, দিনাজপুর, ২৪-পরগনার টিটাগড়, ব্যারাকপুর, বরানগর, আলমবাজার প্রভৃতি জায়গায়।

একদিকে বিপ্লবী দলের মাধ্যমে চলছিল সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি, অন্যদিকে চলছিল জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে অহিংস স্বদেশী আন্দোলন। বিভিন্ন সময় স্বদেশীরা বাজারে বাজারে পিকেটিং করেছিলেন। স্বদেশীদের কাছ থেকে এসেছিল বিদেশী জিনিস বর্জন করার ডাক। বিদেশী জিনিস বয়কট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে।

বিপ্লবী দলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল বিপ্লবী ইস্তেহার, পুস্তক-পুস্তিকা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'বর্তমান রণনীতি' (The Art of Modern Warefare) এবং 'মুক্তি কোন পথে' (The Way of Salvation lies)। মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত হ'ত 'মেদিনী বান্ধব' নামে দৈনিক পত্রিকা। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় একাধিক নিবন্ধ ছাপা হত বিপ্লবীদের কাজকর্ম সমর্থন করে।

অরবিন্দ ঘোষের লেখা প্রবন্ধ—'দেশবাসীর প্রতি' (To my Countrymen) ছাপা হয়েছিল 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় ১৯০৯ সালে। ছেপেছিলেন পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির বোমার আঘাতে মুজাফ্‌ফরপুরে নিহত হয়েছিলেন মিসেস কেনেডি এবং মিস্ কেনেডি। এই ঘটনায় ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে প্রফুল্ল চাকি সায়ানাইড্ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কেনেডি হত্যা মামলায় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছিল। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির আদেশ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধে। সম্ভবত ১৯০৭ সালে। সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন মেদিনীপুরের মানুষ।

১৯০৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর অরবিন্দের লেখা 'আমার স্বদেশবাসীর প্রতি' (To my Countrymen), 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় কলকাতার নারায়ণ প্রেসে কলকাতার পুলিশ তল্লাসী অভিযান চালিয়েছিল। কারণ এই 'কর্মযোগিন' পত্রিকা মনোমোহন ঘোষের সম্পদনায় কলকাতার নারায়ণ প্রেস থেকে ছাপা হ'ত। নিবন্ধটির লেখক অরবিন্দ ঘোষ আত্মগোপন করায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পত্রিকার সম্পাদক ও 'নারায়ণ প্রেসের' মালিক মনোমোহন ঘোষকে। নিম্ন আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হলেও হাইকোর্ট থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন।

১৯০৯ সালে ননীগোপাল সেনগুপ্ত -৪৬ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছিল ষড়যন্ত্রের ও রাজদ্রোহিতার। বলা হয়েছিল ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অভিযুক্তরা ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংরেজ সরকারের অপসারণ। মামলাটি 'হাওড়া গ্যাং কেস' নামে পরিচিত ছিল।

১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে যুবক মানবেন্দ্র রায় বার্লিন এবং

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী মতাদর্শ ব্যক্ত করে। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"The infamous methods by which British Imperialism sucks the life blood of the Indian people are well known. They cannot be condemned too strongly not will simple condemnation be of any practical value. British rule in India was established by force; therefore, it can and will be overthrown only violent revolution......

The people of India must adopt violent means which the foregin domination based upon violence cannot be ended.

The people of India are engaged in the great revolutionary struggle. The Communist International is whole-heartedly with them."

মানবেন্দ্র রায়ের এই চিঠিটি থেকে বুঝতে অসুবিধা ছিল না কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল' বিশ্বাস করত হিংসার বদলে হিংসার নীতিতে, অর্থাৎ রক্তের বদলে রক্ত।

অহিংসার পথে অত্যাচারী ইংরেজকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে সরানো যাবে না প্রায় সব বিপ্লবী সংগঠনই এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করত। বিপ্লবীদের কণ্ঠে ছিল—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। বিপ্লবীদের মন্ত্র ছিল ইংরেজের উপর সশস্ত্র আঘাত হানার।

বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন—'blood calls for blood:' রক্তের বদলে রক্ত চাই। হান আঘাত। আর আঘাত! ইংরেজের উপর সশস্ত্র আঘাত হেনে বিব্রত করে তোল ইংরেজ সরকারকে। ইংরজকে ক্ষমা নেই।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে দেশের মুক্তি আন্দোলনে কত বিপ্লবী সৈনিক ফাঁসিকাঠে জীবন দিয়েছিলেন। আজ হয়ত অনেকেই জানেন না ফাঁসি মঞ্চের বিপ্লবীদের সকলের নাম। পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলনে সামিল হয়ে ইংরেজের উপর সশস্ত্র আঘাত হানতে গিয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সূর্যকুমার সেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, তারকেশ্বর দস্তিদার, বসন্তকুমার বিশ্বাস, ভগৎ সিং, অবোধবিহারী, আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ, দীনেশ গুপ্ত এবং আরো একাধিক বিপ্লবী। এ ছাড়াও একাধিক মামলায় স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে বহু বিপ্লবীর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী যুবতীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। চট্টগ্রামের ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সদস্যা কল্পনা দত্তের হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বাংলার গভর্নর জন অ্যান্ডারসনের মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা নেওয়ায় উজ্জ্বলা মজুমদারেরও হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অবশ্য কলকাতা হাইকোর্ট আপিলে উজ্জ্বলা মজুমদারের বিরুদ্ধে দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ সংশোধন করে তাঁর বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। চট্টগ্রাম 'রিপাবলিকান আর্মির' সাথে যুক্ত ছিলেন বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দার। সশস্ত্র অভিযানের সময় প্রীতিলতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন সায়ানাইডের পুরিয়া। অ্যাকসনের পরে পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে প্রফুল্ল চাকির মতই প্রীতিলতা সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। জীবিত অবস্থায় ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ব্যবধান শুধু সময়ের। প্রফুল্ল চাকি সায়ানাইডে নিজের জীবন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন ১৯০৮ সালে আর প্রীতিলতা একই পথ অনুসরণ করে নিজের জীবন বলিদান করেছিলেন ১৯৩২ সালে। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যান্যদের সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পারুল মুখার্জীকে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত টিটাগড়ের বিপ্লবীদের আখড়ায় মিলিত হতেন

বিপ্লবীরা। টিটাগড়ের গোয়ালপাড়ার বিপ্লবী আখড়ায় পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বিপ্লবীরা। এই পরিকল্পনায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে পারুল মুখার্জীও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিপ্লবী দলে কাজ করার সময় পারুলকে নিতে হয়েছিল একাধিক ছদ্মনাম। পারুলের ছদ্মনামগুলির মধ্যে ছিল 'নীহার', 'শান্তি', 'আরতি', শোভারানী', 'রানী', 'খুকি', 'সুরমা' প্রভৃতি। এর পরের যুবতীদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁর নাম আসে তিনি হলেন ঢাকার সুরেশ মজুমদারের মেয়ে উজ্জ্বলা মজুমদারের।

১৯১৩ সালে অবোধবিহারী ও আমীর চাঁদের নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছিল 'লিবার্টি' লিফলেট। দিল্লী থেকে লাহোরে পাঠানো হয়েছিল সেই লিফলেট। লিফলেটের একাংশে বলা হয়েছিল—God himself worked in Khudiram Bose, Prafulla Chaki, Kanailal Dutta, Madanlal Dhingra."

লিফলেটের এই অংশ থেকে বোঝা যায়, বিপ্লবীরা ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল দত্ত এবং মদনলাল ডিংরার মত শহিদদের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এইসব শহিদদের আদর্শ ও বিপ্লবী জীবন পরবর্তী সময়ের বিপ্লবীদের দারুণভাবে আকর্ষিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। এইসব বিপ্লবীরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন।

১৯০৮ সালের ১২ই মে 'কেশরি' পত্রিকায় বালগঙ্গাধর তিলক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইংরেজী অনুবাদে প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছিল—"The Country's Misfortune"। প্রবন্ধটির একাংশে বলা হয়েছিল—No one will fail to feel uneasiness and sorrow on seeing that India, a country which by its very nature is mild and peace-loving, has begun to be in the condition of European Russia. Further more, indisputable that (the fact of) two innocent White Ladies having fallen victims to a bomb at Muzzaterpore will specially inspire many with hatred against the people belonging to the party of rebels. That many occurences of this kind have taken place in European Russia and are taking place even now, is a generally known historical fact."

এই অংশ থেকে বোঝা যায় মহামান্য তিলক ক্ষুদিরামের বিপ্লবী জীবনের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্রবন্ধটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন অ্যাক্সন করতে গেলে বিপ্লবীদের পক্ষে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ক্ষুদিরামের বোমায় কেনেডি পরিবারের দুজন মহিলার মৃত্যু নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। তবুও বলা যায় এই ঘটনা থেকে ক্ষুদিরামের ভারতবর্ষের বিপ্লবী চেতনাকে কোনভাবেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। ক্ষুদিরাম ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাসে এক আদর্শ পুরুষ। ক্ষুদিরামকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাস লেখাই হতে পারে না।

১৯৩০ সালে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছিল—

"THE INDIAN RE-PUBLICAN ARMY further declares that any person who will be able to produce any Englishman and woman or child of any age to its Head Quarters, dead or alive, will be amply rewarded."

১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদ হিল্‌সে বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে

ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির বিপ্লবী সভ্যরা ব্রিটিশ আর্মির সাথে লড়াই করেছিলেন প্রায় ২/২।। ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আর্মিকে সেই লড়াই থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিলেন রিপাবলিকান আর্মির বিপ্লবী সৈনিকরা। অবশ্য সেই লড়াইয়ে ১২ জন বিপ্লবী প্রাণ হারিয়েছিলেন। স্বাধীনোত্তরে ভারতে বোধহয় কেউ মনে রাখেননি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র এই ১২ জন শহিদের কথা।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব বিপ্লবীরা একদিন লড়াই করেছিলেন তাঁদের বুকের রক্ত ঝরিয়ে, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি আজ হারিয়ে গিয়েছে স্বাধীন ভারতবাসীর মন থেকে। আবার অনেকে জানেনই না তাঁদের কথা। সবদিক বিচার করে একটি সমগ্র বিপ্লবী ইতিহাস তৈরি করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বরিশালের সতীন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে ১৯২৯-৩০ সালে ডাক দেওয়া হয়েছিল যুবকদের দেশের কাজে যোগ দিতে। সতীন্দ্রনাথ সেন ওরফে সতীন সেন বরিশালের টাউন হলে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন, তিনি চান নির্ভীক ও কঠোর মনের যুবক-যুবতী। এই সব যুবক-যুবতী বরিশালের মাটি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বাধিক কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবেন। সতীন সেনের নেতৃত্বে বরিশালে 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন চলেছিল একাধিক দিন। তাঁর উপর গোয়েন্দা পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। সতীন সেনের দলের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন রমেশচন্দ্র চ্যাটার্জী। সাব-ইনসপেক্টর জ্যোতিষচন্দ্র রায় সতীন সেনকে একটি মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। সতীন সেনের গ্রেপ্তারের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই নিহত হয়েছিলেন পুলিশ সাব-ইন্‌পেক্টর জ্যোতিষ রায়। জ্যোতিষ রায়ের হত্যাকারী হিসেবে সতীন সেনের অনুগত স্বেচ্ছাসেবী রমেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সময় সতীন সেনের ভলান্টারদের ছোরাখেলা, লাঠিখেলা এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিতেন বটকৃষ্ণ মিশ্র। 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন করলেও সতীন সেন বুঝেছিলেন লড়াই না করতে পারলে ইংরেজের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা যাবে না।

ইংরেজ সরকারের কাছে বিপ্লবীরা ছিলেন 'সন্ত্রাসবাদী'। 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে বিপ্লবীদের গতিবিধির উপর সব সময় নজর ছিল ইংরেজ প্রশাসনের পুলিশদের।

এবার ফিরে আসা যাক্ বিনয়-বাদল-দীনেশের পরবর্তী সময়ের ঘটনায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের তারিখটি ছিল ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০। বাদল গুপ্ত রাইটার্স অ্যাক্সনের পরই সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে। সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করায় বাদলকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে পারেননি প্রতাপশালী ইংরেজ পুলিশ অফিসাররা। বিনয়কে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ঘটনার দিনেই। হাসপাতালে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ বিনয়ের মৃত্যু হয়। দীনেশও ঘটনার দিন ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁকেও সেদিনই ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। কিন্তু তিনি সুস্থ হওয়ায় অ্যাকসনের তিন বন্ধুর মধ্যে কেবলমাত্র তাঁরই বিচার হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইবুনালে।

বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান কাহিনীতে পরে আসছি। তার আগে এই তিন বিপ্লবীর পরবর্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বিশেষ কয়েকটি ঘটনা।

১৯৩৩ সালের ৮ই মে স্যার জন অ্যান্ডারসনকে দার্জিলিংয়ের লেবং রেস কোর্সে হত্যা

করার জন্য গুলি করা হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন অ্যান্ডারসন সাহেব।

অ্যান্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার সহ আরো কয়েকজন বিপ্লবী। দার্জিলিংয়ের স্পেশাল ট্রাইবুনাল ১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ভবানী, রবীন্দ্রনাথ এবং মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে দিয়েছিলেন ফাঁসির আদেশ। উজ্জ্বলা মজুমদারের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ।

আপিলে কলকাতা হাইকোর্ট ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছিলেন। যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ পরিবর্তন করে উজ্জ্বলাকে দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড। ফাঁসির বদলে মনোরঞ্জনকেও দেওয়া হয়েছিল ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। যদিও মনোরঞ্জন ব্যানার্জির উপর পুরো অ্যাক্সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী দলের পক্ষে। আইনের বিশ্লেষণে মনোরঞ্জন মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, অশ্বিনীকুমার ঘোষ এবং গোপীমোহন দাঁ-কে। অভিযোগ ছিল এইসব সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম দেশময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা। এইসব সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ছিল বরানগর এবং আলমবাজারে। এঁদের হেফাজত থেকে পাওয়া গিয়েছিল একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিলে গিয়েও তাঁর ফাঁসির আদেশ বদলায় নি। স্বভাবতই ভগৎ সিংকে গলায় পরতে হয়েছিলে ফাঁসির দড়ি।

বিপ্লবীদের আখড়া থেকে পুলিশ পেয়েছিল নানা ধরনের বই। বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটি থেকে আইরিশ বিপ্লব, তুর্কি বিপ্লব এবং চীনের বিপ্লব নিয়ে লেখা একাধিক বই পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া বিপ্লবী ঘাঁটি (ইংরেজ সরকারের কাছে যা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি) থেকে পুলিশের হাতে এসেছিল নানা ধরনের সন্দেহজনক বইপত্র। এইসব বইয়ের মধ্যে ছিল—'Infantry Training', 'Field Gunnery', 'Machine Gunners Hand Book', 'War Equipment', 'Aeroplane Construction', 'One Year of Non Co-operation', 'India in Transition', 'What We Want'.

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীট থেকে। কলকাতা পুলিশের কাছে খবর পৌছে গিয়েছিল ২৬শে জানুয়ারী তারিখটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য সুভাষ বসু ঘোষণা করবেন মনুমেন্টের কাছে এক সভায়। এই খবর পুলিশের হাতে আসায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার ২৬শে জানুয়ারী সব রকমের মিছিল, সভা-সমিতি বন্ধ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন। তবুও সুভাষ বসুকে রোখা যায়নি। সুভাষচন্দ্র বসু পুলিশ কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন কর্পোরেশন স্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গির দিকে। মিছিলের সামনে ছিলেন সুভাষচন্দ্র নিজে। এই মিছিল নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছনোর আগেই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁকে রাখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে। সুভাষচন্দ্র বসু দ্ব্যর্থ ভাষায় বলেছিলেন তিনি ইংরেজের তৈরি আইন মানেন না।

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে হত্যা করেছিলেন বিপ্লবী প্রদ্যুৎকুমার ভট্টাচার্য। এর কিছুদিন পরে আবার হত্যা করা হয়েছিল পরবর্তী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে ডগলাস হত্যা মামলায় প্রদ্যুৎকুমার ভট্টাচার্যকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। পরে প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্যের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছিল। বার্জ হত্যা মামলায়ও অভিযুক্তরা দন্ডিত হয়েছিলেন। অভিযুক্তরা সবাই ছিলেন বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত। মেদিনীপুর চিরকালই দিয়েছেন বহু বীর বিপ্লবীকে। এক কথায় মেদিনীপুরকে বলা যায় রত্নগর্ভা।

ডগলাস হত্যা মামলা ট্রাইবুনালে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তদানীন্তন অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্যসহ মামলার বিবরণ ছাপায় পত্রিকার সম্পাদক ট্রাইবুনাল অবমাননার দায়ে পড়েছিলেন। অভিযুক্ত করা হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সাথে মুদ্রাকরকেও। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, ফরওয়ার্ড, বন্দেমাতরম দৈনিক পত্রিকাগুলি সব সময় সমর্থন করেছেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ এই তিন যুবকের বিপ্লবী জীবন নিশ্চয় যে কোন ভারতবাসীর গর্বের বিষয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতবাসী অবশ্যই গুটি কয়েক বিপ্লবীকে মনে রেখেছেন। এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্যকুমার সেন, (মাস্টারদা), প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল দত্ত, মদনলাল ডিংরা, সুভাষচন্দ্র বসু, উল্লাসকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভগৎ সিং।

কিন্তু কজনই বা জানেন সত্যেন বসু, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, হেমচন্দ্র ঘোষ, ভবানী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বিপ্লবী জীবনের কথা।

সেদিক থেকে বিনয়-বাদল-দীনেশ নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। এঁদের কথা অন্তত মনে রেখেছেন ভারতবাসীর একটা বড় অংশ। এঁরা যে ভারতবর্ষের বিপ্লবী ইতিহাসের নায়ক।

এবার ফিরে আসা যাক্ বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযানের ঐতিহাসিক দিনটিতে।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। এই বিশেষ দিনটিকে বেছে নিয়েছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃত্ব।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। সর্বাধিনায়ক ছাড়া দলের নেতৃত্বে ছিলেন হরিদাস দত্ত, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, প্রফুল্ল দত্ত, মণীন্দ্র রায় এবং রসময় শূর।

দলের অ্যাকসন স্কোয়াডের দায়িত্বে ছিলেন হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, প্রফুল্ল দত্ত, সুপতি রায় এবং নিকুঞ্জ সেন।

রাইটার্স অভিযানের মাস তিনেক আগে ঢাকায় হত্যা করা হয়েছিল হাডসন এবং লোম্যানকে। লোম্যানকে গুলিবিদ্ধ করেছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিনয় বসু। ঘটনার দিন ছিল ২৯শে আগস্ট, ১৯৩০।

রাইটার্স বিল্ডিংসে বসতেন উচ্চপদাসীন ইংরেজ অফিসাররা। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃত্বে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন রাইটার্সে ঢুকে ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করার দলের নেতৃত্ব ভাবছিলেন কাদের উপর এই অসম সাহসী কাজের ভার দেওয়া যায়।

বিনয় বসু লোম্যানকে হত্যা করার পর বিনা কাজে দিন কাটাচ্ছিলেন। ছটফট করছিল তাঁর বিপ্লবী মন! বেশীদিন আত্মগোপন করা তাঁর ধাতে সয় না। বিনয় চাইছিলেন কোন দুঃসাহসিক কাজ। এই সময় পুলিশ কমিশনার টেগার্টের শ্যেন দৃষ্টি ছিল সবদিকে।

এই সময় লোম্যান হত্যাকারী বিনয়কে খোঁজা হচ্ছিল সম্ভাব্য সব জায়গায়। পুলিশ কোন সন্ধান পাচ্ছিল না বিনয়ের। বিনয়ের ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সর্বত্র। ঘোষণা করা হয়েছিল বিনয়কে ধরিয়ে দিতে পারলে ইনাম দেওয়া হবে। ইনাম দশ হাজার টাকা। পুলিশের কাণ্ডকারখানা দেখে চিন্তার বদলে বিনয় হাসছিলেন।

কারা বিভাগের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসন বসতেন রাইটার্স বিল্ডিংসে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তৈরি হত্যা তালিকার শীর্ষে নাম রাখা হয়েছিল লেঃ কর্নেল সিম্পসনের। সিম্পসনের পরে যাঁদের তালিকায় নাম ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেক্রেটারী মি আলবিয়ান, ইনসপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ এবং জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন।

রাইটার্স অভিযানের জন্য দলের পক্ষ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বিনয়-বাদল-দীনেশকে। এই তিনজনের দলে বিনয় বসুকে দেওয়া হয়েছিল মেজরের পদ। দীনেশ ছিলেন ক্যাপটেন, আর বাদলকে করা হয়েছিল লেফটেন্যান্ট।

দলের পক্ষ থেকে এই দুঃসাহসী কাজের দায়িত্ব পেয়ে এই তিনজন বিপ্লবী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন।

অসমসাহসী যুবক তিনজনেই ছিলেন ঢাকা জেলার সন্তান।

৭ই জুলাই রাতে বিনয় বসু ছিলেন মেটুয়াবুরুজে রাজেনবাবুর বাড়ীতে। বাদল এবং দীনেশ গুপ্ত ছিলেন নিউ পার্ক স্ট্রীটে বিপ্লবীদের গুপ্ত আখড়ায়।

রাইটার্সে অ্যাকশন করতে ৮ই ডিসেম্বর সকালের দিকেই এই তিনজনকে বেরিয়ে যেতে হবে দলের অ্যাকসন স্কোয়াডের পরিকল্পনা অনুযায়ী।

বিনয়-বাদল-দিনেশের উপর নির্দেশ ছিল ইউরোপীয়ানদের মত পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁদের রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রবেশ করতে হবে।

তিন বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ ৮ই ডিসেম্বর বেশ ভোরের দিকে ঘুম থেকে উঠেছিলেন। তিনজনেই ছিলেন বেশ উৎফুল্ল। কোন টেনশন ছিল না তাঁদের চোখে মুখে।

· এইবার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা হবে নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাসই হবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের পাথেয়।

তিনজনই উল্লসিত। কিছুক্ষণ পরে রাইটার্সে ইংরেজের রক্তে শুরু হবে হোলিখেলা। এতদিন বিনয়-বাদল-দীনেশ স্বপ্ন দেখতেন এই ধরনের একটি অ্যাকশনের। সেই স্বপ্ন যখন একবার বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ তাঁদের জীবনে এসেছে, তাঁরা যে কোন মূল্যে সেই স্বপ্ন সফল করবেনই। কোন শক্তি তাঁদের ফেরাতে পারবে না তাঁদের অনুসৃত পথ থেকে। যত দুর্গমই হোক্ না কেন সেই পথ।

এই তিন বিপ্লবীই জানতেন রাইটার্স বিল্ডিংসে অ্যাকশন করার পর তাঁদের পক্ষে জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। তাই তাঁরা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে রাইটার্স যাত্রার প্রাক্কালে সঙ্গে করে নিয়েছিলেন সায়ানাইডের পুরিয়া। অ্যাকশনের পর কিছুতেই তাঁরা ইংরেজের হাতে ধরা দেবেন না। ইংরেজরা ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে জাতশত্রু।

প্রশ্ন জাগে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের খতম তালিকায় প্রথমেই কেন কারা বিভাগের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল লেঃ কর্নেল সিম্পসনের নাম রাখা হয়েছিল?

১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে বন্দী অবস্থায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত্য বক্সীর মত কিছু নেতৃত্ব। একের পর এক রাজবন্দীদের গ্রেপ্তার করে এনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভরিয়ে ফেলা হচ্ছিল। এইসব রাজবন্দীদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য এবং অহিংস আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা। নতুন বন্দীদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছিল না রাজবন্দীদের নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে। অসহনীয় অবস্থা। বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল রাজবন্দীদের মধ্যে।

এই সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের জেল সুপার ছিলেন সোমদাত নামে এক পাঞ্জাবী অফিসার। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল জেলের অন্যান্য ওয়ার্ডগুলিতে। সোমদাত অবস্থা বুঝে নতুন রাজবন্দীদের পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন সাধারণ কয়েদীদের ওয়ার্ডে। রাজবন্দীদের প্রতি এই ধরনের ব্যবহারে ক্ষেপে উঠলেন বন্দীরা। প্রতিবাদ জানালেন তাঁদের চোর-ডাকাতদের সাথে রাখায়। শুধু চোর-ডাকাতদের সাথে একই ওয়ার্ডে থাকাই নয়, রাজবন্দীদের পরতে দেওয়া হয়েছিল কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন রাজবন্দীরা। জেলসুপার সোমদাতের এই অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন নতুন এবং পুরাতন রাজবন্দীরা।

জেল সুপার সোমদাত রাজবন্দীদের প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করতে পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। পাগলা ঘন্টি শুনেও কোন রাজবন্দী ওয়ার্ডে ফিরে গেলেন না।

জেল সুপারের এই ব্যবহারে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন রাজবন্দীরা।

সোমদাত রাজবন্দীদের উচিৎ শিক্ষা দিতে জেল পুলিশের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন—চার্জ। জেল পুলিশ সুপার সাহেবের আদেশ পেয়ে শুরু হ'ল তাণ্ডব। লাঠিপেটা করল রাজবন্দীদের। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হলেন একাধিক রাজবন্দী।

সেদিন পাগলা ঘন্টি শুনে নিজেদের ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সুভাষ বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সত্য বক্সীর মত নেতৃত্ব। জেন পুলিশের লাঠির আঘাতে তাঁরাও আহত হয়েছিলেন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের উপর লাঠি চার্জের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল জেলের বাইরে। সাধারণ মানুষের কাছে খবর পৌঁছে গেল পুলিশের লাঠি চার্জে সুভাষচন্দ্র বসু আহত। সাধারণ মানুষও এই সব ঘটনার কথা শুনে প্রতিবাদে সোচ্চারিত হয়ে উঠেছিলেন।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃত্ব ও সভ্যদের কানে পৌঁছে গেল জেল সুপারের এই অন্যায় অত্যাচারের কথা। এই ঘটনার বদলা নিতে এগিয়ে এলেন বিপ্লবীরা। সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, সত্য বক্সীর উপর জেলের ভিতর পুলিশের লাঠি চার্জ তাঁদের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল।

দলের নেতৃত্বের আদেশে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সভ্য বীরেন ঘোষ সঙ্গে অপর একজন বিপ্লবী সদস্যকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা পকেটে ভরে নিলেন গুলিভর্তি পিস্তল।

ইংরেজ প্রশাসন বুঝতে পারলেন অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। সোমদাতকে বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দিতে না পারলে তাঁর জীবন সংশয় অনিবার্য। সন্ত্রাসবাদীরা সেন্ট্রাল জেলের ঘটনার বদলা নেবেনই। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সোমদাতকে দ্রুত বদলি করে দেওয়া হ'ল। প্রাণে বাঁচলেন জেল সুপার সোমদাত।

সোমদাত বদলি হয়ে প্রাণে বাঁচলেন কিন্তু বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্তে এসেছিলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সেদিনের ঘটনার পিছনে রয়েছেন কারা বিভাগের ইন্‌সপেক্টার জেনারেল লেঃ কর্নেল সিম্পসন। তিনিই নাটের গুরু। সুভাষ বসুর গায়ে যখন হাত পড়েছে তখন ক্ষমা নেই সিম্পসনের। বিপ্লবীরা বোঝেন রক্তের বদলে রক্ত।

আবার পরামর্শে বসলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃত্ব। সে কোন উপায়ে সিম্পসনকে প্রাণে শেষ করতে হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের গুপ্ত সভায়। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কাজটা খুবই কঠিন ছিল। কারণ সিম্পসন সাহেব বসেন রাইটার্স বিল্ডিংসে। পুলিশের কড়া নজর রাইটার্সের আনাচে কানাচে। রাইটার্সে ঢুকে লেঃ কর্নেল সিম্পসনের অফিস চেম্বারে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল।

এই কঠিন কাজটি করতে পারেন বিনয়-বাদল-দীনেশ। বিনয় এর আগে লোম্যানকে হত্যা করে প্রমাণ করেছেন তাঁর নিশানা ভুল হয় না। কোন ব্যাপারেই তিনি ভয় পান না। বিনয়ের মত বিপ্লবীর বেশিদিন চুপ করে বসে থাকাও সম্ভব ছিল না। বিনয়কে রাইটার্স অভিযানের নেতা নির্বাচিত করা হল।

সবাই একমত হলেন তিনজন বিপ্লবীর একটি ছোট দল বিনয় বসুর নেতৃত্বে রাইটার্সে ঢুকে অ্যাকশন করবেন। এই তিনজনের দলে থাকবেন—বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত। বাদল গুপ্ত তিনজনের মধ্যে বয়সে ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। তিনি সবে আঠারোয় পা দিয়েছিলেন সেই সময়।

অ্যাকশনে বিনয়কে দেওয়া হ'ল মেজরের পদ। তিনি অপারেশনের নেতা। তাঁরই নির্দেশ মত চলবে রাইটার্সে অ্যাকশন।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০। শেষ বিদায়ের দিন। বিনয়-বাদল-দীনেশ তিনজনই জানেন তাঁদের জীবনের শেষ পরিণতি। শেষ পরিণতি যখন জানাই আছে তবে আবার ভয় কিসের? বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অ্যাক্‌সন স্কোয়াডের রসময় শূর নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছেছিলেন মেটিয়াবুরুজের রাজেনবাবুর বাড়িতে। তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল বিনয়কে পরিকল্পনামাফিক সঠিক জায়গায় হাজির করানোর। প্রায় একই সময় খিদির পুরের পাইপ রোডের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল দুটি ট্যাক্সি। প্রথম ট্যাক্সিটি থেকে নেমে এসেছিলেন বিনয় বসু এবং রসময় শূর। দ্বিতীয়টি থেকে বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত এবং নিকুঞ্জ সেন। ট্যাক্সি দুটিকে ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

অ্যাকসনের তিন বিপ্লবী সৈনিক মিলিত হলেন খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ে। এবার তাদের যেতে হবে ডালহৌসি স্কোয়ারে। তাঁদের সাথে থাকবেন না অ্যাকশন স্কোয়াডের কোন নেতৃত্ব।

পাইপ রোডের মোড় থেকে একটি ট্যাক্সি ধরা হ'ল। উঠে বসলেন বিনয়-বাদন-দীনেশ। যতক্ষণ ট্যাক্সিটি চোখের আড়ালে না গেল, রসময় শূর আর নিকুঞ্জ সেন দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানে। নতুন নাটকের তিন নায়ককে নিয়ে ট্যাক্সিটি অল্প সময়ের মধ্যেই চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল।

রাইটার্সের সামনে ট্যাক্সিটি এসে দাঁড়িয়েছিল অনুমান বেলা বারোটায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এসেছিলেন ইউরোপীয়ান সাজে সজ্জিত তিন বীর বিপ্লবী। পরনে ছিল তাঁদের প্যান্ট, কোট, টাই। মাথায় ছিল সাহেবী টুপি। রাইটার্সে একতলার সদর গেটের সামনে সব সময় আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশ মোতায়েন থাকত। সদর গেটের পুলিশ অফিসারদের উপর নির্দেশ

ছিল কোনভাবেই যেন সন্ত্রাসবাদীরা ফাঁক্ ফোকর দিয়ে রাইটার্সে ঢুকতে না পারে। ব্যবস্থা ছিল সব রকম কড়া পাহারার।

বিনয়-বাদল-দীনেশ ট্যাক্সি থেকে নেমেই গট্ গট্ করে হেঁটে যাচ্ছিলেন সদর গেটের দিকে। তিন ইউরোপীয়ান সাহেবকে দেখে গেটের পুলিশ তাঁদের বাধা'ত দিলই না বরং এই তিন আগন্তুককে বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করে সেলাম ঠুকেছিল সদর গেটের পাহারারত পুলিশ অফিসাররা।

বিনয়-বাদল-দীনেশ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সোজা সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে গেলেন। দোতলায় সুরক্ষিত কক্ষে বসতেন সব উচ্চপদের প্রশাসনিক ইংরেজ আমলালা। অনেকেই সেদিন দেখেছিলেন রাইটার্সের দোতলার বারান্দায় এই তিনজন আগন্তুককে। ভেবেছিলেন বিশিষ্ট এই তিন ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কারা বিভাগের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল সিম্পসন সাহেব বসতেন রাইটার্সের দোতলার সুরক্ষিত একটি কক্ষে।

বিনয়-বাদল-দীনেশ এসে দাঁড়ালেন সিম্পসনের ঘরের সামনে। সুইংডোর ঠেলে বিনা বাধায় তাঁরা ঢুকে পড়লেন সিম্পসনের কক্ষে।

সেই সময় সিম্পসন তাঁর চেয়ারে বসে একান্ত সচিব জ্ঞান গুহর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলছিলেন।

আগন্তুক তিনজনকে দেখে জ্ঞান গুহ সরে দাঁড়ালেন। সিম্পসন সাহেব তাঁদের দিকে তাকাতেই গর্জে উঠল বিনয়-বাদল-দিনেশের হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র। দ্রুম-দ্রুম-দ্রুম আওয়াজে রাইটার্সের সুরক্ষিত দোতলার অংশ কেঁপে উঠেছিল। সিম্পসন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারেননি। তাঁর চেয়ারের উপরই তাঁর দেহটি এলিয়ে পড়েছিল।

অ্যাকশনের প্রথম কাজ শেষ। এবার দ্বিতীয় পর্বের শুরু। মেজর বিনয় বসু তাঁর ক্যাপটেন এবং লেফটেন্যান্টকে উদ্দেশ করে বললেন, এবার যেতে হবে হোম সেক্রেটারী আলবিয়ানের কক্ষে। ঝটপট্ সিম্পসনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিন বিপ্লবী। তিন যুবকের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হোম সেক্রেটারীর কক্ষপথে। নিমেষের মধ্যে তাঁকে গুলি করে শুইয়ে দিলেন বিনয়ের দল।

হোম সেক্রেটারীর কক্ষের সামনেই লাগানো ছিল তাঁর নামের ফলক। দ্রুততার সাথে তাঁর কক্ষে ঢুকে পড়লেন বিনয়-বাদল-দীনেশ। আবার শোনা গেল দ্রুম-দ্রুম-দ্রুম আওযাজ। সবাই অবাক। খোদ রাইটার্সে চলছে মহাকাণ্ড। ছোটাছুটি শুরু হল গুলির আওয়াজ শুনে। রাইটার্সে কর্মরত কর্মচারীরা গুলির আওয়াজ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আশ্চর্য! হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান সাহেব মুহূর্তের মধ্যে কোথায় কিভাবে যেন লুকিয়ে পড়েছিলেন। রাইটার্সের সুরক্ষিত জায়গায় গুলির আওয়াজ শুনে নিজের চেম্বার থেকে ছুটে এসেছিলেন ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ। তাঁর হাতে ছিল গুলিভর্তি পিস্তল।

বিনয়-বাদল-দীনেশকে লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লেন মিঃ ক্রেগ। বিপ্লবী তিনজনও প্রতি-উত্তর দিলেন গুলি ছুঁড়ে। রক্তের বদলে রক্তের খেলা। বিপ্লবীদের আবার ভয় কিসের? তাঁরাও রক্ত দিয়ে হোলি খেলতেই এসেছেন। মিঃ ক্রেগ ভয় পেয়ে সরে পড়লেন। এই অবস্থায় ছুটে এসেছিলেন মিঃ ফোর্ড। তিনিও বিপ্লবীদের অগ্নিমূর্তি দেখে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচালেন।

মিঃ ফোর্ড পালিয়ে যেতে এগিয়ে এসেছিলেন অ্যাসিস্টান্ট ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ জোন্স্। তিনিও বিপ্লবী তিনজনকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লেন। বিপ্লবীদের গায়ে স্পর্শ করল না সেই গুলি। অবস্থা বুঝে মিঃ জোন্স্ও মিঃ ফোর্ডের পথ অনুসরণ করেছিলেন। পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন মিঃ জোন্স্।

রাইটার্স থেকে লালবাজার বেশি দূরে নয়। লালবাজারে নিজের অফিসে পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট সব সময় প্রস্তুত। সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে কলকাতার পুলিশ কমিশনার খুবই সতর্ক ছিলেন। বিপ্লবরা মিঃ টেগার্টের কাছে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী!

পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি রাইটার্সে সন্ত্রাসবাদীদের অ্যাকশনেব কথা জানতে পেরে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে এসেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিংসে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট ছিলেন অত্যন্ত সাহসী পুলিশ অফিসার। তিনিও সহসা ভয় পাওয়ার মানুষ ছিলেন না।

মিঃ টেগার্ট তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে রাইটার্সের গেটে পৌঁছে দেখলেন অজস্র কর্মচারী রাইটার্স ছেড়ে রাস্তার নেমে এসেছেন। সকলের চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া।

মিঃ টেগার্টের পিছু পিছু রাইটার্সের গেটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন।

পুলিশে পুলিশে ছয়ালাপ। রাইটার্সকে ঘিরে রণক্ষেত্র। তিন বিপ্লবী যবক কাঁপিয়ে তুলেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিংস। এই সময় মাঝে মাঝে রাইটার্সের ভিতর থেকে ভেসে আসছিল 'বন্দেমাতরম' স্লোগান। অস্বাভাবিক ঘটনা, ইংরেজ প্রশাসনের ইজ্জত ধূলায় লুণ্ঠিত।

সন্ত্রাসবাদী দমনে দিনরাত শলা-পরামর্শ চলত রাইটার্স বিল্ডিংসে আর লালবাজারে। স্বয়ং ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ এবং ইনস্পেকটার জেনারেল অফ প্রিজন মিঃ সিম্পসন বসতেন রাইটার্স বিল্ডিংসের সংরক্ষিত এলাকায়। লালবাজারে বসতেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট এব ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন। রাইটার্স আর লালবাজারের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ ছিল।

রাইটার্সের উচ্চ পদাসীন পুলিশ অফিসাররা এই তিন বিপ্লবীর ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ওঁদের পিস্তল এবং রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়ার দাপট লক্ষ্য করে। কিন্তু পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ছিলেন বে-পরোয়া পুলিশ অফিসার।

টেগার্ট সাহেব রাইটার্সে পৌছে সবার আগে উদ্যত পিস্তল নিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে অতি দ্রুত উঠে গিয়েছিলেন দোতলার সংরক্ষিত এলাকায়। টেগার্টকে দেখে অন্যান্য পুলিশ অফিসারও তাঁর পিছু পিছু উপরে উঠেছিলেন। বিরাট পুলিশবাহিনী ছিল তাঁদের সঙ্গে। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র!

মিঃ টেগার্ট যখন এসে গিয়েছেন এবার হবে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। এ যেন মহাসমরে দুপক্ষ, Blood Calls for blood.

ভয় কিসের! দেশের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তিন বিপ্লবী যুবক জেনেশুনে মরতেই'ত এসেছেন। অত্যাচারী ইংরেজের পুলিশ ধারণাই করতে পারেনি খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে ঢুকে তিনটি যুবক সবাইকে কাঁপিয়ে দিতে পারেন। এ যে স্বপ্নাতীত এক মহা প্রলয়।

এবার শুরু হল দু-পক্ষের লড়াই। দু-দিক থেকেই ছুটে আসতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি।

দ্রুম-দ্রুম-দ্রুম। ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স তার অফিস ছিল না। সেদিনের দুপুরে রাইটার্স চেহারা নিয়েছিল এক রণক্ষেত্রের। লড়াই! লড়াই! লড়াই!

একদিকে ইংরেজ প্রশাসনের বেতনভোগী পুলিশ, অন্যদিকে তিন দেশপ্রেমিক যুবক। পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের বোধহয় জানা ছিল না দেশপ্রেমিক এই তিন যুবকের ছিল না কোন মরণের ভয়।

বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বিপ্লবীরাও বিশ্বাস করতেন—স্বাধীনতা কেউ হাতে ধরিয়ে দেয় না। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়। তার জন্য চাই সশস্ত্র সংগ্রাম। আসুক মৃত্যু। ঝরুক রক্ত। সেই রক্ত মুছে ফেললেও দাগ যায় না।

"রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।"

মিঃ টেগার্টের মত জাঁদরেল পুলিশ অফিসার এই তিন যুবকের বিক্রম দেখে ভয়ে প্রথমে কিছুটা পিছিয়ে এসেছিলেন।

প্রথম অবস্থার ধকল সামলে নিয়ে মিঃ টেগার্ট তাঁর পুলিশ বাহিনীকে চীৎকার করে নির্দেশ দিয়েছিলেন—ফায়ার। ফায়ার। চালাও গুলি। টেগার্টের আদেশের সাথে সাথে কাজ। গুলির পর গুলি চলল বিপ্লবী তিনজনকে লক্ষ্য করে।

বিনয়-বাদল-দীনেশ ওদের গুলির জবাব দিয়েছিলেন গুলি ছুঁড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন বিপ্লবীদের ছোঁড়' গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেল।

দলের নেতা বিনয় বসু তাঁর বিপ্লবী সাথী দুজনকে উদ্দেশ করে নির্দেশ দিয়েছিলেন শেষ গুলিটি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনভাবেই তাঁরা না থামেন। প্রতিটি গুলি বিপ্লবীদের কাছে ছিল মহামূল্যবান। পুলিশবাহিনীকে কাবু করতে চাইলেও তিন জনেরই পিস্তলের গুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

এমন সময় দেখা গেল অপর এক সাহেব বিপ্লবীদের গুলি খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। জানা গেল, সাহেবের নাম মিঃ ট্যয়নাম। ক্যাপটেন দীনেশের গুলিতে ট্যয়নাম ধরাশায়ী হয়েছিলেন।

দীনেশের নিশানার তারিফ জানালেন দলনেতা বিনয়। লড়াই চলাকালীন অবস্থায় মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি।

এই তিন-বিপ্লবী যুবকের কণ্ঠ থেকে নির্গত 'বন্দোমতরম' ধ্বনি কাঁপিয়ে তুলেছিল রাইটার্স বিল্ডিংস।

হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগল দীনেশের বাঁ হাতে। আহত স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছিল। দলের নেতা বিনয় বসু দীনেশের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন।

দলনেতার মুখ দেখে দীনেশ হাসতে হাসতে দলনেতাকে অভয় দিয়ে বললেন—'চিন্তার কিছু নেই'। বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। ডানহাত তখনও তাঁর সবল। এক হাত দিয়েই তিনি অ্যাকশন করতে পারবেন।

লড়াই থামেনি। লড়াই চলছিল। দুপক্ষ থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। ক্রমশই বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি ফুরিয়ে আসছিল। নতুন করে কার্তুজ পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল বাদলের হাতের পিস্তল থেমে গিয়েছে। দলনেতা তাঁর দিকে তাকাতেই বাদল গুপ্ত বললেন—তাঁর গুলি শেষ। আর উপায় নেই। এবার শেষ বিদায়ের পালা।

বিনয় দেখলেন তাঁর পিস্তলেও একটি মাত্র গুলি অবশিষ্ট।

দলনেতা বিনয় বসু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের জীবনের শেষ ঘণ্টাধ্বনি আসন্ন। দীনেশের কাছ থেকে জানা গেল তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রেও রয়েছে মাত্র একটি গুলি। এই অবস্থায় বিনয় জানতে চাইলেন বাদল ও দীনেশের মতামত। বাদল এবং দীনেশ দুজনই দলনেতাকে জানিয়ে দিলেন তাঁদের কোন মতামত নেই। দলনেতার নির্দেশই তাঁদের মত। তাঁর নির্দেশিত পথেই তাঁরা বিনা দ্বিধায় এগিয়ে যাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের নির্দেশে তিনজন বিপ্লবী পিস্তল উঁচিয়ে সামনের একটি ঘরে ঢুকে গেলেন। টেগার্টের পুলিশকে বিনয় বুঝতে দিলেন না তাঁদের পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে এসেছে।

বিনয় এবং দীনেশের কাছে রয়েছে মাত্র একটি করে গুলি। বাদলের পিস্তলে কোন গুলি নেই। তবু বাদল শত্রুপক্ষকে বুঝতে দিলেন না তাঁর আর কিছু করার নেই।

ভারি আশ্চর্য। তখন পর্যন্ত টেগার্ট সাহেব জানতেন না সেদিনের অ্যাকশনের তিন বিপ্লবীর মধ্যে ঢাকায় হাডসন ও লোম্যান হত্যাকারী স্বয়ং বিনয় বসু রয়েছেন। অথচ এই বিনয় বসুকে গ্রেপ্তার করার জন্য গোয়েন্দা পুলিশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশের আনাচে কানাচে। তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের ইনাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

কিন্তু বিনয়ের মত দেশের জন্য আত্মনিবেদিত বিপ্লবীকে কার সাধ্য ধরে আনে! ইংরেজ প্রশাসন জানতেন না বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলা হলেও এঁরাইতো ছিলেন প্রকৃত বিপ্লবী। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না এঁদের মাতৃ বন্দনায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩০ সালটি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি স্মরণীয় বছর।

এই বছরেই এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের (মাস্টারদা) নেতৃত্বে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, কল্পনা দত্ত, রামকৃষ্ণ ঘোষ দস্তিদার ও অন্যান্যরা আক্রমণ করেছিলেন চট্টগ্রামের দুটি অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ অফিস এবং রেল স্টেশন। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন রিপাবলিকান আর্মির পক্ষে ঘোষণা করেছিলেন 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবস'।

আর এই ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার বুকে ইংরেজ প্রশাসনের মূল কেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিংস কিছুক্ষণের জন্য হলেও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তিন বিপ্লবী সদস্য বিনয়-বাদল-দীনেশ দখল করে নিয়েছিলেন।

অন্যদিকে লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) অহিংসবাদীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর দিনটিকে পালন করা হবে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে। এর পরও যতদিন না স্বাধীনতা অর্জন করা যায় প্রতি বছরই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল লাহোর কংগ্রেসে।

এই সব ঘটনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় ১৯৩০ সালটি ছিল ঘটনাবহুল এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান একটি বছর।

ফিরে আসা যাক রাইটার্সে।

সামনের ঘরটি থেকে আওয়াজ ভেসে এল 'বন্দেমাতরম'। এর পরেই শোনা গেল ক্রম—ক্রম দুটি শব্দ। বোঝা গেল শব্দগুলি ছিল গুলির আওয়াজ।

সামনের ঘরটিতে ঢুকেই দলনেতা বিনয়ের নির্দেশে বাদল নিজের পকেট থেকে

পটাশিয়াম সায়ানায়েডের পুরিয়া খুলে খেয়ে নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বাদল ঢলে পড়েছিলেন ঘরের মেঝেতে। বিনয় এবং দীনেশ তাঁদের শেষ গুলি দুটি খরচ করেছিলেন নিজেদের উপর। তখন সব শব্দ থেমে গিয়েছিল। তিন বিপ্লবীর দেহ মেঝের উপর লুটানো অবস্থায় পড়ে ছিল।

বুদ্ধিমান চার্লস টেগার্ট বুঝতে পেরেছিলেন সন্ত্রাসবাদী তিন যুবকের গুলি শেষ। ওঁদের বোধহয় আর কিছু করবার নেই! এইবার টেগার্ট সাহেব তাঁর বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়লেন নির্দিষ্ট ঘরটিতে। ঘরে ঢুকে থমকে গিয়েছিলেন কলকাতার দোর্দণ্ড পুলিশ কমিশনার সাহেব।

দেখতে পেলেন তিন যুবকের মধ্যে একজনের দেহে প্রাণ নেই। বাকি দুজন ভীষণভাবে আহত।

বাদলের মত দীনেশও সায়ানাইডের পুরিয়া খুলে মুখে ঢুকিয়েছিলেন কিন্তু পেটে ঢুকবার আগেই তাঁর গলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল পটাশিযাম সায়ামাইড। দীনেশের ছোঁড়া শেষ গুলিটি লেগেছিল তাঁর গলার বাঁদিকে। বিনয়ের নিজের গুলি লেগেছিল তাঁর কপালে। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে বিনয় আর দীনেশ নিজেদের ওপর তাঁদের শেষ গুলিটি প্রয়োগ করেছিলেন।

টেগার্ট এগিয়ে এসেছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশের লুটানো দেহের সামনে। বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"ইয়ং ম্যান—তোমার নাম কি?"

বিনয় আহত এবং ক্লান্ত। তবু তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। টেগার্টের প্রশ্নের উত্তরে বিনয় সামান্য হেসে উত্তর দিলেন—"আমি তোমাদের সেই বিনয় বসু—যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সাহেব তোমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ। দশ হাজার টাকা ইনাম ঘোষণা করেছ।"

টেগার্ট বিনয়ের নাম শুনে বিদ্যুতাহত হলেন। এই সেই লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসু!

টেগার্ট এবার বিনয়ের কাছ থেকে জানতে চাইলেন বাকি দুজনের নাম। বিনয় তাঁর সঙ্গী দুজনের নাম জানাতে অস্বীকার করলেন।

শুরু হ'ল আহতদের দেহতল্লাসী। মৃত বাদলের পকেট থেকে একটি জাতীয় পতাকা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে অন্য কিছু পাওয়া গেল না। বিনয় এবং দিনেশ আহত অবস্থায় তখনও বেঁচে ছিলেন। তাঁদের দুজনকে তখনই পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতার মেডিকেল কলেজে। তদন্তের স্বার্থে এদের বাঁচানো বিশেষ প্রয়োজন।

পরের দিন অর্থাৎ ৯ই ডিসেম্বর সকালে ফলাও করে বিনয় এবং তাঁর দুই সঙ্গীর রাইটার্স অভিযান ও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে সিম্পসনের মৃত্যুসংবাদ সব স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

হাসপাতালে এসে টেগার্ট বিনয়ের থেকে তাঁদের দলের গুপ্ত খবর জানার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। বিনয়ের মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারলেন না। বিনয়ের আহত অবস্থায়ও তাঁর উপর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন চার্লস টেগার্ট। বিনয় বসু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর কাছ থেকে গোপন তথ্য আদায় করতে না পারা পর্যন্ত শয়তান ইংরেজ পুলিশ অফিসাররা তাঁকে রেহাই দেবেন না। বেঁচে উঠলে ওদের অত্যাচার ক্রমশই বাড়তে থাকবে। বিনয় অসুস্থ শরীরে কেবলই ভাবছিলেন কি করা যায়। তখনও তাঁর মাথায় ছিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপায় একটা কিছু বের করতেই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বিনয় তাঁর বিছানার উপর উঠে বসলেন। সামনে কেউ

ছিল না সেদিন। নার্স ডাক্তার কেউ ছিলেন না বিনয়ের বেডের কাছে। ঘটনার দিন থেকে বিনয় অনুভব করছিলেন তাঁর বেঁচে যাওয়ার অর্থ তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার। তাঁর মুখ থেকে গুপ্ত খবর না পাওয়া পর্যন্ত টেগার্টের মত অত্যাচারী পুলিশ অফিসাররা তাঁকে রেহাই দেবেন না। তাছাড়া বেঁচে যাওয়ার অর্থ পরোক্ষভাবে ফাঁসির দড়ি গলায় পরা।

বিনয়ের বিদ্রোহী মন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ভরে উঠেছিল। তিনি বিনয় বসু। লেম্যান এবং হাডসনের হত্যাকারী। যাকে ইংরেজ প্রশাসন শত চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি। তাঁকে সহ্য করতে হবে ইংরেজের বুটের লাথি? না তা সম্ভব নয়। তাঁর কাছে থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা অসম্ভব। তাঁর উপর বিদেশী শাসকের যত অত্যাচারই হোক না কেন।

বিনয় ধীরে ধীরে খুলে ফেললেন মাথায় ব্যান্ডেজ। তিনিও এক সময় ঢাকার মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁর জানা আছে তার মাথার ক্ষতের অবস্থা। তিনি তাঁর মাথায় শুকিয়ে আসা ক্ষতস্থানে হাতের আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ক্ষতস্থানটি তছনছ করে ফেললেন। ক্ষতস্থান থেকে পড়তে শুরু করল গলগল করে রক্ত। তিনি ব্যাথায় ককিয়ে উঠেছিলেন। রক্তে ভিজে গিয়েছিল তাঁর দেহ আর হাসপাতালের বিছানা। ব্যথায় লুটিয়ে পড়লেন বিনয়। তাঁর গলার আওয়াজ পেতেই ছুটে এসেছিলেন নার্স। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। মাথার ব্যান্ডেজ খোলা। রক্তে ভেসে গিয়েছে বিছানা।

কদিনের মধ্যেই বিনয়ের মাথার ঘায়ে সেপটিক হয়ে গেল। ডাক্তার নার্স অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে বাঁচাতে। পারলেন না।

১৩ই ডিসেম্বর সকাল অনুমান ৬টা, মহান বিপ্লবী বিনয় বসুর মহাজীবনের শেষ ঘন্টা বেজে গেল। ৮ই ডিসেম্বর বাদল গুপ্ত আর ১৩ই ডিসেম্বর বিনয় বসুর মৃত্যু ঘটায় তিনজনের মধ্যে বেঁচে রইলেন কেবলমাত্র দীনেশ গুপ্ত।

১৩ই ডিসেম্বর বিনয়ের মৃত্যু ঘটেছিল দীনেশের চোখের সামনে। বিনয়ের পাশেই ছিল তাঁর বেড। সকাল থেকে দীনেশ ছিলেন চুপচাপ। উদাসীন। কিছু ভাল লাগছিল না। তিনজনের মধ্যে দুজন বিদায় নিয়েছেন। তিনি পড়ে রইলেন একা। আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বাদল আর বিনয় চলে যেতে দীনেশের প্রতি প্রশাসন আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠলেন। দীনেশকে যে কোন উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। জানতে হবে বিপ্লবী দলের সব গুপ্ত খবর। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হতেই প্রতিনিয়ত চলছিল তাঁর উপর পুলিশের জেরা। অসহ্য লাগছিল দীনেশের। কিন্তু কোন উপায় নেই এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বাঁচবার।

মেডিকেল কলেজ থেকে দীনেশকে নিয়ে আসা হ'ল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। রাইটার্সে ৮ই ডিসেম্বরের ঘটনা নিয়ে হত্যা মামলা শুরু হয়েছিল।

দীনেশের বিরুদ্ধে রাইটার্সের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলার তদন্ত চলছিল। অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহের, ষড়যন্ত্রের আর হত্যার। আদালতের বিচারের রায় হওয়ার আগে থেকেই দীনেশকে রাখা হয়েছিল কনডেমড্ সেল-এ। অথচ জেল বিধি অনুসারে কনডেমড্ সেল-এ কেবলমাত্র রাখা যায় ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামীদের। নিয়মকানুন যাঁদের হাতে তাঁরাই নিয়ম ভাঙছেন। বলার কেউ নেই। ব্রিটিশ প্রশাসনের ভয় ছিল দীনেশের মত সন্ত্রাসবাদীকে কনডেমড্ সেলে না রাখলে যে কোন সময় আবার বিপদ ঘটতে পারে।

দীনেশের বিচার শুরু হয়েছিল একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। আলিপুরের দায়রা জজ গার্লিক সাহেব ছিলেন স্পেশাল ট্রাইবুনালের সভাপতি। স্পেশাল ট্রাইবুনালে ছিলেন তিনজন কমিশনার।

স্পেশাল ট্রাইবুনালেব কাছে দিনের পর দিন মামলার শুনানি চলেছিল। বাংলার মানুষের ভীড়ে আদালত ছিল সরগরম। সবাই দেখতে চান তাঁদের নয়নের মণি বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে। শুনানির সময় ভাবলেশহীন ভাবে দীনেশ দাঁড়িয়ে থাকতেন আসামীব নির্দিষ্ট কাঠগড়ায়। দিনের সাক্ষ্য সাবুদ হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের কনডেমড্ সেল-এ এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

এই সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুভাষচন্দ্র বসু, পূর্ণ দাস, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সবাই ছিলেন দীনেশের জন্য চিন্তান্বিত। এই সব নেতৃবৃন্দ অবশ্য ধারণা কবে নিয়েছিলেন মামলার রায় কী হবে।

অপর একটি কনডেমড্ সেল-এ এই সময় রাখা হয়েছিল বীর বিপ্লবী ফাঁসির আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে। কিছুদিন আগেই তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের কনডেমড্ সেলে মৃত্যুর দিন গুনছিলেন।

মামলার সাক্ষ্য সাবুদ সওয়াল জবাব শোনার পর স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে দীনেশ গুপ্তের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হ'ল। মামলার রায় জানাই ছিল। রায় ঘোষণার পর বাংলার মানুষের মধ্যে দেখা গিয়েছিল একটা চাপা উত্তেজনা। বাংলার দেশপ্রেমিক মানুষ সেদিন কেঁদেছিলেন।

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে বের হয়েছিল দীনেশের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল দলে দলে মানুষ সামিল হয়েছিল সেইসব মিছিলে।

ট্রাইবুনালের সভাপতি মিঃ গার্লিক দীনেশের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়ার পর মামলার নথিপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রিভি কাউন্সিলে। আইনগতভাবে প্রিভি কাউন্সিলের সম্মতি ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। প্রিভি কাউন্সিল থেকে সম্মতি এসে গেলেই দীনেশকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হবে। দীনেশও মানসিকভাবে প্রস্তুত। ভয়কে তিনি জয় করেছেন।

প্রিভি কাউন্সিলের থেকে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার জন্য সম্মতিপত্র এসে গিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই। ফাঁসির দিন স্থির হয়ে গিয়েছিল ৭ই জুলাই। সেন্ট্রাল জেলের রাজবন্দীরা মায় সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত বিপ্লবী বীর দীনেশ গুপ্তের জন্য চোখের জল ফেলেছিল সেদিন।

৭ই জুলাই। সকালের দিকে দীনেশ স্নান শেষ করে সূর্যমন্ত্র পাঠ করে নিলেন। জেলের সবাই সেদিন অবাক হয়েছিলেন দীনেশের মনোবল দেখে। একটু পরেই যাকে গলায় পরতে হবে ফাঁসির দড়ি তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না কোনরকম বিকার! ধীর অচঞ্চল ছিলেন ফাঁসির আসামী মহান বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। তাঁর আবার ভয় কি! দেশের জন্য লড়াই করে প্রাণ দান সে তো প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে গর্বের ব্যাপার।

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়ে গেল নির্দিষ্ট সময়ে। বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে দিনটি। ফাঁসির মঞ্চে উঠে ফাঁসির দড়িতে গলা দেওয়ার আগে দীনেশের কণ্ঠে আওয়াজ উঠেছিল—'বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম!'

জেলের বাইরে অনেকের চোখেই সেদিন দেখা গিয়েছিল কান্না ভাঙা জল। শহিদ বিনয়-বাদল-দীনেশকে কি ভোলা যায়? না, ওদের ভোলা যায় না।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের বুকের রক্ত ঝরিয়ে যাঁরা জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে

ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন, তাঁদের কথা কি ভোলা যায়? না ভোলা উচিৎ?

দীনেশ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে দীনেশ কি তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করেছিলেন?—

'ঐ যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?'

বিনয়-বাদল-দীনেশের বিপ্লবী জীবনের কথা বলতে গিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল সুকান্তের কবিতার দুটি লাইন—

'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।'

ঢাকায় লোম্যান হত্যা, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযান, জাতীয় কংগ্রেসের ২৬শে জানুয়ারীকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার ডাক প্রভৃতি কান্ডকারখানা ইংরেজ সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল। এর পরই হ'ল কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক কর্তারা ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠেছিলেন। নানাভাবে বিপ্লবীদের উপর চলছিল অত্যাচার আর নিপীড়ন।

সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের বিদেশী সরকারকে নাড়া দিতে পেরে বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই গেয়ে উঠেছিলেন—

'জনগণশক্তির ক্ষয় নেই
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।'

শুধু বিপ্লবীদের উপরই না, ব্রিটিশ সরকার প্রয়োগ করেছিলেন দারুণভাবে পীড়ন নীতি অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপরও। অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষের উপর চালানো হয়েছিল লাঠি ও বন্দুকের গুলি। দেশপ্রেমিক মানুষকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকারের পুলিশ প্রায় সব কারাগারগুলি ভরে ফেলেছিলেন। বিপ্লবীরা সহ্য করতে পারছিলেন না ইংরেজ প্রশাসনের এই অন্যায় অত্যাচার।

রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের মাস তিনেক আগে বাংলার ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ লোম্যানকে হত্যা করেছিলেন বিপ্লবী বিনয় বসু। লোম্যানকে হত্যা করা হয়েছিল ঢাকায়।

বিনয়ের দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল বাংলার গভর্নর এবং মিঃ লোম্যান কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় আসছেন। সময়টা ছিল ১৯৩০ সালের আগস্ট মাস। দারুণ সুযোগ। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃত্ব সুযোগটা ছাড়তে চাইলেন না।

এই সময় বিনয় পড়তেন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে। তিনি ছিলেন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। দলের নেতৃত্ব তাঁদের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চাইলেন বিনয়কে দিয়ে। দলের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল মিঃ লোম্যান ঢাকায় আসার পর তাঁকে সুযোগ বুঝে হত্যা করা হবে। মিঃ লোম্যান ছিলেন একজন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার। স্বভাবতই বিপ্লবীদের নজর ছিল মিঃ লোম্যানের উপর।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের উপর ভার ছিল লোম্যানকে হত্যা করার জন্য বিনয়কে তৈরী করা। বিনয় আগস্ট মাসে ছুটি কাটাতে মা-বাবার কাছে জামশেদপুরে গিয়েছিলেন। ঢাকাতে ফেরার জন্য বিনয় কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন। ভূপেন্দ্রকিশোর বিনয়কে দলের পরিকল্পনার কথা জানাতেই বিনয় গ্রহণ করলেন সেই দায়িত্ব।

কলকাতা থেকে একই রেলগাড়িতে ঢাকা পৌঁছেছিলেন বাংলার তদানীন্তন গভর্নর-সহ ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ লোম্যান। ঢাকা যাওয়ার সময় এই দু-জন ইংরেজ ছিলেন রেলগাড়ির একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায়। সেদিন বিনয় ঢাকা যাচ্ছিলেন একই গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায়।

ঢাকায় ফিরে দলের অ্যাকসন স্কোয়াডের নেতা সুপতি রায়ের সাথে দেখা করলেন বিনয় বসু। সুপতি রায়ও বিনয়কে বুঝিয়ে দিলেন কোন্ উপায়ে হত্যা করতে হবে বাংলার ইনস্‌পেক্টার জেনারেলকে।

ঢাকায় পৌঁছে যাওয়ার পর কলকাতা থেকে আনা একটি নতুন রিভলভার দেওয়া হল বিনয়কে। বিনয়ের এই ধরনের অস্ত্রই প্রয়োজন ছিল অ্যাকসনের জন্য। অস্ত্রটি হাতে আসায় বিনয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

নৌবিভাগের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ বাড অসুস্থ। তিনি চিকিৎসার জন্য রয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সব সময় তাঁর বেডের কাছে রয়েছে সশস্ত্র প্রহরী। সেদিন ছিল প্রহরীর ব্যবস্থা আরো কড়া।

সবাই অতি সতর্ক। মিঃ বাডকে দেখতে হাসপাতালে আসবেন বাংলার ইনস্‌পেক্টার জেনারেল অফ্ পুলিশ মিঃ লোম্যান।

মিঃ লোম্যানের সঙ্গে ছিলেন মিঃ হাডসন। মিঃ বাডকে দেখে লোম্যান এবং হাডসন হাসপাতালের নির্দিষ্ট ঘরটি থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার তাঁদের সিঁড়ি দিয়ে নামার পালা।

হঠাৎ দ্রুম! দ্রুম! আওয়াজ শোনা গেল। আশপাশের সবাই হকচকিয়ে উঠলেন। হাসপাতালের মধ্যে গুলির শব্দ? আশ্চর্য ব্যাপার।

গুলি এসে লাগল মিঃ লোম্যান এবং মিঃ হাডসনের গায়ে। তাঁরাই ছিলেন নির্দিষ্ট নিশানা। অব্যর্থ লক্ষ্য।

শ্বেতাঙ্গ অফিসার দুজন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আক্রমণকারী বিনয়কে অন্য কেউ দেখতে না পেলেও সরকারী কনট্রাক্টর সত্যেন সেন দেখতে পেয়েছিলেন রিভলভার হাতে বিনয়কে। সত্যেন সেন বিনয়কে আগে থেকেই চিনতেন। সত্যেন সেন বিনয়কে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হাসপাতালের দেওয়াল টপকে পালিয়ে গেলেন।

বিনয়ের রিভলভারের গুলিতে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন দুই পুলিশ অফিসার মিঃ লোম্যান এবং মিঃ হাডসন। কলকাতা থেকে বড় বড় সার্জেনদের আনা হ'ল লোম্যান এবং মিঃ হাডসনকে বাঁচাতে। না! লোম্যানকে বাঁচানো গেল না। বাংলার দুর্ধর্ষ ইনসপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ ঘটনার দিন রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সত্যেন সেনের কাছে থেকে পুলিশ জানতে পেরেছিল হত্যাকারীর নাম। আস্তে আস্তে সবাই জেনে গেল লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসুর নাম।

শাবাশ বিনয়। বিনয় বসুর মত ছেলেরাই'ত মরার দেশে প্রাণের উন্মাদনা। বিনয় ছিলেন বিপ্লবীদের গর্ব। বিনয়ের মত বয়েসের ছেলেরাই পারে দেশে বিপ্লবী উন্মাদনা জাগাতে।

পনেরো বছর বয়সে সুকান্ত লিখেছিলেন যৌবনকে স্তুতি জানিয়ে একটি কবিতা। কাবিতাটির নাম দেওয়া হয়েছিল "আঠারো বছর বয়স"।

কবিতাটিতে লেখা ছিল—

'এ বয়স যেন ভীরু কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

'আঠারো আসুক নেমে' লাইনটির মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছিলেন যৌবনচঞ্চল হোক

ভারতবর্ষ। যুবকরাই পারে যে কোন সাহসী পদক্ষেপ নিতে।

তবে কি বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বিপ্লবী যুবকদের মানসিক দাপট ও সাহসিকতা পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী কবি সুকান্ত এই কবিতাটি লিখেছিলেন?

আজ হয়ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তিন বিপ্লবীর মধ্যে রাইটার্স অভিযানের সময় বাদল গুপ্ত সবে আঠারোয় পা দিয়েছিলেন। বিনয় বসু এবং দীনেশ গুপ্ত বাদলের থেকে বছর ২/৩ বড় ছিলেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ বিপ্লবী জীবনের কথা আলোচনা করতে বসে কেবলই বারে বারে বলতে ইচ্ছা করছে—

'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

শত চেষ্টা করেও বিনয়কে পুলিশ খুঁজে পেল না। লোম্যানের হত্যাকারী বিনয় বসুকে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ইনাম ঘোষণা করেও কোন কাজ হল না।

লোম্যান হত্যার পর বিনয়ের খোঁজে ঢাকা শহরের সব সন্দেহজনক জায়গায় তল্লাসী চালিয়েছিল পুলিশ। ঢাকা শহরের বুকে চলেছিল পুলিশী তাণ্ডব। বিনয়ের সন্ধান আদায় করার জন্য সাধারণ শহরবাসীর উপর হয়েছিল অকথ্যভাবে পুলিশের অত্যাচার। ইংরেজ প্রশাসনের সভ্যতার মুখোশ খুলে গিয়েছিল লোম্যান হত্যার পরে।

এত অত্যাচার করা সত্ত্বেও বিনয় বসুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সব পথের উপর পুলিশের ছিল কড়া নজর। তবে গেল কোথায় যুবকটি?

লোম্যান হত্যার পর হাসপাতালের পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন বিনয়। ঠিক করতে পারছিলেন না এবার কোথায় যাবেন তিনি।

মনে পড়লো মণি সেনের কথা। মণি সেন থাকতেন ঢাকার বকসী বাজারে! মণি সেন ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য। হঠাৎ বিনয়ের মত ছেলে তাঁর বাড়ী আসতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন লোম্যান হত্যা রহস্য।

সারাদিন বিনয় রইলেন মণি সেনের বাড়িতে। দিনের আলো নিভতেই বিনয়কে নিয়ে মণি সেন চলে এসেছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিযার্সের অ্যাকসন স্কোয়াডের নেতা সুপতি রায়ের মেসে।

সুপতি রায়ের মেসে বিনয়কে রাখা অসম্ভব ছিল। সুপতি রায়ের পরামর্শে বিনয়কে রাতের অন্ধকারে নিয়ে আসা হ'ল ঢাকার শশাঙ্ক দত্তের বাড়ীতে। সেদিনের রাতটা বিনয়ের কাটল শশাঙ্ক দত্তের বাড়ীতে।

পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল ঢাকায় জ্যোতিষ জোয়ারদার, মণি সেন, তেজময় ঘোষ, গোপাল সেন, প্রভাত নাগ, জীবন দত্ত এবং আরো অনেককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ক্ষেপে উঠেছে ইংরেজ সরকারের পুলিশ। তাদের বিনয় বসুকে চাই। বিনয়কে গ্রেপ্তার করতে না পারলে পুলিশের ইজ্জত থাকবে না।

বিনয়কে আর একদিনও ঢাকায় রাখা সম্ভব ছিল না। সুপতি রায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিনয়কে কলকাতা পৌঁছে দেওয়ার।

ঢাকা থেকে প্রথমে যেতে হবে নারায়ণগঞ্জে। লোম্যান হত্যাকারী বিনয়কে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে আসবেন অপর এক বিনয় বসু। তাঁরা দুজনই উঠবেন নারায়ণগঞ্জের গিরিজা সেনের বাড়িতে। সেখানে থেকেই সুপতি রায়ের সঙ্গে বিনয় কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন।

ঢাকা স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জের ট্রেন ধরা দুই বিনয়ের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল! ঢাকা রেল স্টেশনে পুলিশ গিজ্‌গিজ্ করছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢাকা রেলস্টেশন থেকে

ট্রেন ধরা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং স্থির হল দোলাইগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে ট্রেন ধরা হবে। দুই বিনয় চাষীর বেশে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে দোলাইগঞ্জ রেলস্টেশনে ঢুকে পড়েছিলেন। চাষী দুজনকে কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করলেন না।

শোনা গেল, নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনেও পুলিশ গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সুতরাং নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনে ট্রেন থেকে বিনয়কে নিয়ে নামার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছনর আগেই 'চাষাড়া' স্টেশনে বিনয়কে নিয়ে নেমে পড়তে হ'ল। কি আশ্চর্য! দেখা গেল সুপতি রায় 'চাষাড়া' রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত। তিনি খবর পেয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জে বিনয় ট্রেন থেকে নামলে বিপদ হতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা। 'চাষাড়া' থেকে পায়ে হেঁটে বিনয়কে নিয়ে আসা হল নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জ আসার সময় বিনয়ের সাথে ছিলেন বঙ্গেশ্বর রায়, বকুল দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয় বিনয় বসু। এঁরা তিনজন 'চাষাড়া' থেকে ঢাকায় ফিরে গেলেন। সুপতি রায় রইলেন বিনয়ের সাথে।

পরের দিন মুসলমান চাষীর ছদ্মবেশে বিনয় বসু আর সুপতি রায় ডিঙিনৌকায় করে এসে উঠলেন বন্দরের ঘাটে। তাদের যেতে হবে বৈদ্যের বাজারে। হাঁটা পথে বৈদ্যের বাজারে এসে পৌঁছনর পর আবার উঠতে হবে নৌকায়।

বৈদ্যের বাজারে এসে বিনয় এবং সুপতি রায় চাষীর বেশ পাল্টে নিয়েছিলেন। এই নিয়ম। বিপ্লবীদের মাঝে মধ্যেই পাল্টে নিতে হয় সাজসজ্জা। যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে। এক বেশে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

এইবার একজন হলেন জমিদারবাবু। অন্যজন তাঁর ভৃত্য। যেতে হবে মেঘনার ওপারে।

বিপদ আর বিপদ।

জমিদারবাবুর নৌকাটি মেঘনার বুকে চলতে শুরু করতেই কালো করে মেঘ করে এল। ঝড় উঠল। নৌকা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সামনের একটা ঘাটে নৌকা ভেড়ানো হল। নেমে এলেন বিনয় বসু আর সুপতি রায়। নৌকা ছেড়ে দেওয়ার পর বিনয় আর সুপতি রায় আবার মুসলমান চাষার বেশ ধরলেন। এই বেশে স্টিমারে করে এসে পৌঁছলেন ভৈরবে। ভৈরব থেকে তাঁদের উঠতে হবে ট্রেনে। বিনয় আর সুপতি রায় ভৈরব থেকে ট্রেন ধরে পৌঁছলেন কিশোরগঞ্জে। কিশোরগঞ্জে এসে সুপতি বিপদের গন্ধ পেলেন। গাদা গাদা পুলিশ। সুপতি রায় জানতে পারলেন পুলিশ বিনয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? তাঁদের সেখান থেকে যেতে হবে কলকাতা। ট্রেন ধরতে হবে কিশোরগঞ্জ থেকে। অসম্ভব পরিস্থিতি। না। বিপ্লবীদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ভয় কিসের? বিপ্লবীরা পিছনের ডাকে কখনই থমকে যান না। জেনেশুনেই তাঁরা পা বাড়িয়েছেন এই বিপদসঙ্কুল পথে। বিনয়ের মনে পড়ছিল বিশ্বকবির লেখা সেই লাইন ক'টি—

কে ডাকে রে পিছন হতে
কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ
ভয় আছে সব জানা।

বিনয় নিরাসক্ত। তাঁর মনে কোন ভয় ছিল না। বিনয় ভালভাবেই বুঝেছিলেন— বিপ্লবীর শেষ পরিণতি। অসম্ভব বা ভয় এসব কথা ভেবে লাভ কী?

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামরণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখি নি মনেতে কোন আসন
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই।

কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনে এসে দুজন মুসলমান চাষা নানা কায়দায় রেলের টিকিট কালেক্টরকে হাত করে দুখানি টিকিট কিনে রেলগাড়িতে উঠে বসলেন। তাঁদের সামনেই পুলিশ প্রতিটি কামরায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসুকে। গাড়ি এসে থামল জগন্নাথ ঘাট স্টেশনে। চাষা নেমে এলেন গাড়ি থেকে। এখানেও পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর।

এবার তাঁরা স্টীমারে করে পৌঁছলেন সিরাজগঞ্জে।

সিরাজগঞ্জ থেকে ট্রেনে করে তাঁদের পৌঁছতে হবে কলকাতার শিয়ালদহ রেলস্টেশনে। সিরাজগঞ্জ থেকে বিনয়কে নিয়ে সুপতি রায় উঠে বসলেন ট্রেনে।

ট্রেনে আসতে আসতে সুপতি রায়ের মনে হল শিয়ালদহ স্টেশনে নামা তাঁদের ঠিক হবে না। সেখানে নিশ্চয়ই টেগার্ট সাহেবের পুলিশ থাকবে। প্রত্যেক যাত্রীর প্রতি নজর থাকবে পুলিশের। বিপ্লবীরা ভালভাবেই জানতেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে। নির্দয় অত্যাচারী একরোখা এই চার্লস টেগার্ট। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

আগেই সাবধান হওয়া উচিৎ। দমদম স্টেশনে গাড়ি থামতেই নেমে পড়লেন দুই ছদ্মবেশী মুসলমান চাষা। হাঁটতে লাগলেন কলকাতার উদ্দেশে।

কলকাতা শহর ছিল বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্র। কিছুদিন আগে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে যতীন দাস ইংরেজ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লাহোরে জেলে অনশন করেছিলেন। অনশনের ৬৩ দিনের মাথায় মৃত্যু হয়েছিল বিপ্লবী যতীন দাসের।

যতীন দাসের মৃত্যুতে বাংলার মানুষ ক্ষেপে উঠেছিলেন, কলকাতায় বিপ্লবীদের আখড়ায় চলছিল নানা পরিকল্পনা।

যতীন দাসের মৃতদেহ আনা হয়েছিল কলকাতায়। যতীন দাসের মৃত্যুর পর আরো ক্ষেপে উঠেছিলেন বিপ্লবীরা।

কলকাতার ওয়ালিউল্লা লেনের বিপ্লবীদের আখড়ায় এসে উঠলেন মুসলমান চাষা দুজন। সবাই যেন তাঁদেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। বিনয়কে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার পর সুপতি রায় তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। এবার তাঁর ছুটি।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে লোম্যান হত্যাকারীকে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল ঢাকা থেকে কলকাতায়।

বিনয় বসু ছিলেন পরীক্ষিত বিপ্লবী। তাই তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল রাইটার্স অভিযানের নেতা হিসেবে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল বীর বিপ্লবী বাদল এবং দীনেশকে।

এই তিন বিপ্লবীর জীবনী পড়তে পড়তে কেবলই মনে পড়ছিল—

'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা

(কাঁক্‌রী ষড়যন্ত্র)

উত্তর ভারতে ১৯২৫ সালে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনা মামলাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা' (Revolutionary Conspiracy Case)। বিপ্লবীদের কাছে মামলাটি 'কাঁক্‌রী ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত ছিল। রিভলিউশনারী পার্টি অফ্ ইন্ডিয়ার পক্ষে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে একটি গুপ্ত ইস্তাহার ছাড়া হয়েছিল। হাতে হাতে বিলি করা ছাড়াও বেশ কিছু ইস্তাহারের কপি ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল যুক্ত রাজ্যের (উত্তরপ্রদেশ) বিভিন্ন প্রান্তে। ইস্তাহারটিতে ভারতবর্ষের বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের যুবশক্তিকে সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছিল।

ইস্তাহারটি ছাড়া হয়েছিল রিভলিউশনারী পার্টি অফ্ ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের নামে। প্রেসিডেন্টের নামের স্থানে লেখা ছিল 'বিজয় কুমার'। নামটি ছিল ছদ্মনাম।

ইস্তাহারটির প্রথম পংক্তিটিতে উল্লেখ ছিল—

"Chaos is necessary to the birth of a new star and the birth of life is accompanied by agony and pain. India is also taking a new birth, and is passing through the inevitable phase, when chaos and agony shall play their destined role, when all calculations shall prove futile, when the wise and mighty shall be bewildered by the simple and the weak, when great Empires shall crumble down and new nations shall arise and surprise humanity with the splendour and glory which shall be all its own."

ইস্তাহারটির দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছিল—

"A new power had come into existence in India, that power being the revolutionary movement amongst young men, which in spite of all opposition would eventually trimph. This movement had withstood repression for twenty years. It was now stronger than ever before, and its prospects were brighter."

"India was ruled without justification by foreigners whose authouity rested on dominion by the sword. The sword of these foreigners was to be met by the sword.

তৃতীয় পংক্তির একাংশে বলা হয়েছিল—

"The aims of the revolutionary party to be international rather than

national and in this respect if follows the footsteps of the great Indian Rishis of the glorious past and of Bolshevic Russia in the modern age."

"There would be equal rights for all communities, general co-operation and the spiritual recognition of the realities of life".

"The time was not ripe for the realities of the policy and the programme of the party. The party reserved to itself freedom to associate or not to associate with the Indian Congress."

অপর আর এক অংশে আহ্বান জানানো হয়েছিল যুবকদের। বলা হয়েছিল—

"Young Indians! Shake of your illusions, face realities with a stout heart, and do not avoid struggles, diffculties and sacrifices. The inevitable is to come. Do not misguided any more. Peace and tranquility you cannot have and India's liberty can never be achieved through peaceful and legal means."

এর পর ইস্তাহারটির মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশকে তাড়াতে গেলে কেবলমাত্র জোর খাটিয়ে বা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই তা সম্ভব নয়,—বিপ্লবীদের নিতে হবে আরো কিছু নতুন পথ। কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে বিপ্লবীদের কাছে যা সশস্ত্র আন্দোলন, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের কাছে তা সন্ত্রাসবাদ। এই প্রসঙ্গে ইস্তাহারে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল—

"A few words more about terrorism and anarchism. These two words are playing the most mischievous part in India to-day. They are being invariably misapplied whenever any reference to the revolutionaries is to be made because it is so very convenient to denounce the revolutionaries under that name. The Indian revoutionaries are niether terrorists nor anarchists. They never aim at spreading anarchy in the land, and therefore, they can never be called terrorists. They do not believe that terrorism alone can bring independence and they do not want terrorism for terrorims's sake, although they may at times resort to this method as very effective means of retaliation. The present Government exists solely because the foreigners have successfully been able to terrorise the Indian People. The Indian People do not love their English masters, they do not want them to be here; but they do help the Britishers simply because they are terribly afraid of them; and this very fear resists the Indians from extending their helping hands to the revolutionaries, not that they do not love them."

"The official terrorism is surely to be met by counter-terrorism. A spirit of utter helplessness pervades every strata of our society and terrorism is an effective means of restoring the proper spirits in the society without which progress will be diffcult. Moreover, the English masters and their hired lackeys can never be allowed to do whatever they like, unhampered, unmolested. Every possible diffculty and resistance must be thrown in their

way. Terrorism has an international bearing also because the attention of the enemies of England are at once drawn towards India through the acts of terrorism amd revolutionary demonstrations and the revolutionaries are thereby able to form an alliance with them, and thus expedite the speedy attainment of India's deliverance. But this revolutionary party had deliberately abstained itself from entering into this terrorist campaign at the present moment even at the greatest provocation in the form of outrages committed on their sisters and mothers by the agents of a foreign government, simply because the party is waiting to deliver the final blow But when expediency will demand it, the party will unhesitating enter into a desperate campaign of terrorism, when the life of every officer and the individual who will be helping the foreign rulers in any way will be made intolerable, be he Indian or European, high or low. But even then the party will never forget that terrorism is not their object, and they will try incessantly to organise a band of selfless and devoted workers who will devote their best energies towards the political and social emancipation of their country. They will always remember that "the making of their nation requires the self sacrifice of thousands of obscure men and women who care more for the idea of their country than for their own comfort or interest, their own lives and the lives of those whom they love."

(Sd) VIJAY KUMAR
President, Central Council,
The R. P. of India.'

ভারতবর্ষের ইউনাইটেড প্রোভিন্সের রিভলিউশনারী পার্টির সেন্ট্রাল কাউন্সিলের পক্ষে প্রচারিত ইস্তাহারটির বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছিল পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত সশস্ত্র আন্দোলনের রূপরেখা কী হওয়া উচিত তার সম্বন্ধে বিপ্লবীদের সচেতন করে তোলার প্রয়াস। ইস্তাহারের বয়ান থেকে বোঝা যায় সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবীদের আন্দোলনের সাথে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে একাকার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হ'ত ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রশাসনের দিক থেকে। সাধারণ জনসাধারণের বিপ্লবীদের প্রতি অবশ্যই ভালবাসা ছিল কিন্তু ইংরেজের ভয়ে তাঁরা তাঁদের সেই ভালবাসা দেখাতে পারতেন না। সেই কারণেই সাধারণ মানুষ বিপ্লবীদের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। সাধারণ মানুষের বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থন থাকলেও বিপ্লবীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেননি। ইংরেজ সরকারের প্রশাসন রক্তচক্ষু দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে এমনভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলেন যার ফলে সাধারণ মানুষ নিজেদের ইংরেজ প্রশাসনের রক্তচক্ষু থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

তাই ইস্তাহারে প্রকৃত নির্দেশ ছিল টেরোরিজমকে কাউন্টার করতে হবে টেরোরিজম দিয়ে। ইংরেজ সরকারের সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মকে প্রতিঘাত করতে হবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসের বদলা সন্ত্রাস। ইংরেজ প্রভু এবং তাদের দালালদের কখনই শান্তিতে ও স্বস্তিতে থাকতে দেওয়া চলবে না। তাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সব রকম সম্ভাব্য প্রতিরোধ।

এ ছাড়াও ইস্তাহারটির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল টেরোরিজমের নিশ্চিত আন্তর্জাতিক গুরুত্ব। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনের গতি প্রকৃতি থেকে বুঝতে পারবেন ভারতবর্ষের বুকে তাদের অন্যায় প্রভুত্ব কত বেদনাদায়ক ও অনভিপ্রেত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিপ্লবীরা অন্যান্য দেশের বিপ্লবীদের কাছাকাছি কীভাবে আসতে পারবেন। তাছাড়া এ যাবৎ ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা কখনই তাদের যাত্রাপথে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম সম্বন্ধে কোন প্রচার চালাননি। অথচ আমাদের মাতৃভূমিতে বসে প্রতিনিয়ত বিদেশী শাসক আমাদের মা-বোনদের লাঞ্ছিত করে চলেছেন। অথচ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা ইংরেজের উপর জোরদার আঘাত হানার প্রচেষ্টায় কালাতিপাত করে চলেছেন।

এর পর ইস্তাহারটির মাধ্যমে বলা হয়েছিল—দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণ ঘটাতে গেলে দেশের যুবক-যুবতীকে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করে এগিয়ে আসতে হবে। সশস্ত্র আঘাত হানতে হবে ইংরেজের উপর। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কাঁপিয়ে তুলতে হবে বিদেশী শাসককে। বিপ্লবীদের নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে সমগ্র দেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এই সব লক্ষ্যকে সামনে রেখে রিভলিউশনারী পার্টি অব্ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের যুবশক্তিকে ডাক দিয়েছিলেন তাঁদের নির্দেশিত পথে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার।

১৯২৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে ইস্তাহারটির ছাপানো বহু কপি বিলি করা হয়েছিল ইউনাইটেড প্রোভিন্সের একাধিক জেলায়।

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারী পুলিশ ইনসপেক্টার সাক্ষ্য দিতে উঠে বলেছিলেন, তিনি ইস্তাহারটির ৩০৬ টি কপি সংগ্রহ করেছিলেন ইউনাইটেড প্রোভিন্সের ১৮টি জেলা থেকে। ইস্তাহারটির সংগ্রহ করা কপিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই পাওয়া গিয়েছিল স্কুলের ছাত্র ও মাস্টারদের কাছ থেকে।

এই ইস্তাহারটি ছাড়ার প্রায় এক মাস আগে অনুমান ১৯২৪ সালের ক্রিসমাসের সময় শাহজাহানপুর জেলার সন্নিহিত পিলিভিতের বামারাউলি গ্রামে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হয়েছিল।

বামারাউলি গ্রামে বাস করতেন বলদেও প্রসাদ নামে এক চিনি কলের মালিক। সন্ধ্যার কিছু পরে ২০-২৫ জনের একটি ডাকাতের দল বলদেও প্রসাদের বাড়ী আক্রমণ করেছিল। ডাকাতদের কয়েকজনের হাতে পিস্তল, রিভলভার, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তাদের হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়ে ডাকাত দল ডাকাতি শুরু করেছিল। বলদেও প্রসাদ ডাকাত দলকে দেখে বাড়ির ছাদে উঠে গিয়েছিলেন। ডাকাত দলও তাঁর বাড়ীর উঠোনে মই লাগিয়ে ছাদে উঠার চেষ্টা করছিল। বলদেও প্রসাদ ছাদ থেকে ডাকাতদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই একটি গুলি এসে লেগেছিল তাঁর গলার কাছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বলদেও প্রসাদ লাফিয়ে পড়েছিলেন তাঁর প্রতিবেশীর ছাদে। এই সময় আর একটি গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। জখম মারাত্মক না হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। গুলির শব্দে এবং হট্টগোলের আওয়াজে বামারাউলি গ্রামের গ্রামবাসীরা ছুটে এসেছিলেন বলদেও প্রসাদের বাড়ীর সামনে। তারা ডাকাতদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তেই ডাকাতরাও গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ফলে বামারাউলি গ্রামের নামকরা ব্যায়ামবীর মোহন রাম নামে একটি যুবক ডাকাতদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ডাকাতদের দল এর পর টাকা-পয়সা সোনা-গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়।

এর কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯২৫ সালের ৯ই মার্চ দ্বিতীয় ডাকাতিটি হয়। স্থান পিলিভিত জেলার বিচপুরি গ্রাম। ডাকাতি হয়েছিল এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের বাড়ীতে। ডাকাত দলের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র। ডাকাতরা কৃষকের একটি কিশোর ছেলেকে দোরের সামনে জোর করে টেনে এনে তার জিভ চেপে ধরে ধারালো অস্ত্র ধরে রেখেছিল তার জিভের ওপর। এর পর কৃষকটিকে তার কাছে থাকা টাকা-পয়সা সব ডাকাতদের দিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। ডাকাতদের কথামত কাজ না করলে কিশোরটির জিভ কেটে নেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছিল। কিছু টাকা-পয়সা দেওয়ায় কিশোরটি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। এখানেও গ্রামবাসী বাধা দিতে এলে ডাকাতদের গুলিতে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হয়েছিলেন। গুলি লেগে মারা গিয়েছিলেন শ্যামলাল নামে এক গ্রামবাসী।

তৃতীয় ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯২৫ সালের ২৪শে মের রাতে। ডাকাতির স্থান ছিল প্রতাপগড় জেলার দ্বারকপুর গ্রাম। ডাকাতিটি হয়েছিল শিউরতন নামে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে। এই ডাকাতিতে ডাকাতদের গুলিতে রামশরণ নামে এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছিল।

চতুর্থ ডাকাতিটি হয়েছিল ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট। ডাকাতিটি হয়েছিল চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। ট্রেনটি যাচ্ছিল লক্ষ্ণৌর দিকে। চেন টেনে লক্ষ্ণৌ থেকে মাইল আটেক দূরে কাঁকরী রেল স্টেশনের কাছে ট্রেনটিকে থামনো হয়েছিল। ডাকাতি করার পর লুটের টাকা-পয়সা নিয়ে ডাকাত দল নেমে পড়েছিল কাঁক্‌রীর কাছে। লুট করা টাকা-পয়সা সবই ছিল সরকারী অর্থ। ট্রেনের গার্ড সাহেব বাধা দিতে এলে তাঁকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ডাকাতের দল। মেলভ্যান থেকে সরকারী অর্থ লুটপাট হওয়ায় চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে। পর পর ৪টি ডাকাতি হওয়ার পর বিশেষভাবে পুলিশের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

ডাকাতিগুলির ধরণ দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল ডাকাতিগুলির পিছনে বিপ্লবীদের (সন্ত্রাসবাদীদের) হাত থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাকাতিগুলির তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের পুলিশ সুপার মিঃ হরটনকে। তিনি তদন্তের ভার নিয়েছিলেন ১৯২৫ সালের ১৭ই আগস্ট।

এর পর গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে ১৯২৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বানারসী লাল, বানোয়ারীলাল এবং ইন্দুভূষণ মিত্রকে। ইন্দুভূষণ ছিল অল্পবয়সী একটি বাঙালী যুবক।

গ্রেপ্তার করার পর বানারসী লালের জবানবন্দী থেকে পুলিশ জানতে পেরেছিল বামারাউলি এবং বিচপুরি গ্রামের দুটি এবং ট্রেন ডাকাতিটির পিছনে বিপ্লবীদের হাত ছিল। জানা গিয়েছিল বিপ্লবী দল (রিভলিউশনারী পার্টি অফ ইন্ডিয়া) ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য টাকা-পয়সা সংগ্রহ করছিল এই সব ডাকাতির মাধ্যমে। অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং দলের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য। পরে জানা গিয়েছিল দ্বারকপুরের ডাকাতিটির পিছনেও বিপ্লবীদের হাত ছিল।

বানোয়ারী লাল এবং ইন্দুভূষণের কাছ থেকেও বিপ্লবীদলের কাজকর্মের ব্যাপারে নানা খোঁজ-খবর পাওয়া গিয়েছিল।

এরপর তদন্ত শেষে ষড়যন্ত্র, হত্যাসহ ডাকাতি এবং রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় রিভলিউশনারী পার্টির ২১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল

করা হয়েছিল স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আইনুদ্দিনের আদালতে। পুলিশের পক্ষে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল ১৯২৬ সালে। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশবলে ২১ জন অভিযুক্তকেই লক্ষ্ণৌর দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৬ সালে দায়রা আদলতে স্পেশাল দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল মিঃ হ্যামিলটনকে প্রায় আট মাস ধরে এক নাগাড়ে সাক্ষ্য সাবুদ নিয়ে মিঃ হ্যামিলটন বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলার রায় দান করেছিলেন ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল।

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় ২১ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১৮জনকে দণ্ডিত করা হয়েছিল এই ১৮ জন দণ্ডিত আসামীর মধ্যে ছিলেন—রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রাউসন সিং, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুশরণ ডুবলিশ, মন্মথনাথ গুপ্ত, গোবিন্দচরণ কর, মাকুন্দি লাল, রামকিসান ক্ষেত্রি, প্রেমকিসান খান্না, রাজকুমার সিনহা, রামদুলারি ত্রিবেদী, রামনাথ পানডে, প্রণয়েশ কুমার চ্যাটার্জী, শচীন্দ্রলাল সান্যাল, ভূপেন্দ্রলাল সান্যাল এবং বানোয়ারী লাল।

এই ১৮ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ) এবং ১২০(বি) ধারায়। অর্থাৎ রাজদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়। এ ছাড়া এই ১৮ জন আসামীর মধ্যে রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং রাউসন সিংকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় দোষী সব্যস্ত করায় এই ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে দেওয়া হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বাকী আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দিয়েছিলেন স্পেশাল দায়রা বিচারপতি মিঃ হ্যামিলটন।

দায়রা আদালতের বিচারে মুক্তি পেয়েছিলেন হরগোবিন্দ এবং শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। অপর অভিযুক্ত দামোদর স্বরূপ অসুস্থ থাকায় তাঁকে মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১৮ জন দণ্ডিত আসামীর মধ্যে ১৫ জন দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অযোধ্যা চিফ্ কোর্টে আপিল করেছিলেন।

অন্যদিকে দায়রা আদালতে দণ্ডিত আসামী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুচরণ ডুবলিশ, মন্মথনাথ গুপ্ত, রাজকুমার সিনহা, রামদুলারি ত্রিবেদী, রামনাথ পানডে এবং প্রণয়েশকুমার চ্যাটার্জীর শাস্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সরকার পক্ষ থেকে অযোধ্যা চীফ্ কোর্টে আবেদন পেশ করা হয়েছিল।

যে ১৫ জন উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপিল দায়ের করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন আপিলকারী ছিলেন প্রণয়েশকুমার চ্যাটার্জী। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রণয়েশ পরে তাঁর পক্ষে পেশ করা আপিল মামলাটি তুলে নিয়ে অযোধ্যা চীফ্ কোর্টে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন নিজের দোষ স্বীকার করে।

দণ্ডিত আসামী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং বানোয়ারী লাল তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল করেন নি।

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দায়রা বিচারের সময় আসফাকউল্লা ও শচীন্দ্র বক্সীকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় অন্যান্যদের সাথে একই সঙ্গে তাঁদের বিচার করা যায়নি। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পর দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। আসফাকউল্লা এবং শচীন্দ্রনাথ বক্সীর বিরুদ্ধে দায়রা বিচার হয়েছিল লক্ষ্ণৌর স্পেশাল দায়রা বিচারপতি মিঃ জে. আর. ডাব্লু বেনেটের কাছে। দায়রা বিচারপতি মিঃ বেনেট এই দুজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় দান করেছিলেন ১৯২৭ সালের ১৩ই জুলাই। আসফাকউল্লাকে দোষী সাব্যস্ত

করা হয়েছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১(এ), ১২০(বি) এবং ৩৬৯ ধারায়। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। শচীন্দ্র বক্সীকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী আসফাকউল্লা ও শচীন্দ্রনাথ বক্সী দুজনেই আপিল দায়ের করেছিলেন অযোধ্যা চিফ্ কোর্টে।

আপীল আদালতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত আসামী রামপ্রসাদ সরকারী খরচে তাঁর পক্ষে আইনজীবী হিসেবে মিঃ গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিয়োগ চেয়েছিলেন। তিনি আপিল আদালতকে জানিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থকে নিয়োগ না করলে তিনি আপিল মামলায় নিজেই বক্তব্য রাখবেন। রামপ্রসাদের হয়ে আপিলে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ এল. এস. মিশ্র। তাঁর পক্ষে সরকারী খরচে মি. মিশ্রকে নিয়োগ করা হলেও রামপ্রসাদ জেলের সেলে বসে ৭৬ পাতার একটি লিখিত বক্তব্য তৈরি করে আপীল আদালতে সেই লিখিত বক্তব্যটি পেশ করেছিলেন।

অপর এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী আপিল আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে ব্যারিস্টার আর. এফ. বাহাদুরজীকে সরকারী খরচে নিয়োগ করা হোক। কিন্তু এই সময় ব্যারিস্টার বাহাদুরজী ভারতবর্ষের বাইরে থাকায় ব্যারিস্টার এইচ্. সি. দত্তকে তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। অপর মৃত্যুদণ্ডের আসামী রাউসন সিংয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ডঃ জে. এন. মিশ্র।

এই তিন আইনজীবী ছাড়াও দণ্ডিত অন্যান্য আসামীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের মিঃ কপিলদেব মালভ্য, লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের মিঃ জন জ্যাকসন্, মিঃ এইচ্, এন মিশ্র এবং মিঃ এন. সি দত্ত। এছাড়াও কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত আইনজীবী অযোধ্যা চিফ্‌কোর্টে গিয়েছিলেন দণ্ডিত আসামীদের হয়ে আপিলে সওয়াল করতে।

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলাটির সমগ্র তদন্তটি হয়েছিল মিঃ হরটনের নেতৃত্বে। আপিল আদালত আপিলের রায় দিতে গিয়ে মিঃ হরটনের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এছাড়াও আপিল আদালত প্রশংসা করেছিলেন সরকার পক্ষের প্রখ্যাত আইনজীবী পণ্ডিত জগৎনারায়ণকে।

দায়রা বিচারপতি মিঃ হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকে তাকে একপেশে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। বিচারক হিসেবে মিঃ হ্যামিলটনের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল আপীল আদালতে।

এই প্রসঙ্গে আপীল আদালত বলেছিলেন নথিপত্র পর্যালোচনার পর দায়রা বিচারপতি মিঃ হ্যামিলটনের নিরপেক্ষতা এবং সততার প্রতি আপীল আদালতের কোনরকম সন্দেহের অবকাশ নেই। মিঃ হ্যামিলটন ন্যায় বিচার করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আসামীদের (আপীলকারীদের) কোনভাবেই মিঃ হ্যামিলটন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা উচিত হয়নি।

মামলার নথি থেকে দেখা যায়, মামলার প্রধান অভিযুক্ত আসামী রামপ্রসাদ বিসমিল দায়রা আদালতের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে ১৯২৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেছিলেন—

Sir

"I have been watching the case from day to day and every new day

brought home to me instance of gross paritiality on your Honour's part. I was not astonished because the attitude of the Government was apparent to all concerned when it you as the trial Judge in this case (The Kakari Conspiracy Case). But still I thought each day the perhaps I may be biased, that perhaps I was judging too hastily, that possibly this day will be the last day. But my hopes always proved to be illusive. I found you showing more interest in establishing the prosecution case than the prosecution counsel himself. In fact in good many instances you had put questions in such a suggestive form that prosecution counsel himself felt ashamed to put those question. You almost always interrupted the defence cross-examination so obstimately that there remained no other alternative, except either to come to blows with you or to submit to your high-handedness with flushed faces and blood curdoing in one's view."

আপিল আদালতে দাণ্ডিত আসামীদের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল এই মর্মে যে, অভিযুক্তদের শনাক্ত করার জন্য জেলের ভিতরে যে ধরনের শনাক্তকরণ প্যারেড করা হয়েছিল তা বিশেষভাবে সন্দেহজনক ছিল। একই ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে শনাক্তকরণ প্যারেড এবং অভিযুক্তদের দায়রা আদালতে সোপর্দ করা বে-আইনী। তাছাড়া হস্তলিপি বিশারদও সঠিক পদ্ধতিতে হস্তরেখা পরীক্ষা করেননি। আপিল আদালত অবশ্য আসামী পক্ষের এইসব বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি।

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় হস্তলিপি বিশারদ হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন মিঃ স্টট্। আপিল আদালত অবশ্য বলেছিলেন মিঃ স্টটের হস্তলিপি সম্বন্ধে দেওয়া অভিমত সঠিক ও সন্দেহাতীত ছিল।

মামলার নথিপত্র থেকে দেখা যায়, বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় (কাঁক্‌রী ষড়যন্ত্র) অভিযুক্ত বানারসী লাল গ্রেপ্তার হওয়ার পর স্বীকারোক্তি দেওয়ায় এবং মামলায় রাজসাক্ষী হওয়ায় সরকারপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে দায়রা আদালত ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন।

বানারসী লাল ছিলেন শাহাজাহানপুরবাসী। জাতে হিন্দু ছুতোর। ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল তিরিশ। বাবার মৃত্যুর পর বেশ কিছু সম্পত্তির ও টাকা-পয়সার মালিক হয়েছিলেন বানারসী লাল। কিন্তু বে-হিসেবী স্বভাবের জন্য তাঁর টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি কিছুদিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। এরপর বানারসী লাল রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

১৯২১ সালে বানারসী লাল লোকাল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনীতি করতে করতে কোন এক সময় তিনি বিপ্লবী আসফাক্‌উল্লা এবং রামপ্রসাদ বিসমিলের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

আসফাকউল্লা ছিলেন ২৭/২৮ বছরের একজন পাঠান যুবক। থাকতেন শাহজাহানপুর। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন গোয়ালিয়রের লোক। জীবিকার জন্য শাহজাহানুপরে বহুদিন বসবাস করেছিলেন। একসময় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ায় নিজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আসফাক্‌উল্লা, রামপ্রসাদ এবং বানারসী লাল—এই তিনজন ছিলেন বিশেষ বন্ধু।

বানারসী লালের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, ১৯২১ সালে তিন বন্ধু কংগ্রেস

অধিবেশনে যোগ দিতে আমেদাবাদে গিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে তিন বন্ধু একসঙ্গে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন গয়ায়। গয়ায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে তাঁদের সাথে পরিচয় হয়েছিল প্রেমকিসান খান্নার। প্রেমকিসানও একসময় শাহজাহানপুরে কাজকর্ম করতেন।

বানারসী লালের স্বীকারোক্তি থেকে আরো জানা গিয়েছিল, ১৯২৪ সালে যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী শাহজাহানপুরে এসে বসবাস করছিলেন। শাহাজাহানপুরের মানুষের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন ''রায় মহাশয়'' এবং ''রায় দাদা'' নামে।

যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী ছিলেন ঢাকা জেলার লোক। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী শাহজাহানপুরে আসার পর একটি গুপ্ত সভা হয়েছিল রামপ্রসাদের বাড়িতে। এই গুপ্তসভাটিতে যোগ দিয়েছিলেন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, আসফাক্উল্লা, রামদুলারি, বানারসী লাল এব- রামপ্রসাদ নিজে। রামদুলারি ছিলেন কানপুরনিবাসী।

রামপ্রসাদের বাড়ির গুপ্তসভায় শাহজাহানপুরে রিপাব্লিকান পার্টির একটি শাখা গঠন করা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বিপ্লবী দলটির একটি শাখা শাহজাহানপুরে গঠন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী এবং রামদুলারির উপর। রামপ্রসাদের উপর দায়িত্ব ছিল আন্তরাজ্য বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করার। আসফাক্উল্লা আন্তরাজ্য সংগঠন তৈরি করার ব্যাপারে রামপ্রসাদের সহকারী হিসেবে কাজকর্ম করতেন। বানারসী লাল নিজে কোন নির্দিষ্ট দায়িত্বে না থাকলেও বিপ্লবী দলের একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন।

বানারসী লালের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়—'রায় মহাশয়' বিপ্লবী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে স্বাধীন ভারত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে প্রতিটি ভারতবাসীকে অস্ত্র হাতে নিতে হবে। বিপ্লবী সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে প্রতিটি ভারতবাসীকে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিটি বিপ্লবীকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। ডাকাতি করা টাকা-পয়সা দিয়ে কিনতে হবে অস্ত্রশস্ত্র। চালাতে হবে নানাভাবে প্রচার। এই জন্য ছাপতে হবে লিফলেটস্, বই এবং অন্যান্য বিপ্লবী পত্র-পত্রিকা।

'রায় মহাশয়' বিপ্লবী সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দলের কোন গুপ্ত খবর ফাঁস বা দলের সাথে যদি কেউ বেইমানী করে তাহলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

বানারসী লালের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় ১৯২৪-২৫ সালের কোন এক সময় রাউসন সিং রিভলিউশনারী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। রাউসন সিং ছিলেন জাতে ঠাকুর।

অভিযুক্ত বানোয়ারী লালও গ্রেপ্তার হওয়ার পর ১৯২৯ সালের ৩রা জানুয়ারী স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ২০শে মার্চ তিনি আবার তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেন। অস্বীকার করার কারণ হিসেবে বলেছিলেন তাঁকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। পুলিশ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিলে তাঁকে মামলা থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পুলিশের শেখানো মত তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি করেছিলেন। সুতরাং তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির উপর যেন আদালত নির্ভর না করেন। আবার দায়রা আদালতে মামলার শুনানীর সময় বানোয়ারী লাল বলেছিলেন তাঁর দেওয়া ৩রা জানুয়ারীর স্বীকারোক্তি ছিল সম্পূর্ণ সত্য। অভিযুক্ত রামপ্রসাদের অনুরোধে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর স্বীকারোক্তি ছিল মিথ্যা। তিনি বিনা প্রলোভনে এবং বিনা প্ররোচনায় ৩রা জানুয়ারি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। আদালত তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করতে পারেন।

দায়রা আদালতের নথিপত্র থেকে দেখা যায়, বানোয়ারী দায়রা আদালতে বলেছিলেন—

"At first I was unwilling but when Ram Prasad said that it was the opinion of the counsel that it should be retracted then I agreed. He also said that he had no hope that Banarasi would retract but he had hopes about me and so I agreed. He also said that Mr. Chowdhury will be counsel for me so I retracted."

বানোয়ারী লালকে বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় (কাঁকরী ষড়যন্ত্রে) অনুকম্পা দেখিয়ে মাত্র ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, বানোয়ারী লাল তাঁর শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল পর্যন্ত দায়ের করেননি। বানোয়ারী লালের বাড়ি ছিল রায়বেরেলি জেলার ওসা গ্রামে। বিপ্লবী দলে আসার আগে বানোয়ারী অহিংস আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। অহিংস আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে পূর্বে একবার ৫ মাস জেল খাটতে হয়েছিল।

মামলার নথিপত্র থেকে দেখা যায় দণ্ডিত আসামী প্রেমকিসানের একটি মাউসের পিস্তলের লাইসেন্স ছিল। এই লাইসেন্স দেখিয়ে রামপ্রসাদ ১৯২৪ সালের ৭ই আগস্ট কানপুরের অস্ত্র ব্যবসায়ী পি. এন. বিশ্বাস অ্যান্ড কোম্পানী থেকে ৫০টি পিস্তলের গুলি কিনেছিলেন। কার্তুজের গায়ে মার্কা ছিল—

W

M D

K K

403

আগ্নেয়াস্ত্রের কার্তুজ কিনতে গেলে দোকানের খাতায় ক্রেতার নাম সহি করতে হত। রামপ্রসাদকেও পি. এন. বিশ্বাস অ্যান্ড কোম্পানীর খাতায় সহি করতে হয়েছিল। তিনি "রামকিসান" নামে করেছিলেন। হস্তলিপি বিশারদ প্রমাণ করেছিলেন "রামকিসান" লেখাটি ছিল রামপ্রসাদের হাতের লেখা।

১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতা থেকে। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতার পুলিশ। গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিল। চিঠিটিতে লেখা ছিল—

"A meeting of the P. C. was held on the 3rd October, 1914, in which five among six attended and the following resolutions were passed :–

1. Keeping in view the fact that more or less effeicient reprensentatives acting as or in capacity of district organizers are already posted in the following districts.

Benares, Allahabad, Partapgarh, Cawnpore, Lucknow, Fatehpur, Jaunpur, Jhansi, Hamirpur, Farrukhabad. Mainpuri, Etawah, Agra, Aligarh, Mattra, Bulandshahar, Meerut, Delhi, Etah, Bareilly, Pilibhit, Shahjahanpur, Muzzaffar nagar.

The remaining districts of these Provinces be thus divided among the said Organizers so long as sufficient number of efficient men are nor available to act as district Organizers in each district.

I. Benares, Mirzapur, Gahazipur, Balia, Jaunpur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Rai Bareilly.

II. Jahnsi, Banda.

III. Cawnpore, Rai-Bareilly, unao.

IV. Aligarh, Anupar.

V. Meerut, Saharanpur, Dehra-Dun, Almora, Bijnaur, Badaur, Moradabad.

VI. Shahajahanpur, Nainital, Gahrwal. Lakhimpur, Sitapur, Hardoi.

VII. At present there is no member to represent the Fyzabad division consisting of Fyzabad, Bahraich, Gonda, BaraBanki and Sultanpur. It is resolved that a suitable member be sent there to take charge of the centre at the earliest opportunity.

2. That at least rupees one hundred be raised by subscription from members and sympathisers of the following centres :–

Benares, Cownpore, Jhansi, Aligarh, Meerut and Shahjhanpur, the sum being contributed equally by each centre.

(a) That at least a subscription of annas four realised every month from such member of the Association.

(b) That the above resolution is to be given effect to within the next two months.

3. That the meeting recognises that the total number of its members up to the present time is about one hundred, the following being the total strength in each centre :—

Benares 19 + Cawnpore 22 + Jhansi 15 + Aligarh 12, Meerut (not yet received), Shahjahanpur 8.

আরো নানা বিষয় লেখা ছিল ঐ চিঠিটিতে। বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে ঐ চিঠিটি ছিল খুবই মূল্যবান নথি।

১৯২৪ সালে ইন্দুভূষণ মিত্র পড়তেন শাহজাহানপুরের হাইস্কুলে। বয়স ছিল তাঁর ১৪/১৫। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইন্দুভূষণ মামলাটিতে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন।

বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় (কাঁক্‌রী ষড়যন্ত্র) সাক্ষীদের সাক্ষ্য, আসামীর স্বীকারোক্তি এবং

মামলায় দাখিল করা নথিপত্র বিচার-বিবেচনা করে আপিল আদালত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন দণ্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ ও ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

আপিল আদালত বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রাউসন সিং, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুশরণ ডুবলিশ, মন্মথনাথ গুপ্ত, গোবিন্দচরণ কর, রাজকুমার সিন্‌হার আপিল খারিজ করে দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়া দায়রা আদালতের দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছিলেন। রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এবং রাউসন সিং-এর বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ বহাল রইল।

যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে আপিল আদালত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। দণ্ডিত আসামী সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোবিন্দচরণ কর এবং মাকন্দিলালের শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আপিল আদালত।

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয়েছিল দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। গোবিন্দচরণ কর এবং মাকন্দিলালের দণ্ডাদেশ-এর মেয়াদ বাড়িয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্যদের আপিলও খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের দেওয়া দণ্ডাদেশ বহাল রেখে। প্রণয়েশ চ্যাটার্জী এবং রামনাথের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অযোধ্যা চিফ্ কোর্ট আপিলের রায় দিয়েছিলেন ১৯২৭ সালের ২২শে আগস্ট।